পরমাণু-জিজ্ঞাসা

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়
শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়



পরমাণু-জিজ্ঞাসা

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়
শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস
৩/৫ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০০০২
অন্যান্য অফিস
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০০৭২
কামানি মার্গ, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই ৪০০০৩৮
৩৬এ মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ ৬০০০০২
১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০০০২
৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০০০১
৩/৫/৮২০ হায়দারগুড়া, হায়দ্রাবাদ ৫০০০০১
এস. পি. ভার্মা রোড, পাটনা ৮০০০০১

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ ১৯৭১
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ১৯৭৭

প্রকাশক : শ্রীএন্. ভেঙ্কু আয়ার
ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০০৭২
মুদ্রাকর : শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা ৭০০০১৪

স্বর্গত পিতৃদেব

জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশে

যাঁর কাছ থেকে আমাদের বাংলায় বিজ্ঞান লেখার

দুঃসাহস ও অনুপ্রেরণা

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর ছয় বছর কেটেছে। এই ছয় বছরে পৃথিবীর পারমাণবিক মানচিত্র অনেকটা পালটেছে। এখন মুষ্টিমেয় পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একজন হবার অধিকার ভারত অর্জন করেছে। কাজেই প্রথম সংস্করণের উপক্রমণিকাটির সূত্রপাত যেভাবে হয়েছিল—আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি, এই প্রবচনটি এখন বাতিল করতে হয়। কেননা আমাদের ঠিক আদার ব্যাপারী আর বলা যাচ্ছে না। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বইয়ে কিছু-কিছু পরিবর্তন ও নতুন ঘটনার সংযোজন করতে হল।

১৯৭৪ সালে পোখরানে মাটির নিচে শান্তির জন্য পরমাণু পরীক্ষার পর সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে নতুন ক'রে চিন্তা করার সময় এসেছে। বিস্ফোরণ মানেই বোমা নয়, যদিও দুঃখের বিষয় এরকম একটা ধারণা অনেক দিন ধরে চলে আসছে। পরমাণু যুগের সূচনা যেভাবে হয়েছিল তার ফলেই এই মনোভাবের জন্ম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের পারমাণবিক অগ্রগতির সঙ্গে পরমাণু-জিজ্ঞাসা যে তাল রাখতে পারছে না এটা ভারতীয় হিসেবে আমাদের পক্ষে খুবই গর্ব ও আনন্দের কথা। প্রথম সংস্করণ ছয় বছরেই পুরনো হয়ে যাওয়াতে আমরা আশা করছি এই সংস্করণটির দ্রুত সেই দশা প্রাপ্ত হোক।

নতুন সংস্করণের সংযোজিত তথ্যগুলি যোগাড় করা হয়েছে যে-সব প্রবন্ধ ও বই থেকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

R. Chidambaram & R. Ramanna, 'Some Studies on India's PNE Experiment,' Meeting of the Technical Committee on PNE, IAEA, Vienna, Jan. 20-24, 1975.

Dr. Raja Ramanna : 'On Some Possibilities of the Peaceful Uses of Atomic Energy', *Physics News*, vol. 6 No. 3, Sept. '75.

Dr. B. D. Nag Chaudhuri : 'Energy', Lecture delivered at the Institute of Port Management, Nov. '75.

Annual Report of the Department of Atomic Energy, 1975-76.

প্রথম সংস্করণ পড়ে বিস্তারিত মতামত যাঁরা জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে ডঃ দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ জয়ন্ত বসুকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১৫ই এপ্রিল ১৯৭৭
এ-১, ১৬৪/৭৮ লেক গার্ডেনস
কলকাতা ৭০০০৪৫

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়
শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বিজ্ঞানের সঙ্গে জীবিকা-ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলে তার থেকে দশ হাত দূরত্ব রেখে চলা বিধেয়, আমাদের মধ্যে এরকম একটা ভুল ধারণার প্রচলন আছে। বিজ্ঞানসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলি এত জটিল ও রহস্যময় যে তার মর্মভেদ করতে বিশেষ যোগ্যতা কিংবা ডিগ্রি দরকার—এটা আর একটা ভুল ধারণা। অবশ্য ভাষার দুর্বোধ্যতা অনেক সময় পড়ার সদিচ্ছাকে প্রতিহত করে, কিন্তু সেটা উপস্থাপকের দোষ। অথচ বিজ্ঞানের সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে সর্বসাধারণের যোগ আছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আজকে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে বিচিত্র ভূমিকায় বিজ্ঞান নেমে পড়েছে তার সবটাতেই সকলের প্রবেশের অধিকার আছে, কেননা তা তো আসলে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বুদ্ধির লড়াই। এই লড়াইএ অন্তত বুদ্ধিমান দর্শকের ভূমিকা ইচ্ছে থাকলে আমরা সকলেই নিতে পারি। সেজন্য এই বই বাংলায় লেখা হল এবং যতদূর সম্ভব কথ্য, চল্‌তি ও আটপৌরে ভঙ্গিতে।

সাতবছর আগে সন্দেশ-পত্রিকায় ছোটদের জন্য লিখিত দুটি প্রবন্ধে এই বইয়ের সূচনা। ছোটদের বলে আরম্ভ হলেও পরে দেখা গেল বিষয়টি নেহাত ছেলেখেলা বলে উড়িয়ে দেবার বস্তু নয়। অগত্যা বইএর মেজাজ কিঞ্চিৎ বদলে একে বালক-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে সকলের উপযোগী করার চেষ্টা করা হল। ছোটদের অবশ্য পড়তে বাধা নেই, বড়রাই বরং অঙ্কের জায়গাতে এসে পুরনো অভ্যেসবশে পিছিয়ে যেতে পারেন। সমীকরণগুলো অন্য বিষয়ে পৌঁছবার সোপানমাত্র, এটা মনে রাখলে সুবিধে হবে। তবে একান্ত অনিচ্ছা থাকলে সেই ক-টি পাতা উল্টে গেলে রসগ্রহণে মারাত্মক কিছু হানি হবে না।

বইটি লেখবার সময় আমরা বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করেছি। বিজ্ঞানে ব্যবহৃত বিদেশী নাম ও

কথাগুলির কোনো সর্বজনস্বীকৃত বানান-বিধিও নেই। এই বইএ যেসব পরিভাষা ব্যবহার করা হল তার পূর্ণ তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া আছে। যেসব বিজ্ঞানীর নাম বইএ উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের অনেকের নাম পরিশিষ্টে আছে—বিদেশীদের ক্ষেত্রে ইংরেজি বানান-সমেত। যে সমস্ত বিজ্ঞানী বা দার্শনিকের পরমাণু-চিন্তার বিবর্তনে কোনো-না-কোনোভাবে অবদান আছে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও পরিশিষ্টে যুক্ত হল। তা ছাড়া কিছু-কিছু বৈজ্ঞানিক ধারণা বা যন্ত্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যাও পরিশিষ্টে আছে। এগুলি সম্বন্ধে মূল বইএ যথেষ্ট বিশদভাবে বলার অবকাশ ছিল না।

চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে একটি মৌল-তালিকা যোগ করা হয়েছে বিশেষ ক'রে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য। ঐ তালিকায় পরমাণু-ভারের যে শ্রেণী আছে সেটি আধুনিক আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী অর্থাৎ $C^{১২}$-এর পরমাণু-ভার ১২, এই হিসাবে। মৌল তালিকায় এ-কথা বলা নেই।

এ বইএ যেসব তথ্য দেওয়া আছে সবই প্রকাশিত বই, প্রবন্ধ এবং কিছু সংবাদপত্রের খবরের ভিত্তিতে। এই সব বই বা প্রবন্ধের পুরো লিস্ট দেওয়া সম্ভব নয়, তবে যে ক-টি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার তালিকা নিচে দেওয়া হল। এঁদের সকলের কাছেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মেঘনাদ রচনা সংকলন: পরিবেশক, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা।

ভারতকোষ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, কলকাতা।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য : পরমাণুর নিউক্লিয়াস, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ্, কলকাতা।

সমরেন্দ্রনাথ সেন : বিজ্ঞানের ইতিহাস—১ম ও ২য় খণ্ড, Indian Association for the Cultivation of Science, Calcutta.

Will Durant : *History of Civilisation*, Simon and Schuster, New York.

P.C. Ray : *History of Chemistry in Ancient & Medieval India*, Indian Chemical Society, Calcutta.

Otto Berzins : *Nuclear Weapons*, Pan Book Ltd., London.

Laura Fermi : *All About Atomic Energy*, W. H. Allen, London.

Laura Fermi : *Atoms in the Family*, Allen & Unwin, London.

Heinz Haber : *Our Friend the Atom*, Dell Publishing Co. Inc., New York.

H. B. Lemon : *From Galileo to Nuclear Age*, University of Chicago Press, Chicago.

A. V. Howard : *Dictionary of Scientists*, W. & R. Chambers Ltd., London.

H. Thirring : *Energy for Man*, Harper & Brothers, New York.

George Gamow : *Biography of Physics*, Harper & Row, New York.

Nuclear Explosions, Ministry of Information, Government of India.

Handbook of Physics and Chemistry, Chemical Rubber Publishing Co., Cleveland, Ohio.

Santimay Chatterjee : 'Radioactive Ashes Over Calcutta etc.', *Bulletin of the Atomic Scientists*, London, May, 1955.

B. D. Nag and Santimay Chatterjee : 'Hydrogen Bomb', *Science & Culture*, March 1950.

H.N. Sethna : 'Future of Nuclear Power in India,' *Science & Culture*, January, 1970.

R. L. Grawin and H. A. Bethe : 'Anti-Ballistic Missile System', *Scientific American*, March 1968.

বইএর কিছু-কিছু অংশ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি হল : 'নতুন কিছু' দেশ ৫ই চৈত্র ১৩৭২, 'করো ত্বরা করো ত্বরণ' অমৃত ২৪শে আশ্বিন ১৩৭৫, 'অ্যাটমের ইতিকথা' ও 'অ্যাটমের ইতিহাস' সন্দেশ—যথাক্রমে জুলাই ও ডিসেম্বর '৬৪ সংখ্যায়।

বইটি এই সাতবছরে কয়েকবার পরিমার্জিত, পরিত্যক্ত ও পুনর্লিখিত হয়েছে। পুনর্লিখনের কাজে প্রভূত সহযোগিতা করেছেন শ্রীপরিমল গোস্বামী। বাংলায় বিজ্ঞান লেখা নিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। অভিধানে পাওয়া যায় না এমন নানা বিষয় নিয়ে আমরা সময়ে-অসময়ে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছি, তিনি কখনো আমাদের বিমুখ করেন নি। বিষয় উপস্থাপনা থেকে আরম্ভ ক'রে ভাষা, শব্দের প্রয়োগ ও বানান ইত্যাদি বহু ব্যাপারে সমালোচনা ক'রে ও পরামর্শ দিয়ে তিনি আমাদের উৎসাহিত করেছেন। তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। ধৈর্য ধরে পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখে দিয়েছেন ডক্টর সূর্যেন্দুবিকাশ কর, ডক্টর রঙ্গলাল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীনির্মাল্য আচার্য। ভিতরের ছবিগুলি এঁকেছেন শ্রীরঞ্জন কুণ্ডু ও শ্রীশৈল চক্রবর্তী। এঁদের সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সব শেষে ওরিয়েন্ট লংম্যান এবং বিশেষ ক'রে শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশ মহাশয় এই বই প্রকাশ করতে রাজি হয়ে যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আমরা তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দোল পূর্ণিমা, ১৯৭১
১৬২/১৪৮ লেক গার্ডেনস
কলকাতা ৪৫

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়
শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

সূ চি প ত্র

চিত্রসূচী [হাফটোন]

উপক্রমণিকা

আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর

কথায় বলে 'আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি?' প্রবাদটা যে সর্বৈব ভুল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আজকাল-কার দিনে, যখন লণ্ডন থেকে সিড্নি তিন ঘণ্টার পথ আর পৃথিবী থেকে চাঁদ তিন দিনের তখন শুধু জাহাজের কেন আরও অনেক খবরই সব ব্যাপারীকে রাখতে হচ্ছে। পৃথিবী থেকে প্রায় ন' কোটি মাইল বা পনর কোটি কিলোমিটার দূরে সূর্য—তার দেহে যখন আবর্ত উঠল তখন সৌরোৎপাতের হিসেব কষতে বসে গেলেন বিজ্ঞানীরা—চন্দ্রযানে ক'রে যাঁরা আসছেন তাঁদের কোনো বিপদের ভয় নেই তো?

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী বললেন, শক্তি অবিনশ্বর, বস্তুর বিনাশ নেই। বললেন, যে মহাশক্তিস্রোত বিশ্বজগৎকে মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঙছে গড়ছে, তার বিরাম নেই, হ্রাস নেই, বৃদ্ধি নেই। তা তাঁরা বলতে পারেন। কিন্তু জড়বস্তুর রূপবদলের সঙ্গে আমাদের ভাগ্যসূত্র যে কি অনিবার্যরূপে বাঁধা তা এক লহমায় প্রমাণ ক'রে দিল ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে, বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে জাপানে ফেলা দুই পাশুপত অস্ত্র—যার নামধাম না জেনে এখন আর কারো নিস্তার নেই।

অ্যাটম বা পরমাণু-বোমা হলো বিজ্ঞানের রাজনৈতিক দিক। পরমাণু-বিজ্ঞান তার আগে পর্যন্ত ছিল বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের আওতায়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দেও যখন লর্ড রাদারফোর্ড ইংলণ্ডে নিজের ল্যাবরে-টরিতে অল্প কয়েকজন সহকারী নিয়ে চেষ্টা করছিলেন নাইট্রোজেন পরমাণুর ব্যূহভেদ করতে, তখন কি তিনি ভেবেছিলেন কী সুদূর-প্রসারী পরিণাম হতে পারে তাঁর এই পরীক্ষার? তাঁদের উদ্দেশ্য

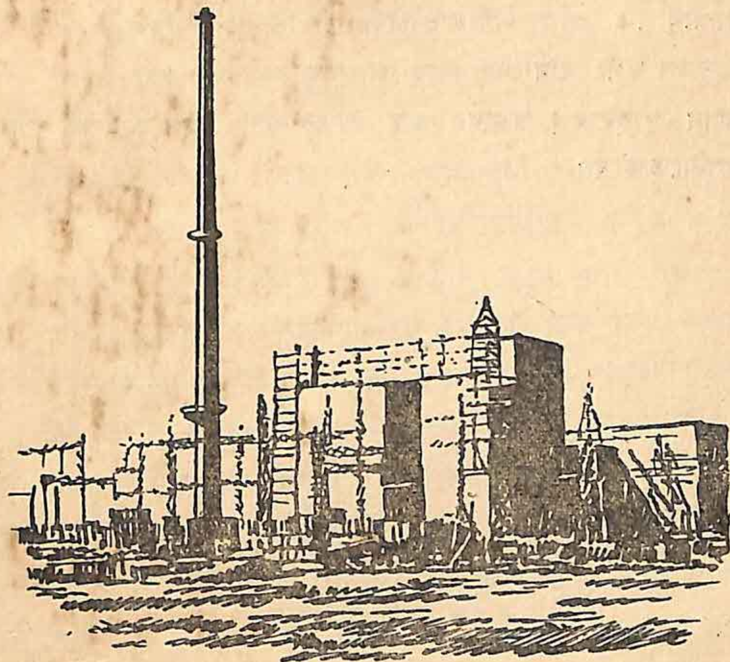
ছিল কেবলমাত্র প্রকৃতির রহস্যভেদ করা। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। মানব-সভ্যতার ইতিহাস মানেই তাই। কিন্তু বিজ্ঞানের যুগসন্ধিক্ষণ উপস্থিত হলো সেই সময় যখন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বিশেষ একটি সম্ভাবনার কথা চিন্তা ক'রে আইনস্টাইন লিখলেন রুজভেল্টকে একটি চিঠি—সেই চিঠির প্রতিক্রিয়া হলো পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি প্রথম অ্যাটম-বোমা—তার পরে পরমাণুর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব।

পরমাণু থেকে শক্তি

পরমাণু থেকে শক্তির আত্মপ্রকাশের প্রথম দিকে, অর্থাৎ উনিশশো চল্লিশের কাছাকাছি সময়ে বিজ্ঞানীরা নিয়েছেন চালকের ভূমিকা। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিজ্ঞানীদের দ্বারা চালিত হয়েছেন রাজনীতিবিদ্। কিন্তু এখন ভূমিকা গেছে উল্টে। এখন রাজনীতি চালনা করছে বিজ্ঞানকে। তবে চলার গতি যে বেশ দ্রুত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যুদ্ধের অশুভ ফল যতই থাক, দুটি মহাযুদ্ধ যে বিজ্ঞানের অকল্পনীয় অগ্রগতিতে সাহায্য করেছে তা সর্বজনস্বীকৃত। পরমাণু-শক্তির আবিষ্কারের কথা বাদ দিলেও বিজ্ঞানের বহু শাখা-প্রশাখায় যে-সব যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে তা সাধারণ অবস্থায় হয়ত হতোই না বা হলেও কয়েক শতাব্দী লেগে যেত।

পরমাণু-শক্তি আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন, সেই সময় থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতার আগে থেকেই এখানে পরমাণু-শক্তি সাধনার বীজ বপন করা হয়ে গেছে—জন্ম-মুহূর্তের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেওয়া হলো। আমাদের পারমাণবিক নীতি পরিকল্পনা করা হয়েছে বহিঃশত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে নয়, নিজেদের আভ্যন্তর ও অদূর ভবিষ্যতের প্রয়োজনে। পরমাণু বিদারণ ক'রে যে শক্তির নির্গমন তাকে আমাদের দরকার কেবলমাত্র

সাধারণ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নয়, এর সঙ্গে আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্নও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।



তারাপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ-শক্তিকেন্দ্র

তারাপুরে পরমাণু-বিদ্যুৎ তৈরির কারখানা থেকে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে পরমাণু-বোমা ছাড়াও পরমাণু থেকে অন্য কাজ পাওয়া যায়। এত খরচপত্র ক'রে পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ নিষ্কাশনের কি প্রয়োজন ছিল? কয়লা বা অন্য জ্বালানির কি অভাব ঘটেছে—এ প্রশ্ন অতিশয় যুক্তিসংগত। আমরা দশম অধ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করব। যদিও আমাদের পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলার কোনো বাসনা নেই তবু যখন আমাদের আশেপাশে পারমাণবিক যুদ্ধের মহড়া চলছে তখন অন্তত এই জাতীয় আক্রমণের অর্থ কি—তার থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের কি করণীয় এটুকু জানা অত্যাবশ্যক।

সাধারণ রাসায়নিক বোমার সঙ্গে পরমাণু-বোমার তফাত কোথায়, তার ভয়ঙ্করতা কোনখানে এবং সেই প্রচণ্ড শক্তির রহস্যই বা কি, কি ক'রে মানুষের হাতে এসে পৌঁছল সেই হাতিয়ার, পরমাণু কি আজ আবিষ্কার হলো না চিরকালই ছিল, পরমাণুর যে রহস্যময় জগৎ আমাদের কাছে তালাবন্ধ হয়ে ছিল হঠাৎ খুলে গেল কোন জাদুমন্ত্রে? উত্তরের জন্য ইতিহাসের বেশ কয়েকটি পাতা ওল্টাতে হবে।

পরমাণুর গোড়ার কথা

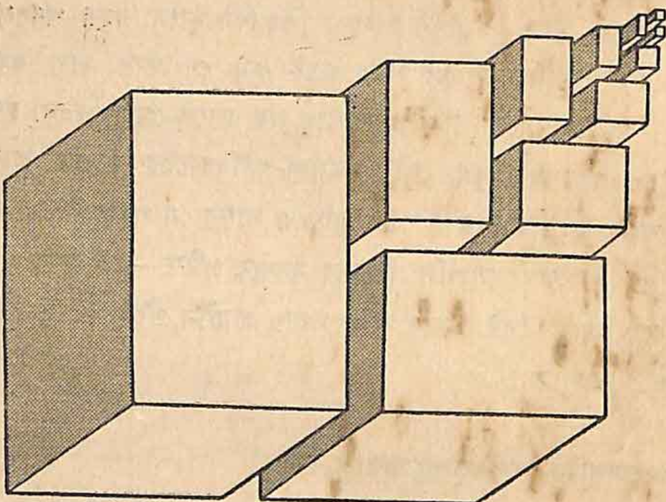
প্রথম ধারণা

পরমাণু নামক আশ্চর্য বস্তুটি যদিও আবহমান কাল ধরে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে, তবু এর অস্তিত্বের কথা ভাল ক'রে জানা গেছে মাত্র কিছুদিন হলো। কিছুদিন মানে বছর পঞ্চাশ—সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে এই সময় এতই কম যে তার মাপ করাই কঠিন। যে-পরমাণুকে চিনতে পারার পর বলতে গেলে সূচনা হলো বিবর্তনের এক নতুন যুগ সেই পরমাণু-আবিষ্কারের কৃতিত্ব কার? আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেও মানুষ যে পদার্থের মৌলিক উপাদান কি এবং সেগুলি কিসের সমন্বয়ে গঠিত—এই নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয় দর্শন ও ইতিহাসে।

গ্রীক পরমাণুবিদ্ আনেক্সাগোরাস্

খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন আনেক্সাগোরাস্। আবির্ভাব কথাটা হয়ত কোনো দিগ্বিজয়ী বীরের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হলেই ভাল হতো, এবং আনেক্সাগোরাস্ অবশ্যই কোনো রাজ্য জয় করেন নি। হয়ত পরবর্তী ডেমোক্রিটাসের মতো ইনিও মনে করতেন একদিকে পারস্যের রাজসিংহাসন অন্যদিকে একটি জ্যামিতির উপপাদ্য—দুয়ের মধ্যে বেছে নিতে হলে শেষেরটিই তাঁর পক্ষে অধিকতর লোভনীয়। বস্তু কি দিয়ে তৈরি এই চিন্তা তাঁকে কেবলই উত্যক্ত করত—জ্যামিতি নিয়ে তাঁর অবশ্য অতটা মাথাব্যথা ছিল না। তিনি ভাবলেন, কোনো জিনিসকে নিয়ে যদি ভাঙতে আরম্ভ করি তাহলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়! ধরা

যাক এক টুকরো সোনাকে আধখানা করলাম, তারপর সেই ভাঙা এক টুকরো নিয়ে তাকেও আধখানা করলাম, তারপর আধকে আবার আধ, তাকেও আধ, তাকেও আধ···ভাবতে ভাবতে আনেক্সাগোরাসের আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার উপক্রম। তিনি দেখলেন সৃষ্টির শেষদিন পর্যন্ত তিনি যদি ঐ টুকরোটিকে কেবলই আধখানা ক'রে যান তবু তাঁর আধখানা করা কোনোদিন ফুরোবে না। তার মানে বস্তু অন্তহীন, বস্তুর শেষে কোনোদিনই পৌঁছনো যাবে না।



আধকে আধ, তাকে আধ, আবার আধ······

লিউসিপ্পাস ও বিচরণশীল পরমাণু

খ্রীস্টপূর্ব ৪৩৫ নাগাদ লিউসিপ্পাসের নাম শোনা যায়। কারণ এবং প্রয়োজন ছাড়া কিছুই ঘটে না এই মতবাদে আস্থা ছিল তাঁর। তাঁর চারপাশে গড়ে উঠেছিল এক গুণমুগ্ধ ভক্তমণ্ডলী, ভক্তদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ডিমোক্রিটাস, যিনি গুরুর পরমাণুবাদকে আরো সুগঠিত করেন। লিউসিপ্পাস সম্বন্ধে, দুঃখের বিষয়, কিছু কিছু অসংলগ্ন উক্তি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় নি। তবে ইনি যে প্রখর বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন তা অনস্বীকার্য, কারণ ইনিই প্রথম

বলেন শূন্যমার্গে বিচরণকারী পরমাণুর দল একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে গড়ে তুলছে পদার্থের আদি অবস্থা।

ডিমোক্রিটাস : পরমাণু ও শূন্য

বহু পৈতৃক সম্পদের অধিকারী ছিলেন ডিমোক্রিটাস, কিন্তু বিলাসে অপব্যয় না ক'রে তিনি এই অর্থের সদ্ব্যবহার করেছিলেন ভ্রমণ ও আলোচনায়। শোনা যায় পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির সন্ধানে ইনি পারস্য, এমনকি ভারতে পর্যন্ত এসেছিলেন।

বস্তু কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য? ডিমোক্রিটাসের এই ছিল প্রশ্ন। অনুভূতিকে বিশ্বাস নেই—প্রকৃত সত্যের সন্ধান কি তার দ্বারা পাওয়া যাবে? দৃষ্টি, স্পর্শ, শ্রবণ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয় প্রকৃত সত্যের উপর রঙ চড়িয়েছে—তাদের কবলে পড়ে আসল সত্য করেছে আত্মগোপন। এরা সত্যের উপর ফেলেছে শব্দ, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, আর উত্তাপের পর্দা। এগুলি সবই আরোপিত গুণ। বধিরের পৃথিবীতে সমুদ্র শব্দহীন, অরণ্যের মর্মর নিস্তব্ধ। কোনো বস্তুর তিক্ততা- এবং মিষ্টত্ব-গুণ কেবল সংস্কারমাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাহলে আছে কি? আছে কেবল পরমাণু ও শূন্য। এমনকি আত্মাও তৈরি হয়েছে পরমাণু-সমবায়ে।

আত্মার গঠনের কথা বাদ দিলে, ডিমোক্রিটাসের মতবাদ যে অনেকাংশে আধুনিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি দেখলেন পৃথিবীতে সবকিছুই চলেছে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ধরে। পৃথিবীতে সবকিছুরই একটা সুচারু রূপ আছে। সুতরাং, তাঁর স্বাভাবিক-ভাবেই মনে হলো, বস্তুর আদিতে এমন কোনো জিনিস আছে যার কোনো বদল নেই। তা যদি না থাকত তাহলে মেঘের পুঞ্জের মতো সব সময়ই এই দৃশ্যমান জগৎ ভেঙেচুরে আকার বদলাতে থাকত। সুতরাং ডিমোক্রিটাসের বদ্ধমূল ধারণা হলো পদার্থের আদিতে আছে এক ধরনের কণা; তিনি তার নাম দিলেন অ্যাটম—তার কোনো বদল নেই। কোনো শক্তি তাকে বিনাশ করতে পারে না, না

ভেতর থেকে, না বাইরে থেকে। বস্তু তৈরি হয়েছে অ্যাটম নামে এই কণিকা দিয়ে, এই কণার চেয়ে ছোট আর কিছু হতেই পারে না। গ্রীক ভাষায় অ্যাটমস কথাটি অর্থ—যা অবিভাজ্য। সেই থেকে অ্যাটম কথাটির উৎপত্তি।

ডিমোক্রিটাসের মতে এই অ্যাটম বা বস্তুর আদি-কণা আছে বলেই পাখির ডিম থেকে জন্ম নিচ্ছে একই জাতীয় পাখি, গাছের বীজ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে একই জাতীয় গাছ। লুক্রেটিয়াস নামে এক গ্রীক কবি তাঁর কাব্যে এই পরমাণুবাদের সুন্দর ব্যবহার করেছিলেন। যে গুণে প্রতি বসন্তে এক গাছে একই জাতীয় ফুল ফোটে, যে গুণে এক জাতের পাখিদের পাখায় জাগে একই রং—সে সবের মূলে আছে ঐ শাশ্বত বস্তুর কণা—যার নাম অ্যাটম—যার ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই, যা কেবল স্থান- পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুকে দেয় আকার, রূপ, বর্ণ।

আত্মার উপাদান পরমাণু

প্রাচীন গ্রীকদের চিন্তাধারা ছিল বড় বিচিত্র। ডিমোক্রিটাস একদিকে যতটা আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, অপরদিকে পরমাণুর সাহায্যে আত্মার রহস্যভেদ করায় তাঁর চেষ্টা ততটাই হাস্যকর। তিনি যখন বলেন, বস্তুর পরিমাণ যা আছে তা-ই থাকবে, কমবেও না, বাড়বেও না, তখন শুনে সন্দেহ হয় তিনি কি আড়াই হাজার বছর আগেকার লোক ছিলেন! কথাটা এযুগের আইনস্টাইনের মতো মনে হয়। কিন্তু তিনি আবার এও বলেছেন যে আত্মার উপাদান যে-পরমাণুগুলি সেগুলি ছোট ছোট গোল গোল, অনেকটা আগুনের পরমাণুগুলির মতো। যে সব সূক্ষ্ম পরমাণু দিয়ে আত্মা তৈরি সেগুলি শ্রেষ্ঠতম। দেহের সুখ থেকে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ চিত্তের প্রশান্তি এবং তিনি বোধহয় নিজের নীতির যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন। কেউ বলেন একশো নয় বছর, মতভেদে নব্বই। দীর্ঘজীবনের গোপন কারণটি কি প্রশ্ন করায়

তিনি বলতেন প্রত্যহ খানিকটা ক'রে মধুপান ও তেল মেখে স্নান।

ডিমোক্রিটাস পরমাণুতত্ত্ব-বিষয়ে কোনো বই লিখেছেন কি না জানা যায় না, কেন না তেমন কোনো বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় নি। যা পাওয়া গেছে তা হলো বিভিন্ন লেখক ও দার্শনিকদের রচনায় তাঁর মতবাদের উল্লেখ। এঁদের মধ্যে লুক্রেটিয়াস ছাড়া আছেন এপিকিউরাস।

এপিকিউরাস ও পরমাণু

এপিকিউরাস পাপপুণ্য নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করেন নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল দেবতারা এত দূরে এবং নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষের গতিবিধি, ন্যায়-অন্যায়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে ভাববারই বা কি দরকার—তবে নেহাত যদি কোনো তত্ত্ব মানতে হয় তবে ডিমোক্রিটাসের থিওরি বেছে নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ বস্তু ও শূন্যতা, এই হলো বিশ্বসংসারের সব। বস্তু গঠিত পরমাণু দিয়ে। পরমাণুর কোনো বর্ণ, গন্ধ, তাপ, স্বাদ বা শব্দ নেই, তবে ওজন ও আকারে ভেদ আছে। ফলে বস্তুর বৈচিত্র্য। এপিকিউরাস অবশ্য মানুষের আচরণবিধি নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন—তাই হঠাৎ ডিমোক্রিটাসের পরমাণুবাদ মধ্যপথে পরিত্যাগ ক'রে তিনি বলে বসলেন পরমাণুরা যে যার ইচ্ছামতো বিচরণ করে। এরা এক একটি স্বতন্ত্র জগৎ। এইটুকু যে জানা হলো এই যথেষ্ট—এবার মানুষকে নিয়ে পড়া যাক।

ডিমোক্রিটাসের মতবাদ, যা কোনোরকম পরীক্ষা ছাড়া কেবলমাত্র অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, একটি বিশেষ কারণে বহুদিন পর্যন্ত ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল। এই কারণ হলেন অ্যারিস্টট্‌ল। বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হলেও পরমাণুবাদের ইতিহাসে এঁর আগমন একেবারে কালাপাহাড়ের মতো ঘটনা। ডিমোক্রিটাসের পরমাণুবাদে এঁর একেবারেই আস্থা ছিল না। বস্তুত প্রকৃতি

সম্বন্ধে তাঁর ছিল একেবারেই ভিন্ন মত। তাঁর মতে পৃথিবীতে মৌলিক পদার্থ চারটি—আগুন, হাওয়া, জল ও মাটি। যা কিছু দৃশ্যমান, এমন কি আমরা নিজেরাও আকার পেয়েছি এই চারটি উপাদানের সমন্বয়ে। এই চারটি বস্তুই শাশ্বত, চিরস্থায়ী। এদের বিনাশ নেই।

মধ্যযুগে ইউরোপের অল্পশিক্ষিত কিমিয়াবিদ্ (অ্যালকেমিস্ট)-দের কাছে এই থিওরিটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তারা অ্যারিস্টট্লকে কতটা বুঝেছিল তাতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তারা মনে ক'রে নিল যেহেতু অ্যারিস্টট্লের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক জিনিসই কম-বেশি পরিমাণে আগুন, জল, বাতাস ও মাটি এই চারটি জিনিসের যোগফলে উৎপন্ন, সুতরাং এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে রূপান্তর ঐ নিয়মেই করা সম্ভব। সুতরাং লোহা, সীসা, তামা প্রভৃতিকে সোনা করা কেবল ফরমূলাটা জানার অপেক্ষা। এই লোভের বশবর্তী হয়ে দলে দলে ভুয়ো জাদুকরের উদয় হলো, তারা বললে তারা যে-কোনো লোককে এনে দিতে পারে রাজার সম্পদ। বলাই বাহুল্য, এইসব কারসাজির সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। চতুর্দশ শতাব্দী অবধি তাই ইউরোপের মহান্ধঃসময়। কুসংস্কার এবং নির্বিচারে অ্যারিস্টট্লকে মেনে নেওয়া—এই হয়ে দাঁড়াল তখনকার রেওয়াজ। এমনও সময় গেছে যখন অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে অ্যারিস্টট্লের বিরুদ্ধে কোনো মত প্রকাশ করলে ছাত্রদের জরিমানা দিতে হতো।

এই দু-হাজার বছর ডিমোক্রিটাসের অ্যাটমিক মতবাদ চাপা পড়ে রইল। অ্যারিস্টট্লের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দার্শনিকের উদয় না হলে হয়তো পরবর্তীকালে অ্যাটমের সন্ধান এতটা পিছিয়ে যেত না। পৃথিবীর চেহারাই অন্যরকম হয়ে যেত কিনা তাই বা কে জানে?

ভারতীয় পরমাণুবাদ কি আগে?

ডিমোক্রিটাসের পরমাণুবাদের কাছে বিশ্ববাসী কৃতজ্ঞ—প্রমাণ—অ্যাটম কথাটিই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া। সমসাময়িক কালে

ভারতবর্ষেও পরমাণুবাদ নিয়ে চিন্তা করা হয়েছিল এবং সে চিন্তাগুলি গ্রীক দার্শনিকদের মতো অসংলগ্ন বা সংক্ষিপ্ত নয়, যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সুচিন্তিত—এ বিষয়ে ততটা নজর দেওয়া হয় না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের পরে ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থন ক'রে বলার মতো আর তৃতীয় ব্যক্তির উদয় হয় নি। তা ছাড়া আমাদের বিজ্ঞানীরা বোধহয় দর্শন পড়ার জন্যে বিশেষ উৎসুক নন। ভারতীয় পরমাণুবাদের যা কিছু সবই আছে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে, পরে বৌদ্ধ- ও জৈন-দর্শনের অঙ্গীভূত হয়েছে—শুনে বিজ্ঞানীরা পিছিয়ে যেতে পারেন। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকরা যে কেন গ্যালিলিও হবার চেষ্টা করেন নি অর্থাৎ বস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে তাঁদের অনুমান-গুলির সত্যিমিথ্যে প্রমাণ ক'রে দেখার চেষ্টা করেন নি—এও এক আশ্চর্য ব্যাপার।

তারিখ-সন নিয়ে বিবাদ করা যে সব পণ্ডিতের কাজ তাঁরা বাদানুবাদ ক'রে কিছুতেই স্থির করতে পারেন নি গ্রীক পরমাণুবাদ ও হিন্দু পরমাণুবাদের মধ্যে কোন্‌টি আগে। গ্রীকরা ভারতীয়দের কাছ থেকে ধার করেছে না ভারতীয়রা গ্রীকদের কাছে? পারস্পরিক যোগাযোগ না থাকলে তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে মিল কি ক'রে আনা সম্ভব? গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে সব থেকে প্রাচীন এম্পিডক্‌লেসের (জন্ম খ্রীঃ পূঃ ৪৯৪) রচনায় সর্বপ্রথম পদার্থের চারটি মৌলিক উপাদানের উল্লেখ দেখা যায়। এদিকে বৈশেষিক- ও ন্যায়-সূত্রের বয়স অনুমান করা হয় খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী। কয়েক শতাব্দী হিসেবের এদিক-ওদিক হতে পারে ধরে নিয়ে বলা যায় মোটামুটি একই সময়ে গ্রীস ও ভারতে একই ধরনের চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছিল। তবে এই দুই মতবাদের মধ্যে অমিলও যথেষ্ট। সুতরাং শেষ পর্যন্ত সবই অপ্রমাণিত থেকে যায়।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে বলা হয়েছে সমস্ত সৃষ্টি আদিতে একটি বীজের আকারে সুপ্ত ছিল—সাংখ্যের ভাষায় বলা যায় অব্যক্ত ছিল। আজকের সৃষ্টিতত্ত্ববিদ্ যেমন বলেন পদার্থ অত্যন্ত ঘনীভূত

অবস্থায় প্রথমে ছিল, হয়তো একটি ডিম্বাকারে, পরে যা থেকে প্রসার্যমান বিশ্বের তত্ত্ব তৈরি হয়েছে। আদি ডিম্ব থেকে ব্রহ্মাণ্ড কেমন ক'রে তৈরি হলো আধুনিক বিজ্ঞানে তার নানা রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। ছান্দোগ্য-উপনিষদে কিন্তু বলা হয়েছে যে আদিতে যে বীজ ছিল সেটি দুটুকরো হয়ে সৃষ্টি হলো স্বর্গ ও মর্ত্য।

সৃষ্টিতত্ত্বের গভীরে না গিয়ে আপাতত দেখা যাক পদার্থের স্বরূপ ও গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌রা কি অভিমত প্রকাশ করেছেন। ষড়্‌দর্শনের মধ্যে সুপ্রাচীন সাংখ্য-দর্শনের প্রবর্তক কপিল পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকা সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এই ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম কণিকার নাম দেন তন্মাত্র। এগুলি পরমাণু থেকেও ক্ষুদ্র, এগুলি দিয়েই পরমাণু গঠিত। সাংখ্যের পরমাণুবাদের সঙ্গে আশ্চর্য মিল দেখা যায় গ্রীক দার্শনিক এম্পিডক্লেসের মৌলিক পদার্থবাদের।

সাংখ্য

আমরা মৌলিক পদার্থ বা মৌল বলতে যা বুঝি অর্থাৎ অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, হিলিয়ম, কার্বন প্রভৃতি—মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞানের প্রাক্‌পরীক্ষা যুগে মৌলিক পদার্থের সেই ধারণা ছিল না। যেমন সাংখ্যে বলা হয়েছে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের কথা। এগুলি পদার্থের মৌলিক উপাদান নয়—এদের বলা যেতে পারে পাঁচটি মূল সূত্র বা শ্রেণী, যেমন সমস্ত কঠিন পদার্থের আদিতে আছে ক্ষিতি, সমস্ত তরল পদার্থ হলো অপ্-শ্রেণীভুক্ত, বায়ু হলো যাবতীয় বায়বীয় পদার্থের মূলে।

ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়

সাংখ্য যাকে বলেছেন তন্মাত্র, বৈশেষিক-দর্শনের প্রবর্তক কণাদ তাকে বলেছেন অণু। (মনে রাখতে হবে তখন অণু-পরমাণুর প্রভেদ জানা ছিল না।) লক্ষ্য করবার বিষয় বৈশেষিক-দর্শনে পদার্থের

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ, যাকে আমরা এখন পরমাণু বলে জানি, তা ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত। বলা হয়েছে পরমাণুকে কেউ সৃষ্টি করেনি। এরা চিরন্তন। এরা সব সময়েই ছিল। ঈশ্বর পরমাণু দিয়ে অন্য সব কিছুর সৃষ্টি করেছেন। তবে পরমাণুগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছায় চালিত, এদের ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু নেই। পরমাণু অবিভাজ্য ও অবিনশ্বর। ভৌত পদার্থগুলি ভাঙতে ভাঙতে যে সর্বশেষ অবস্থায় পৌঁছয় তারই নাম পরমাণু।

কণাদ

কণাদের মত অনুযায়ী আকাশের কোনো আণবিক গঠন নেই। আকাশ হলো নিষ্ক্রিয়। এখান দিয়ে বায়ুর মাধ্যমে শব্দ চলাচল করে। আকাশ হলো এমন একটি সর্বব্যাপী মাধ্যম যার মধ্যে দিয়ে আলো-বায়ু- ও তাপ-কণিকারা চলাফেলা করে। পরমাণুগুলিও আকাশে বিচরণ করে ; সুতরাং কণাদের মতে পরমাণু চার রকমের—ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু। এর সঙ্গে মিল আছে গ্রীক মতবাদের যাতে বলা হয়েছে মাটি, জল, হাওয়া ও আগুন হলো পদার্থের আদি উপাদান। আলো ও তাপ সম্বন্ধে আশ্চর্য আধুনিক উক্তি করেছেন কণাদ। তিনি বলেছেন এ দুটি হলো তেজ-এর দুই রূপ। পরমাণু যদিও চিরন্তন ও অবিনশ্বর—এরা কখনও পৃথকভাবে বিচরণ করে না—এরা থাকে মিলিত বা সংঘবদ্ধভাবে। কি কি বিভিন্ন উপায়ে পরমাণুর মিলিত হওয়া সম্ভব এই নিয়ে কণাদ অনেক শ্রেণীবিভাগ করেছেন। বস্তুর গতি এবং তার কারণ নিয়েও বৈশেষিক দর্শনে যথেষ্ট আলোচনা আছে। একজন ভাষ্যকার বলেছেন বিশেষ একটি সময়ে একটি বস্তুর কেবলমাত্র একটি গতিই হতে পারে—'একদা একস্মিন্ দ্রব্যে একমেব কর্ম্ম বর্ত্ততে'—যা শুনলে নিউটনের গতি-সূত্রের কথা মনে পড়ে যায়।

রাসায়নিক সমন্বয়ের ব্যাপারে জৈনরা বেশ কিছুদূরে এগিয়েছিলেন। পরমাণু থেকে অণু গঠনের সময় কি কি শক্তি কাজে লাগে, পরমাণু

পরমাণুতে জোড়া লাগার সময় আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তির প্রভাব প্রভৃতি সূক্ষ্মতর বিষয়ে তাঁরা চিন্তা করেছিলেন—যে সব তত্ত্বের পুনরাবিষ্কার হতে আধুনিক বিজ্ঞানের দেড় হাজার বছর লেগে গেছে। পদার্থের আদি অবস্থা ও তার স্বরূপ সম্বন্ধে এঁদের অনুমানগুলি সত্যের খুব কাছাকাছি এসেছিল। হয়তো নিউক্লিয়াস ও ঘুরন্ত ইলেকট্রনের ধারণা মানসচক্ষেও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়—অতদূর যেতে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দরকার। কিন্তু প্রমাণ ছাড়াই তাঁরা যে সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন সেগুলি খুবই আশ্চর্য, একমাত্র অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই এই রহস্যের সমাধান করা যেতে পারে।

পরমাণুবাদের যে-কোনো আলোচনায় গ্রীকদের নাম ক'রে আরম্ভ করাটা একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রীকরা না হিন্দুরা কারা ছিলেন পথপ্রদর্শক ? পণ্ডিতেরা মনে করেন থালেস, এম্পিডক্লেস্, আনেক্সাগোরাস্, ডিমোক্রিটাস ও অন্য গ্রীক পণ্ডিতেরা প্রাচ্যে আসতেন দর্শন শিক্ষার জন্য, যেমন আমরা এখন উচ্চশিক্ষার্থে বিলেত গিয়ে থাকি। ভারতীয় চিন্তাধারা যে তাঁদের প্রভাবিত করেছিল এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর 'হিন্দু রসায়ন' বইটিতে ভারতীয়দের অগ্রাধিকার দান প্রসঙ্গে অনেক বিশেষজ্ঞের মতামত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু ইউরোপের মধ্যযুগের মতো নবম শতাব্দী থেকে ভারতে বিজ্ঞানের অচলাবস্থার সূত্রপাত হলো। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা অন্য যে কারণেই হোক; এই অবস্থা একেবারে বৃটিশ যুগের গোড়ার দিক পর্যন্ত অব্যাহত থেকেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের উন্মেষের জন্য আমাদের আবার তাকাতে হবে পশ্চিম দিকে যখন ইউরোপে রেনেসাঁস—যার থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের শুরু।

গ্যালিলিও থেকে আধুনিক যুগ

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গ্যালিলিও

আধুনিক বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক ছিলেন ইটালির গ্যালিলিও। ইনিই প্রথমে সাহস করলেন নতুন পথে পা বাড়াতে। দু-হাজার বছর ধরে লোকে বিনা দ্বিধায় মেনে আসছিল যে একই উচ্চতা থেকে দুটি ভিন্ন ওজনের বস্তু নিচে ফেললে যেটি বেশি ভারি সেটি আগে পড়বে। এটাই ছিল অ্যারিস্টট্‌লের অনুমান, কিন্তু গ্যালিলিও বললেন একথা ঠিক নয়। পড়ন্ত জিনিসের পতনকাল মোটেই তার ওজনের উপর নির্ভর করে না। শুধু একথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। লোকজন ডেকে সকলের সামনে পিসার হেলানো মিনার থেকে তাঁর সেই বিখ্যাত এক্সপেরিমেণ্টটি করলেন। সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে একটি বিরাট পাথরের চাঁই আর একটি ছোট নুড়ি একই সঙ্গে এসে মাটিতে ঠেকল। অবশ্য সেই সময়কার পণ্ডিতরা তাঁকে নাস্তিক, অবিশ্বাসী ইত্যাদি নানারকম কটুকথা বলতে ছাড়েন নি। শেষ জীবনে গ্যালিলিওকে এঁদের হাতে বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু এঁর গবেষণাকে বলা যেতে পারে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম ধাপ। এরই উপর ভিত্তি ক'রে নিউটনের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল।

যদিও গ্যালিলিও প্রধানত জ্যোতিষ বিজ্ঞানের চর্চা করেছিলেন, আর তাঁর পদার্থবিজ্ঞানের অনুশীলনে অ্যাটমের কোনো উল্লেখ নেই, তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে যে-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকরা সফলকাম হয়েছিলেন সেই দৃষ্টিভঙ্গি আরম্ভ হয়েছিল ইটালির এই বৈজ্ঞানিকের মনে।

সত্যিকার বিজ্ঞানী মন ছিল প্রায় সমসাময়িক আর একজন

ইংরেজ দার্শনিকের। তিনি হলেন ফ্রান্সিস বেকন। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও বিজ্ঞানচর্চায় তাঁর পরোক্ষ দানের পরিমাণ নেহাত সামান্য নয়। বেকনও তাঁর পূর্বপুরুষদের অ্যারিস্টট্‌লে অচলা মতি দেখে দেখে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি লিখলেন, সেকালে লোকেদের জ্ঞান-সঞ্চয়ের উপায় ছিল কেবল চোখে দেখা আর চিন্তা করা। কিন্তু সে সব দিন গেছে—আগেকার পণ্ডিতরা যা বলে গেছেন সেটা যতক্ষণ না সত্যি বলে যাচাই ক'রে দেখা হচ্ছে ততক্ষণ আমরা সেটা সত্যি বলে মানতে প্রস্তুত নই। বেকন নিজে যদিও এক্সপেরিমেণ্ট করেন নি তবু এর পদ্ধতি কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখে গেছেন। এরপর এলেন আইজাক নিউটন। পদার্থের গতি-প্রকৃতি নিয়ে নিউটন যা বললেন তাতে দেখা গেল গাছের আপেলটি মাটিতে পড়া থেকে গ্রহনক্ষত্রের চলার পথ সব একই মাধ্যাকর্ষণের সূত্রে গাঁথা। নিউটন পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকার অস্তিত্ব স্বীকার করলেন, যেমন করেছিলেন ডিমোক্রিটাস খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। এই পদার্থের কণাগুলি—নিউটন বললেন—ভেঙে দুই খণ্ড করা অসম্ভব। এমনই কঠিন এইসব কণিকা যে কোনো পার্থিব শক্তি এদের বিনাশ করতেই পারে না ভগবান সৃষ্টির প্রথম দিনে এদের যে অখণ্ড আকার দিয়েছেন কারো সাধ্য নেই সেই আকারকে চূর্ণ করে। আজকালকার দিনে কোনো বিজ্ঞানী ঠিক এমন কথা বলবেন না। বিজ্ঞান এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে বিনা প্রমাণে কোনো কিছুই মেনে নেওয়া হয় না। কিন্তু নিউটনের যুগে বিজ্ঞানের ঠিক এইরকম মেজাজ তৈরি হয় নি।

জন ডালটন

নিউটনের প্রায় একশো বছর পরে জন ডালটন, পদার্থের আদি রূপের কথা চিন্তা করলেন। শুধু চিন্তা নয়, ডালটন আরম্ভ করলেন গ্যাস নিয়ে নানারকম পরীক্ষা, আর পরীক্ষা ক'রে কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন—যা এর আগে আর কেউ করে নি। বিভিন্ন

মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি পারস্পরিক অনুপাতে ওজন করার পদ্ধতি বার করলেন তিনি। হাইড্রোজেন পরমাণুই যাবতীয় মৌলিক পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে হাল্কা, অতএব তাকে এক ধরে ডালটন তাঁর ওজনের হিসেব আরম্ভ করলেন। ইনি অবশ্য কিছু-কিছু ভুলও যে করেন নি তা নয়—সবচেয়ে মারাত্মক ভুল হলো, ইনি মনে করেছিলেন হাইড্রোজেনের একটি অ্যাটমের সঙ্গে অক্সিজেনের একটি অ্যাটম মিলে হয় জল। অর্থাৎ ডালটনের মতে জলের ফরমুলা হলো HO অথচ জল যে H_2O সেকথা আজ কারো অজানা নয়। অ্যাটমের সঙ্গে মলিকিউলের অর্থাৎ পরমাণুর সঙ্গে অণুর তফাত অনেক সময়েই তাঁর চোখ এড়িয়ে গেছে। বহু ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণ হয়েছে শুধু একটি জ্ঞানের অভাবে। ডালটন মলিকিউলের রূপ চিনতে না পেরে তাকে অ্যাটম বলে ভুল করেছেন এই কারণে।

এই ভুলটা সংশোধন করলেন ইটালির এক অধ্যাপক, তাঁর নাম আভোগাড্রো। তিনি দেখান গ্যাসীয় পদার্থ তৈরি হয়েছে মলিকিউল দিয়ে। কয়েকটি অ্যাটম পারস্পরিক টানে একত্র হয়ে সৃষ্টি করে একটি মলিকিউল। হিলিয়ম, নিয়ন ইত্যাদি কয়েকটি বিশিষ্ট গ্যাস ছাড়া প্রত্যেক গ্যাসের ক্ষুদ্রতম কণা হলো মলিকিউল। অবশ্য আভোগাড্রোর এই থিওরি স্বীকৃতি পেতে বেশ কিছুদিন লেগে গিয়েছিল।

রসায়নে আবিষ্কার

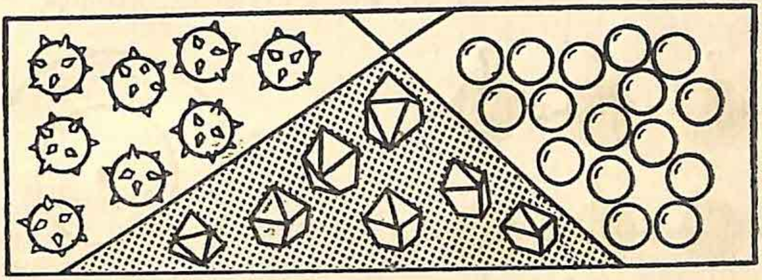
ততদিনে আরম্ভ হয়েছে রসায়নে এক নতুন উদ্দীপনার যুগ। বসে বসে কেবল দার্শনিক চিন্তার ধোঁয়াজাল তৈরি করা ছেড়ে বিজ্ঞানীরা তৎপর হয়ে উঠলেন যে-যার ল্যাবরেটরিতে। অনেকগুলি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেল এই ক'রে। রাশিয়ায় মেণ্ডেলিফ অ্যাটমের ওজন অনুযায়ী মৌলিক পদার্থগুলি কয়েকটি ভাগে ভাগ করে এক বিরাট পর্যায় সারণি সাজালেন। দেখা গেল কিছু-কিছু পদার্থের সঙ্গে অন্যগুলির বেশ সাদৃশ্য রয়েছে—যেমন সোডিয়মের

সঙ্গে লিথিয়ম, অথবা বেরিলিয়মের সঙ্গে ম্যাগনেসিয়ম। মেণ্ডেলিফ যদিও সবগুলি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পান নি, তবু সম্ভাব্য পদার্থগুলি এবং তাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে গিয়েছিলেন উত্তরকালে সেই সব পদার্থের খোঁজ ঠিকই পাওয়া গিয়েছিল।

নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে গত শতাব্দীতে কতকগুলো ধারণা বদ্ধমূল তথ্যে পরিণত হলো। পরমাণুই কি পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবস্থা ? এর সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল নানা কাণ্ডের পর। কিন্তু পরমাণু কি অবিভাজ্য ? এ প্রশ্ন নিয়ে আবার চিন্তা শুরু হলো বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পর, যখন জানা গেল বিদ্যুৎ চলাচলের কারণ ইলেকট্রনের প্রবাহ। এই ইলেকট্রনও পরমাণুর মধ্যে থেকেই বেরচ্ছে। আবার ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে ঘটল এক চমকপ্রদ আবিষ্কার। বেকেরেল, পিয়ের কুরী ও মাদাম কুরী এই তিনজন সন্ধান পেলেন তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইউরেনিয়মের। কিছুদিনের মধ্যে মাদাম কুরী নিজেই আবিষ্কার করলেন রেডিয়ম, যা আরো বেশি তেজস্ক্রিয়। পরমাণুর জীবন-কাহিনীতে রেডিয়মের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রেডিয়ম থেকে যে নীলচে আভা বেরোয়—যে জন্য এর নাম দেওয়া হলো রেডিয়ম—তার রহস্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে এ যুগের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। কুরী-রা পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে রেডিয়মের পরমাণুগুলি ক্রমাগত নিজে থেকে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে আর পরমাণুর অবিভাজ্য কেন্দ্র থেকে শক্তি ও কণা বেরিয়ে আসছে। পরমাণু তাহলে আর অবিভাজ্য রইল না। ডিমোক্রিটাসের থিওরি ধূলিসাৎ হলো কুরীদের এই আবিষ্কারে। যদি কোনো আবিষ্কারকে যুগান্তকারী বলা যায় তবে তা নিঃসন্দেহে তেজস্ক্রিয়তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এই পরমাশ্চর্য ঘটনা যে কত দিকে কত নতুন চিন্তা ও তথ্যের দ্বার খুলে দিল সেকথা বিস্তারিতভাবে বলতে অনেক জায়গা ও সময় দরকার। তেজস্ক্রিয়তা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের সহচর।

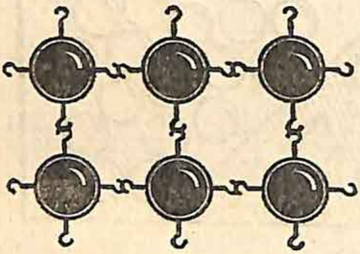
এই নিয়েই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের থাকতে হবে। কিন্তু সে আলোচনা যথাস্থানে করা যাবে। আপাতত পরমাণু সম্বন্ধে শেষ অবধি বিশেষজ্ঞরা কি সিদ্ধান্তে পৌছলেন সেটা একটু অনুধাবন ক'রে দেখা যাক।



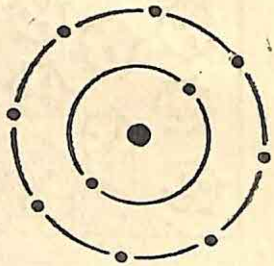
ডিমোক্রিটাসের অ্যাটম

আড়াই হাজার বছর আগে ডিমোক্রিটাস ভেবেছিলেন পরমাণু আছে কয়েক রকমের। কোনোটা বলের মতো মসৃণ ও গোল, কোনোটা চৌকো, কোনোটা বা এবড়ো-খেবড়ো। জলের পরমাণু গোল, ধাতব পদার্থের পরমাণু অসমান—এই রকম সব ধারণা ছিল ডিমোক্রিটাসের। তার বহুদিন পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে গ্যাসেণ্ডি পরমাণুর আর একরকম চেহারার কল্পনা করলেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল কঠিন বস্তুর পরমাণুগুলি পরস্পর শক্ত হয়ে বাঁধা আছে কি দিয়ে। এদের মধ্যে নিশ্চয় চুম্বকের মতো কিছু আছে যেটা সাঁড়াশি বা হুকের মতো এদের পরস্পরকে আটকে রেখেছে। শুনলেই বোঝা যায় যে গ্যাসেণ্ডি আধুনিক আণবিক মতবাদের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছিলেন। পরমাণুদের নিজেদের মধ্যে টান সম্বন্ধে স্পষ্ট ক'রে না হলেও খানিকটা ধারণা হয়েছিল তাঁর। গ্যাসেণ্ডি যখন তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন, তখনও কিন্তু নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অজানাই ছিল। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইংরেজ বিজ্ঞানী লর্ড রাদারফোর্ড সন্দেহাতীতভাবে দেখালেন যে পরমাণুর মধ্যে আছে একটি নিউক্লিয়াস, অতি অল্প জায়গা জুড়ে।

রাদারফোর্ডের সঙ্গে নীল্‌স বোর সংযুক্তভাবে প্রথম তৈরি করলেন পরমাণুর একটি নির্ভরযোগ্য মডেল। এই মডেলে দেখা গেল পরমাণুর ভেতরে আছে একটি কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস আর তাকে কেন্দ্র ক'রে ঘূর্ণ্যমান সব ইলেকট্রন-কণা। সমস্ত জিনিসটা যেন সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে গ্রহদের প্রায়-বৃত্তাকার পথে ছুটে চলার মতো। ইলেকট্রন ও



গ্যাসেণ্ডির অ্যাটম



রাদারফোর্ড - বোর অ্যাটমের মডেল

নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে দুই বিপরীত চার্জ—তাদের মধ্যে টানের জন্য আস্ত পরমাণুটি আছে নিটোল হয়ে, ভেতরের কণাগুলি এদিক-ওদিক ছিটকে যাচ্ছে না।

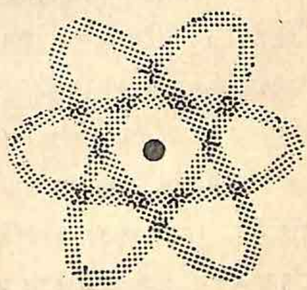
কথাটা এত সহজে শেষ হবার নয়, বরং ঠিক উল্টোটাই ঘটল। পরমাণুর আসল চেহারা জানতে পারার পর থেকে শুরু হলো পরমাণুর আরো গভীর অনুশীলন। নিউক্লিয়াসের লীলা বিচিত্র, তাকে বুঝতে পারার উদ্দেশ্যে তোড়জোড় শুরু করলেন বিজ্ঞানীরা—নিউক্লিয়াস কি দিয়ে তৈরি, এর মধ্যে কি ধরনের শক্তি কাজ করছে—সেগুলি নিজেদের মধ্যে বাঁধা আছে কি দিয়ে, এমন কি কোনো উপায় আছে যাতে এই নিউক্লিয়াসকেও ভাঙা যেতে পারে—এইরকম সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে মানুষ শেষ অবধি পৌঁছে গেল 'ফিশন'-এ—যার প্রথম কার্যকর রূপ দেখতে পাওয়া গেল গত মহাযুদ্ধের সেই দুটি বিধ্বংসী অ্যাটম বোমায়।

পরমাণু কি দিয়ে তৈরি

এতদিনে জানা গেল

এতদিন সমস্যাটা ছিল পরমাণু আছে কি নেই। এখন দেখা গেল পরমাণু আছে। বস্তুর সবচেয়ে ছোট টুকরো হলো পরমাণু—এ বিষয়ে সব সন্দেহের অবসান হলো। কিন্তু পরমাণুকে ঘিরে এবার ঘনিয়ে উঠল আরো নতুন সব রহস্য। এই পরমাণু জিনিসটি কেমন ? পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু যা দিয়ে তৈরি তার নিজের চেহারাই বা কিরকম ? সোজা কথায়, পরমাণু কি দিয়ে তৈরি ?

এই সব প্রশ্ন নিয়ে বহু দেশের বহু বিজ্ঞানী মাথা ঘামিয়ে আর পরীক্ষা ক'রে খানিকটা সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছেছেন। পরমাণুর গঠন এখন মোটের উপর জানা। পাশের ছবিটি আজকাল এত বেশি দেখা যায় যে পরমাণুর ছবি বলে একে নতুন ক'রে বোঝানো নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এইসব রেখাগুলির অর্থ প্রথমেই বলে দিলে তা যেন হবে ডিটেকটিভ গল্পের শেষ পাতাগুলো আগে পড়ে নেওয়ার মতো। কাজেই গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত যেমনভাবে আবিষ্কারের পর আবিষ্কার হয়ে একে একে পরমাণুর সব অজানা সূত্র জানা গেছে মোটামুটি সেইভাবে এগোনো যাক।



পরমাণু এতই ছোট যে সাদা চোখে দূরের কথা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ দিয়েও এর চেহারা ধরা পড়া অসম্ভব। হাতে ক'রে ভাঙতে ভাঙতে শেষ অবধি পরমাণুতে পৌঁছনোর আশাও নেহাত বাতুলতা। মানুষ কিন্তু না দেখেই এর চেহারা কল্পনা ক'রে এসেছে।

পরমাণু কি ভাঙা যায় ?

বহুকাল এই ধারণা চলে এসেছে যে পরমাণু অবিভাজ্য, তাকে আর ভাঙা চলে না। পরমাণু হলো বস্তুর সর্বশেষ ও আদি অবস্থা যার পরে বস্তুর আর রূপান্তর নেই। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে দেখা গেল যে এ ধারণা ঠিক নয়। পরমাণুরও আরো ভাগ আছে। অনেকগুলি পরমাণু বা অ্যাটম মিলে তৈরি হয় একটি অণু বা মলিকিউল, আর অ্যাটম নিজেই আরো কতকগুলি মৌলিক কণিকা দিয়ে তৈরি। পরমাণুর ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে শক্তি ঢুকছে, বেরোচ্ছে, পাওয়া যাচ্ছে উত্তাপ আর তেজস্ক্রিয়তা ; সুতরাং পুরাকালের সেই আস্ত নিটোল পরমাণুর ধারণা বদলে গিয়ে খুলে গেছে তার মধ্যেকার এক বিচিত্র রহস্যময় জগৎ। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আমরা পরে আলোচনা করব। কিন্তু পরমাণুর মধ্যে যে আরো কিছু আছে তার নিদর্শন অনেকদিন আগেই পাওয়া গিয়েছিল, যদিও তার সত্যিকার প্রকৃতি অজানা ছিল বহুদিন।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে বিদ্যুতের কথা। কিছু-কিছু জিনিসের যে বৈদ্যুতিক গুণ আছে সেটা অতি প্রাচীনকালে, খ্রীস্ট-জন্মের কয়েকশো বছর আগেও গ্রীক দার্শনিক থালেস লক্ষ্য করে-ছিলেন। মসলিন দিয়ে ঘসলে অ্যাম্বার বা তৈল-স্ফটিকের দণ্ডে তড়িৎ উৎপন্ন হয় যা ছোট খড়-কুটো বা কাগজ টেনে নেয়—এটা তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন। ঘটনাটা অবশ্য এখন আর এমন কিছু নতুন বলে মনে হবে না। আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি শীত-কালে শুকনো চুল চিরুনি দিয়ে আঁচড়ালে চুল ও চিরুনির মধ্যে ঐরকম স্থির-তড়িতের জন্ম হয়। বিদ্যুৎ নিয়ে প্রথম বিজ্ঞান-সম্মতভাবে পরীক্ষা করা হয় ইংলণ্ডে, থালেসের প্রায় দু-হাজার বছর পরে। বিজ্ঞানী গিলবার্ট এই পরীক্ষাটি করেন রাণী প্রথম এলিজাবেথের সামনে। অ্যাম্বার ঘসলে ছটা বেরয় বলে গ্রীকরা এর নাম দিয়েছিলেন 'ইলেক্ট্রা'—গ্রীক ভাষায়—এর অর্থ 'ছটা-ছড়ানো-সূর্য'। কথাটা ল্যাটিনে চলে যায় 'ইলেক্ট্রাম' নামে,

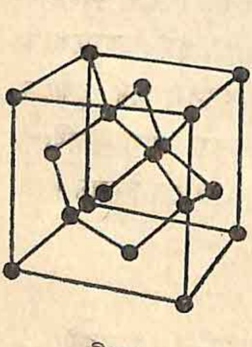
বিশেষণে 'ইলেক্‌ট্রিয়েনস'। সেই থেকে ইংরাজিতে 'ইলেকট্রিক' বা ইলেক্‌ট্রিসিটি। ইলেক্‌ট্রিসিটি বাংলায় তড়িৎ বা বিদ্যুৎ। ক্রমশ তড়িতের আধান বা চার্জ সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা হয়। আমেরিকার বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন এই সম্পর্কে অনেক উল্লেখযোগ্য তথ্য বার করেন। তিনিই বিদ্যুতের দুটি বিপরীতধর্মী আধান বা চার্জের সন্ধান পান ও তাদের নাম দেন পজিটিভ ও নেগেটিভ ইলেক্‌ট্রিসিটি। এর পর এলেন মাইকেল ফ্যারাডে। তড়িৎ-প্রবাহের ব্যবহার, তার গুণের আবিষ্কার ও প্রয়োগে ইনি হলেন বহু নতুন পথের প্রদর্শক। বিদ্যুৎশক্তি নিয়ে এর পরে অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণা চলল। ক্রমে ক্রমে বৈদ্যুতিক শক্তিকে বশ ক'রে লাগান হলো নানারকম কাজে—সে সব কথা সকলেরই জানা। বিদ্যুৎ ছাড়া আজকালকার সভ্য সমাজে জীবনযাত্রা অচল। কখনো-সখনো ঘন্টাখানেকের জন্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে যে কি মুস্কিলেই পড়তে হয় সে অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। তবে অনেকদিন বৈদ্যুতিক শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে লোকেদের সঠিক কোনো ধারণা ছিল না। নানারকম আজগুবী মত প্রচলিত ছিল। একসময় লোকে ভাবত বিদ্যুৎ হলো একরকমের তরল পদার্থ কেননা এটা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় প্রবাহিত হয়। জড় বস্তুর তড়িৎ-ধর্ম ব্যাখ্যা করতে আরো অনেক রকম থিওরি খাড়া করা হয়েছিল। গবেষণায় দেখা গিয়েছিল ভেতর থেকে হাওয়া বের করে নেওয়া কাঁচের নলে নিম্নচাপে গ্যাস পুরে নলের দুধারে উচ্চমানের তড়িৎ বিভব প্রয়োগ করলে দুরকম রশ্মির সৃষ্টি হয়—এক : পজিটিভ রশ্মি, দুই : ক্যাথোড রশ্মি যার আধান নেগেটিভ। কিন্তু তড়িতের আসল ধর্ম বুঝতে তখনো অনেক বাকি। এর সত্যিকার হদিশ পাওয়া গেল উনবিংশ শতাব্দীর শেষে যখন ইলেক্‌ট্রন আবিষ্কার করলেন জে জে টমসন।

ইলেকট্রন কি ?

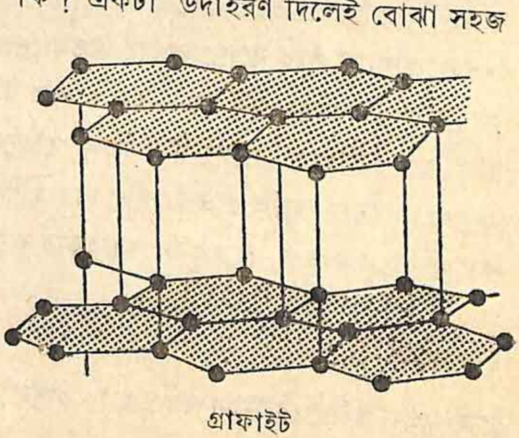
জানা গেল তড়িতের উৎস অতি-ক্ষুদ্র-কণিকা ইলেক্‌ট্রন। ইলেক্‌ট্রনের

প্রবাহই তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে। ইলেক্ট্রনগুলিতে আছে নেগেটিভ চার্জ। এর ভর খুব কম — সব থেকে হাল্কা হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় দু-হাজার ভাগের একভাগ। আমাদের জানা গ্রাম এককে $৯\cdot১ \times ১০^{-২৮}$ গ্রাম। দশমিকে লিখলে এটা হবে ০·০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০৯১ গ্রাম। ইলেক্ট্রনের আয়তন যদি গোল ধরা যায় তবে তার ব্যাস হবে প্রায় $১০^{-১২}$ সেন্টিমিটার, অর্থাৎ ০·০০০০০০০০০০০১ সেন্টিমিটার। এই অতি ছোট ইলেক্ট্রনগুলির উৎস পরমাণু ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না। মানুষের মনে দ্বিধা জাগল — তবে কি পরমাণু অবিভাজ্য নয় ?

পরমাণু দিয়ে বস্তু গঠনের রহস্য ভেদে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার 'এক্স-রে'র আবিষ্কার করেন রয়েণ্টগেন ১৮৯৫ সনে। আবিষ্কর্তার নামানুসারে এক্স-রেকে রয়েণ্টগেন-রশ্মি বলা হয়। স্ফটিকাকার বস্তুগুলির মধ্যে বিভিন্ন মৌল পরমাণুগুলি কেমনভাবে সাজানো আছে তার প্রথম নির্ভুল খবর দিল এক্স-রে। সাধারণ লবণ বা সোডিয়ম ক্লোরাইডের অণু নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন দুই বিজ্ঞানী, পিতা-পুত্র, উইলিয়াম ব্র্যাগ ও লরেন্স ব্র্যাগ। এক্স-রে দিয়ে অণুর গঠন-প্রণালী বিশ্লেষণ ক'রে এঁরা দুজনে একসঙ্গে নোবেল প্রাইজ পান। ছেলে লরেন্সের বয়স তখন মাত্র চব্বিশ। এঁদের গবেষণার উপর ভিত্তি করেই এক্স-রে কেলাস-বিদ্যা বা ক্রস্টালোগ্রাফি গড়ে উঠেছে। স্ফটিক বা কেলাসের বিশেষত্ব কি ? একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা সহজ



হীরে



গ্রাফাইট

হবে। হীরে আর পেন্সিলের সীসের গ্রাফাইট — দুটোই কার্বন-পরমাণু দিয়ে তৈরি। হীরে খুবই শক্ত, কিন্তু পেন্সিলের সীস কেন এত নরম? ছুরি দিয়ে হীরে কাটা যায় না অথচ কাগজে ঘসলেই পেন্সিলের সীস ক্ষয়ে যায়, তার কারণ কি? এর উত্তর হলো দুটিতে পরমাণু সাজানো আছে ভিন্নভাবে। হীরের মধ্যের পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট ধারায় এমনই আঁট হয়ে আছে যে তাদের ভেঙে আলাদা করা অসম্ভব কিন্তু গ্রাফাইটে কার্বন-পরমাণুগুলির মধ্যে তেমন জোরালো কোনো বাঁধন নেই।

বেকেরেলের চাবি

এক্স-রে আবিষ্কারের পরের বছরই পদার্থবিজ্ঞানে আর একটি যুগান্ত-কারী আবিষ্কার হলো ফরাসি বিজ্ঞানী বেকেরেলের হাতে — বার হলো রেডিও-অ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা। তাঁর আবিষ্কারের যে কাহিনী চালু তা রহস্য-উপন্যাসের মতোই রোমাঞ্চকর। বেকেরেল গবেষণা করছিলেন এক্স-রের উৎপত্তি নিয়ে। তাঁর ধারণা ছিল এক্স-রে এক ধরনের প্রতিপ্রভা। প্রতিপ্রভ বস্তুগুলির বিশেষত্ব হলো এই যে এগুলি সূর্যের আলোয় রাখলে তার থেকে আলো আহরণ করে এবং পরে অন্ধকারে আলো বিকিরণ করে। আমাদের নিত্যকার ব্যবহৃত রেডিয়ম-ডায়েল ঘড়িতে যেমন করে কাঁটাগুলি জ্বলে। বেকেরেল দিনের পর দিন খনিজ ইউরেনিয়মের চাঁই নিয়ে সূর্যের আলোয় রাখতেন এবং পরে সেই চাঁই অন্ধকারে ফোটোগ্রাফিক প্লেটের উপর বসিয়ে দেখতেন ঐ চাঁই থেকে আলো বেরিয়ে প্লেটের উপর দাগ পড়েছে কিনা। বলা বাহুল্য, কাজ খুব সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলছিল। তারপর একদিন আকাশে মেঘ দেখা দিল। সারাদিন সূর্যের দেখা নেই। বেকেরেল ভাবলেন আজ আর কাজ হলো না। তিনি কালো কাগজে মোড়া ফোটোগ্রাফিক প্লেটটি টেবিলের উপর রাখলেন। তার উপর একটি বড় চাবি চাপা দিলেন, তারপর কিছু না ভেবেই একটা ইউরেনিয়মের বড় ঢেলা তারও উপরে চাপা দিয়ে

বাড়ি চলে গেলেন। পরের দিন কি খেয়াল হলো, তিনি ফোটো-গ্রাফিক প্লেটটা ডেভেলপ ক'রে দেখতে গেলেন সেটি ঠিক আছে কিনা। যেহেতু ওটিতে কোনো আলো লাগানো হয় নি, সেহেতু ওটি একেবারে সাদা থাকা উচিত ছিল। তাঁর সেই হঠাৎ-খেয়ালই যে এক নতুন আবিষ্কারের সূত্র এনে দেবে তা কি তিনি জানতেন? প্লেট ডেভেলপ ক'রে দেখা গেল প্লেটটি কালো হয়েছে, তবে যেখানে চাবিটি ছিল তা সাদা — ঐ বড় চাবিটির পরিষ্কার ছবি রয়েছে — অর্থাৎ ঐ ইউরেনিয়মের ঢেলা থেকে আর এক নতুন অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়েছে যা চাবিকে ভেদ করতে পারে নি, কিন্তু ফোটোগ্রাফ প্লেটের উপরের কাগজ ভেদ ক'রে প্লেটকে কালো ক'রে দিয়েছে। আরো পরীক্ষার পর দেখা গেল সূর্যের আলো লাগুক বা না লাগুক ইউরেনিয়ম থেকে সব সময়েই এই রশ্মি বেরচ্ছে। বেকেরেল এই অদ্ভুত ঘটনা দেখে বিচলিত হয়ে অন্ধকার ঘরে ইউরেনিয়ম নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। প্রতিবার একই ফল পাওয়া গেল। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন তাঁর দুই বিশিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী — পিয়ের কুরী আর মাদাম কুরী। আবিষ্কৃত হলো তেজস্ক্রিয়তা। গবেষণার ফল থেকে জানা গেল ইউরেনিয়ম থেকে সব সময় তিন রকমের তেজস্ক্রিয় রশ্মি বার হচ্ছে — এদের একটির নাম দেওয়া হলো আলফা-রশ্মি। এগুলি পজিটিভ-আহিত কণিকা। দ্বিতীয়টির নাম হলো বিটা-রশ্মি, যেগুলি আমাদের পূর্ব পরিচিত নেগেটিভ আধানবাহী ইলেকট্রন এবং তৃতীয়টির নামকরণ হলো গামা-রশ্মি — এগুলি এক্স-রের থেকেও ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তড়িৎ-চুম্বকীয় রশ্মি।

এই অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে কুরী-দম্পতি পুরোদমে পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। তাঁদের এই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা আজও সারা পৃথিবীর কাছে আশ্চর্যের বিষয় হয়ে আছে। ইতিমধ্যে পিয়ের কুরী মারা যান। মাদাম কুরী একাই গবেষণা চালিয়ে গেলেন। এক টন খনিজ ইউরেনিয়ম বা পীচব্লেণ্ড থেকে দিবারাত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়া ক'রে বার করলেন আর এক রকমের মৌল যার বিকিরণ-ক্ষমতা

ইউরেনিয়মের থেকেও বেশি। এই মৌল পাওয়া গিয়েছিল এক আউন্সের তিনশো ভাগেরও একভাগ — এর নাম, দেওয়া হলো রেডিয়ম।

মৌল নিজে থেকে বদলে যায়

ঐ সময় ইংলণ্ডে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কৃত হলো আর একটি নতুন তেজস্ক্রিয় মৌল —থোরিয়ম। ১৯০২ সনে রাদারফোর্ড ও সডি তেজস্ক্রিয়তার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি উক্তি করেন। তার তাৎপর্য হলো পরমাণু নিজে থেকে ভেঙে গিয়ে একটি আহিত কণা বাইরে বার ক'রে দেবার পর সম্পূর্ণ অন্য একটি মৌলে পরিণত হচ্ছে। এই মৌলের প্রকৃতিও হয়ে যাচ্ছে একেবারে আলাদা। কথাটা শুনে মনে পড়ে যায় মধ্যযুগের সেই সব কিমিয়াবিদ্‌দের কথা যারা বিশ্বাস করত যে বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়ে তারা লোহা, সীসে প্রভৃতি ধাতু থেকে সোনা তৈরি করতে পারে। তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার যেন অনেকটা সেই আশ্চর্য জাদু— যার ফলে এক বস্তুর অন্য বস্তুতে রূপান্তর স্বীকার ক'রে নেওয়া হলো।

১৯০০ সন নাগাদ পরমাণু সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছল যে পরমাণু যে আরো কতকগুলি মৌলিক কণার সমন্বয়ে উৎপন্ন একথা না মেনে নিলে আর চলে না। কিন্তু তখনো পর্যন্ত অ্যাটমের গঠন কি, তার চূর্ণ হবার সম্ভাবনা আছে কি না, এসব তথ্য অজানাই ছিল। সেই সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা পরমাণু অবিভাজ্য বলেই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু পরমাণু থেকে তেজস্ক্রিয়তা বা পরমাণুর ভেঙে যাওয়ার গুণটি সমস্ত বিজ্ঞানীমহলে বহুদিনের বিশ্বাসের মূলে কঠিন আঘাত দিল। দেখা গেল থোরিয়ম, রেডিয়ম প্রভৃতি কয়েকটি তেজস্ক্রিয় মৌল নিজেদের দেহ থেকে তেজ-কণা বার ক'রে দিয়ে এক সম্পূর্ণ নতুন মৌলে পরিণত হচ্ছে। এই শুনে বিজ্ঞানীমহলে তাক লেগে গেল। এইসব নতুন জানা প্রাকৃতিক

তথ্যগুলি ভাল ক'রে বুঝতে গেলে এখন পরমাণুর চেহারা নতুন ক'রে কল্পনা করা দরকার। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকটা তাই বিজ্ঞানের, বিশেষত পদার্থবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণ। মানুষের বুদ্ধির সামনে বিশ্বপ্রকৃতি এক বিরাট সমস্যা উপস্থাপন করল। কিন্তু এই সমস্যা-সমাধানের ভার গ্রহণ করার মতো যোগ্যতা নিয়ে জনকয়েক দিক্‌পাল মনীষীও জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই একই সময়ে — বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই দুটি ঘটনাই চিরকাল ধরে সমান বিস্ময় উদ্রেক করবে।

পরমাণুর গঠন-নির্ণয়ে যাঁদের অবদান যুগান্তকারী বলে স্বীকৃত তাঁরা হলেন :

১. ম্যাক্‌স্ প্ল্যাংক — কোয়ান্টামবাদের জন্য।

২. লর্ড রাদারফোর্ড — পরমাণুর কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব প্রথম প্রমাণ করেন এবং তেজস্ক্রিয়তার বহু রহস্যের সমাধান করেন।

৩. অ্যালবার্ট আইনস্টাইন — যাঁর অবিনশ্বর কীর্তি হলো আপেক্ষিকবাদ ও তার অনুসরণ ক'রে শক্তি ও ভরের তুল্যমূল্যতার সমীকরণ।

৪. নীল্‌স বোর — অন্য তিনজনের সূত্রগুলি একসঙ্গে গেঁথে পরমাণুর ও পরমাণুর নিউক্লিয়াসের যুক্তিসম্মত মডেল তৈরি করেন।

নীল্‌স বোরকে বন্দনা

নীল্‌স বোর ১৯৬০ সালে কলকাতায় এসেছিলেন মেঘনাদ সাহা-স্মৃতি বক্তৃতা দিতে। শুধু আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানেই নয় সমসাময়িক সমস্ত বিজ্ঞানীদের উপর তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রভাব ছিল প্রায় কিংবদন্তীর মতো। কথিত আছে কেউ কোনো জটিল সমস্যার

সমাধান না খুঁজে পেলে ছুটতেন তাঁর কাছে। আজ থেকে ছাপ্পান্ন বছর আগেও তিনি বিজ্ঞানীদের কাছে কত প্রিয় ছিলেন তার প্রমাণস্বরূপ নিচের কবিতাটি দেওয়া হলো। এটি লিখেছিলেন রুশ বিজ্ঞানী ভি এ ফক ১৯২০ সনের কাছাকাছি। কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ অনুসরণ করলে বাংলায় এই রকম শোনায়:

কে পারে বর্ণিতে তব গুণাবলী
ওহে নীল্ বোর
যদিও অবোধ মোরা
তত্ত্ব তব বড়ই কঠোর
অর্থ কিছু নাই বুঝি
বিনা বাক্যে করিব নির্ভর
সেই সূত্র চিরন্তন যাহার প্রণেতা তুমি
অথবা ঈশ্বর।
বলবিদ্যা ভৃত্যসম
সভয়ে তোমার প্রতি চায়
তুমি না ভরসা দিলে
ধূলিসাৎ হবে হায় হায়
কোয়ান্টাম তব ভয়ে কম্পিত
চরণে প্রণত ইলেক্ট্রন
কক্ষপথে ধায়, করে
তোমার আদেশে বিকিরণ,
অবিরল গতি তুমি তুচ্ছ কর অবহেলে
মৌল সংখ্যা যত
মূর্খেতে জানিত আজ
সকলি তোমার পদানত।

পরমাণুর মডেল

আজকাল আমরা পরমাণুর যে মডেলের সঙ্গে পরিচিত তার নাম

দেওয়া হয়েছে রাদারফোর্ড-বোর মডেল। এই মডেল অনুযায়ী অ্যাটমের মধ্যে আছে একটি কেন্দ্রক যার ইংরেজি নাম নিউক্লিয়াস —আর এই নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে ঘুরছে এক বা একাধিক ইলেক্‌ট্রন। রাদারফোর্ড নির্ভুলভাবে প্রমাণ করেন যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আছে পজিটিভ চার্জ। নেগেটিভ চার্জ-বিশিষ্ট ইলেক্‌ট্রনরা কিন্তু নিউক্লিয়াসের সংস্পর্শে নেই, আছে অনেক দূরে। এ যেন ছোটখাট একটি সৌরজগৎ—অতি ছোট! সূর্যের চারদিকে যেমন নিজের কক্ষপথে ঘুরছে গ্রহের দল, তেমনি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র ক'রে কক্ষপথে ঘুরপাক খাচ্ছে ইলেক্‌ট্রনরা। সৌরজগতের সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হয় পরমাণুর ভেতরের জগৎ সৌরজগতের চেয়ে $১০^{-২২}$ গুণ ছোট। তবে আমাদের ন'টি গ্রহের কক্ষপথ মোটের উপর প্রায় একই সমতলে কিন্তু ভারি পরমাণুতে, যেমন সোনায়, ইলেকট্রনরা অসংখ্য ভিন্ন সমতলে নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরছে।

নিউক্লিয়াসগুলি আবার কি দিয়ে তৈরি এ সমস্যার সমাধান হতে অনেক বছর লেগেছে। সে ইতিহাস বলবার চেষ্টা না ক'রে এখনো পর্যন্ত আমরা যতদূর জানতে পেরেছি সেদিকে নজর দেওয়া যাক। নিউক্লিয়াসে আছে প্রোটন ও নিউট্রন নামে দু'রকম মৌলিক কণা। প্রোটনের পজিটিভ চার্জ আছে কিন্তু নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই। এর ওজন প্রোটনের থেকে অল্প বেশি। সবচেয়ে হাল্কা মৌল হলো হাইড্রোজেন—এর নিউক্লিয়াস কেবল একটি প্রোটন দিয়ে তৈরি, কিন্তু অন্য সব অ্যাটমের নিউক্লিয়াসে আছে একাধিক প্রোটন আর নিউট্রন। হিলিয়মের নিউক্লিয়াসে আছে ২টি প্রোটন ২টি নিউট্রন, অক্সিজেনের ৮টি প্রোটন ৮টি নিউট্রন, লোহার ২৬টি প্রোটন ৩০টি নিউট্রন আর সবচেয়ে ভারি ইউরেনিয়মের ৯২টি প্রোটন ১৪৬টি নিউট্রন। ওজনে প্রোটন ইলেক্‌ট্রনের চেয়ে প্রায় ২০০০ গুণ ভারি। এর আধান বা চার্জ ইলেক্‌ট্রনের চার্জের সমান কিন্তু বিপরীতধর্মী।

ছোট না বড় ?

বহুদিন পর্যন্ত পরমাণুর অবিশ্বাস্যরকম ক্ষুদ্র আয়তনই ছিল আশ্চর্যের বস্তু। কিন্তু পরমাণুর গঠন যখন জানা হয়ে গেল তখন নিউক্লিয়াসের তুলনায় তার এই আয়তনই মনে হতে লাগল যেন অসম্ভব রকম বিরাট। নিউক্লিয়াস যদি হয় একটি গুলির আকারের, তবে পুরো পরমাণু তিনশো ফুট ব্যাসার্ধের একটি বিরাটাকার গোলা। কেন এত বড় হবে পরমাণু ? নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেক্‌ট্রনরা এত দূরে ঘুরছে যে উপমা দিতে গেলে বলতে হয় ইডেন গার্ডেনে রাখা একটি ক্রিকেট বল যদি হয় নিউক্লিয়াস তবে ইলেক্‌ট্রনদের কক্ষপথগুলি হবে বালি-উত্তরপাড়া দিয়ে, অর্থাৎ সাত-আট মাইল দূরে। সাধারণভাবে পরমাণুর গড় ব্যাস $১০^{-৮}$ সেন্টিমিটারের কাছাকাছি, আর নিউক্লিয়াসের গড় ব্যাস হলো $১০^{-১২}$ সেন্টিমিটার। সবচেয়ে হাল্কা হাইড্রোজেনের পরমাণুর কথা ধরা যাক। এর কেন্দ্রে আছে একটি প্রোটন আর বাইরে আছে একটি ইলেক্‌ট্রন। এ দুটি কণার বিপরীত চার্জ থাকা সত্ত্বেও প্রোটনটি কেন ইলেক্‌ট্রনকে টেনে নিচ্ছে না ? তড়িৎ-ধর্ম অনুযায়ী বিপরীত আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে। অথচ ইলেক্‌ট্রনরা কি ক'রে প্রোটনের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ?

সৌরজগৎ ও পরমাণু-জগৎ

উপরিলিখিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল আবার সৌরজগতের আশ্চর্য নিয়মের দিকে তাকিয়ে। সূর্য ও পৃথিবী যে পরস্পরকে টানছে এ তো জানা কথা, তবে পৃথিবী কেন ছিটকে গিয়ে সূর্যের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে না ? ঢুকছে না তার কারণ পৃথিবী সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকারে ঘোরার ফলে যে কেন্দ্রাতিগ বল উৎপন্ন হচ্ছে সেটা ঐ মহাকর্ষের টানের বিপরীতমুখী। ইলেকট্রনরাও নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরছে বিষমবেগে — কেন্দ্রাতিগ বলের সঙ্গে ইলেক্‌ট্রন-প্রোটনের বৈদ্যুতিক আকর্ষণ যুক্ত হয়ে গতিসাম্য বজায় রাখছে।

এর থেকে জানা গেল পরমাণুর ভেতরের বেশিটাই ফাঁকা, তার

মধ্যে দিয়ে তীরবেগে ঘুরপাক খাচ্ছে ইলেক্‌ট্রনরা। গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস মন্তব্য করেছিলেন পৃথিবীতে আছে শুধু অ্যাটম আর শূন্যতা। কথাটা তিনি মোটেই ভুল বলেন নি। তাঁর ধারণা যে কতখানি সত্যি সেটা একেবারে হাতেনাতে প্রমাণ করলেন রাদারফোর্ড ও বোর তাঁদের অ্যাটমের মডেল দিয়ে।

কি দিয়ে টেনে রেখেছে ?

আগেই বলা হয়েছে যে প্রোটন বা নিউট্রনের চেয়ে ইলেক্‌ট্রন প্রায় দু-হাজার গুণ হাল্কা। সুতরাং যে-কোনো পরমাণুর ভর যে তার নিউক্লিয়াসের ভর দিয়ে নির্ধারিত হবে সেকথা বলাই বাহুল্য। আগে একথাও বলা হয়েছে যে পরমাণুর কেন্দ্রে অতি সামান্য জায়গা জুড়ে আছে নিউক্লিয়াস — যা প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে তৈরি। যে-কোনো একটি ভারি মৌলের পরমাণুতে অনেকগুলি প্রোটন ও নিউট্রন আছে, যেমন লোহার নিউক্লিয়াসে আছে ২৬টি প্রোটন ও ৩০টি নিউট্রন। এখন প্রশ্ন ওঠে এতগুলি এক ধরনের আধান (চার্জ) একসঙ্গে আছে কি ক'রে। তড়িতের ধর্ম অনুযায়ী অনুরূপ আধানে সৃষ্টি হয় বিকর্ষণ ; সুতরাং নিউক্লিয়াসের স্বল্প পরিধির মধ্যে এতগুলি অনুরূপ আধানের বিকর্ষী বল সবগুলি কণাকে ছিটকে ফেলে দিচ্ছে না কেন? এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। পরীক্ষা ক'রে সদুত্তর পাওয়া গেল। দেখা গেল নিউক্লিয়াসের ভেতরে কাজ করছে একটি বিশিষ্ট আকর্ষী বল যেটি প্রোটন ও নিউট্রনদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধনের কাজ করছে। এই বিশিষ্ট বল, যাকে বলা হয় নিউক্লিয়ার ফোর্স বা কেন্দ্রিণ বল, নিউক্লিয়াসের পরিধির মধ্যেই কার্যকর। এর ধর্ম আমাদের পরিচিত মহাকর্ষ বা তড়িৎ-বলের চেয়ে অন্যরকম। এই টান বা বলের উৎস কোথায়? একটা উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। হিলিয়মের নিউক্লিয়াসে আছে ২টি প্রোটন ও ২টি নিউট্রন। প্রোটন ও নিউট্রনের নিজস্ব ওজন জানা আছে। আবার হিলিয়ম নিউক্লিয়াসের ওজনও পরীক্ষা ক'রে জানা গেছে। কিন্তু দেখা যায়

২টি প্রোটন ও ২টি নিউট্রনের ভর হিলিয়মের নিউক্লিয়াসের ভরের থেকে কিছু বেশি। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে বোঝা দরকার। নিউক্লিয়াসের ভরের কথা বলার সময় একটি বিশিষ্ট একক ব্যবহার করা হয়। তার নাম অ্যাটমিক মাস ইউনিট (এ-এম-ইউ) বা পরমাণু-ভরের একক। এই একক অনুযায়ী কার্বন-১২ আইসোটোপের ভর ১২ বলে ধরা হয়েছে। এই নিয়মে প্রোটনের ভর ১·০০৭৯৭ আর নিউট্রনের ভর ১০·০৮৬৬৫। অবশ্য গ্রাম-এককে এটা এতই ছোট যে এটা ব্যবহার করা অসুবিধাজনক, তবু জেনে রাখা ভাল যে আমাদের পরিচিত গ্রামের হিসেবে পরমাণু-ভরের একক হচ্ছে $১·৬৫৯৮ \times ১০^{-২৪}$ গ্রাম। এখন হিলিয়মের নিউক্লিয়াস-ভরের রহস্যে ফিরে আসা যাক। অঙ্ক কষে দেখা যাবে ২টি প্রোটন আর ২টি নিউট্রন মিলে হচ্ছে—

$$২ \times ১·০০৭৯৭ + ২ \times ১·০০৮৬৬৫$$

$$= ৪·০৩৩২৭ \text{ পরমাণু-ভর-এককে।}$$

কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে হিলিয়ম নিউক্লিয়াসের ভর হলো ৪·০০২৬ পরমাণু-ভর-এককে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একটা পার্থক্য থেকে যাচ্ছে (৪·০৩৩২৭ − ৪·০০২৬) = ০·০৩০৬৭ পরমাণু-ভর-এককে। এই পার্থক্য থাকার জন্যে অঙ্কটা মিলল না। দুই আর দুই-এ চার না হয়ে, হয়ে গেল চারের কিছু কম। ঐ ০·০৩০৬৭ পরমাণু-এককের ভর তবে গেল কোথায়? আইনস্টাইনের সূত্র খুঁজে বার করল একে। ঐ হারানো ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে নিউট্রন-প্রোটনগুলিকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে ধরে রেখেছে। একে বলা হয় বন্ধন-শক্তি। এই হলো কেন্দ্রিণ বলের উৎস। অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে একটি হিলিয়ম নিউক্লিয়াসের দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রনকে বিচ্ছিন্ন করতে গেলে ০·০০৩৬৭ পরমাণু-ভর-এককের অনুরূপ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। হিলিয়মের মতো একই উপায়ে বিভিন্ন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বন্ধন-শক্তি বার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নিউক্লিয়াসের কাণ্ড-কারখানা

আরো তলিয়ে বুঝতে গেলে এবার একটু দম নিয়ে গোটা কতক নিয়ম-কানুন রপ্ত ক'রে নিতে হবে। এটা না করলেই নয়। নিয়মগুলো প্রাকৃতিক হলেও পদার্থবিদ্‌রা এদের যে নামে ডাকেন আমাদেরও সেই নাম ধরে ডাকতে হবে। নামগুলো হলো বল, কার্য, ক্ষমতা, শক্তি আর ভর ও শক্তির তুল্যমূল্যতা।

কয়েকটি অঙ্কের নিয়ম

যে-কটি প্রধান স্তম্ভের উপর পদার্থবিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে বিশেষ দরকারী হলো নিউটনের গতিসূত্রগুলি। এর প্রথমটি হলো জাড্যের সূত্র, অর্থাৎ কোনো একটি বস্তু যদি স্থির থাকে তবে তা চিরকালই স্থির থাকবে যদি না বাইরে থেকে কোনো বল তার ওপর আরোপ করা হয়। দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে কোনো বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার বস্তুটির ওপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক হবে। দ্বিতীয় সূত্রটি অঙ্কে বলতে গেলে এইরকমভাবে বলা হবে :

$$F = ma$$

F হলো বল, m হলো ভর আর a হলো ত্বরণ অর্থাৎ বেগ-পরিবর্তনের হার।

বিজ্ঞানের সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই তাদের কাছে এইসব বর্ণ বা চিহ্নগুলি বেশ একটু খটমট ঠেকবে, কিন্তু এগুলি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জেনে গেলে অতটা কঠিন না-ও লাগতে পারে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যখন বিজ্ঞানকে কাজে লাগান হয় তখন কতকগুলি এককের প্রয়োজন হয়। তাদের নামের সঙ্গে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত, কিন্তু সেগুলোর মানে অনেকেই ভালো ক'রে বুঝি না। পরমাণু-শক্তি কি, কেন, কোথা থেকে আসে ইত্যাদি নিয়ে কিছু বলতে গেলে শক্তির এককের সংজ্ঞা কি এইটুকু নীরস অঙ্কের পথ পেরোতেই হবে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে তেমন আকর্ষণীয় মনে না হলেও ভূমিকা হিসেবে এইটুকু তত্ত্ব আলোচনা করা একান্তই দরকার।

বলের চরম একক বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করা হয়। সি-জি-এস অর্থাৎ সেন্টিমিটার-গ্রাম-সেকেণ্ড পদ্ধতিতে বলের একক হলো 'ডাইন'। এই বল এক-গ্রাম-ভরবিশিষ্ট বস্তুকে প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে এক সেন্টিমিটার ত্বরণ দিতে পারে। আবার এফ-পি-এস অর্থাৎ ফুট-পাউণ্ড-সেকেণ্ড পদ্ধতিতে এই একক হলো 'পাউণ্ডাল' যা প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে এক-পাউণ্ড-ভরের বস্তুকে এক ফুট ত্বরণ দিতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এখন ব্যবহার হয় এস-আই পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ভরের একক কিলোগ্রাম, দূরত্বের একক মিটার, সময়ের একক সেকেণ্ড। বলের একক নিউটন। এক নিউটন এক কিগ্রা ভরের বস্তুতে প্রতি বর্গসেকেণ্ডে এক মিটার ত্বরণ সঞ্চারিত করতে পারে। বল বোঝাতে হলে সেটা কোন্ এককে কতটা এবং কোন্‌দিকে কাজ করছে দুই-ই বলতে হয়। কার্য বলতে সাধারণ-ভাবে আমরা কায়িক পরিশ্রমের কথাই ভাবি, যেমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কোদাল কোপানোও কার্য, আবার আটশো মিটার রেসে দৌড়ে আসাটাও কার্য। পদার্থবিদ্যায় কার্যের একটি বিশেষ মানে আছে। বলের সাহায্যে কোনো বস্তুর স্থানচ্যুতি হলে তবেই কার্য হয় বলে ধরা হয়। বলের প্রয়োগবিন্দু বলের অভিমুখে সরলে বলা হবে বল কার্য করছে। আর বিপরীত মুখে সরলে বলা হবে বলের বিরুদ্ধে কার্য করা হচ্ছে। গাণিতিক সংকেতে একে বলা হয় :

$$W = F \times d$$

অর্থাৎ কৃত কার্য = প্রযুক্ত বল × বলের প্রয়োগবিন্দুর স্থানচ্যুতি। কার্যের চরম একক সি-জি-এস-পদ্ধতিতে 'আর্গ'। এক ডাইন বল প্রয়োগ করলে যদি বলের প্রয়োগবিন্দু বলের অভিমুখে এক সেন্টি-মিটার সরে যায় তবে এক আর্গ কার্য হয়। তবে এই এককটি খুবই ছোট বলে ব্যবহারিক একক ধরা হয়েছে এক 'জুল'। এক 'জুল' হলো $১০^৭$ আর্গ অর্থাৎ এক কোটি আর্গ।

কার্য করার হারকে ক্ষমতা বলা হয়। ক্ষমতা অর্থে এখানে রাজ-

নৈতিক বা অন্য কোনো ক্ষমতা যে নয়, সেকথা বোধ হয় না বললেও চলে। এই ক্ষমতা হলো :

$$p=\frac{W}{t},$$

$$\text{অর্থাৎ ক্ষমতা}=\frac{\text{কৃত কার্য}}{\text{সময়}}।$$

সি-জি-এস পদ্ধতিতে এরও চরম একক হলো প্রতি সেকেণ্ডে এক আর্গ। ব্যবহারিক প্রয়োগে একক হলো প্রতি সেকেণ্ডে এক জুল, যার আর এক নাম ওয়াট। অনেক সময় যানবাহনের ক্ষমতা বোঝানো হয় হর্স-পাওয়ার দিয়ে। যেমন হিন্দুস্থান অ্যামবাসাডর গাড়ি ১৪-হর্স-পাওয়ার-বিশিষ্ট। এই হর্স-পাওয়ারও ক্ষমতার আর একটি ব্যবহারিক একক। এক হর্স-পাওয়ার হলো ৭৪৬ ওয়াট।

এর পরে আমরা এসে পৌঁছচ্ছি 'শক্তি'তে। পদার্থবিজ্ঞানের অভিধানে তা হলো কাজ করার সামর্থ্য। নেহাত অবৈজ্ঞানিক চোখেও পৃথিবীর সর্বত্র সবসময় শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়—গাছপালার বেড়ে ওঠা, সূর্য থেকে আলো, বাতাস, জলপ্রবাহ, আমাদের জীবনধারণ — এ সবই শক্তির এক-একরকম রূপ। বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে, এমন কি দর্শন, চারুকলা, সাহিত্যের মধ্য দিয়েও মানুষ নানারূপে, নানাভঙ্গিতে এই শক্তিরই উপাসনা করে আসছে। শক্তির বিচিত্রতম প্রকাশ হলো প্রাণশক্তি—যা আজও অঙ্কের সূত্রে ধরা যায় নি। পদার্থবিদ্যায় 'শক্তি' শব্দটির ব্যবহার সেদিক দিয়ে অনেক সীমিত। এখানে কেবল জড়বস্তুতে শক্তির লীলা নিয়ে মাথা ঘামানো হয়েছে। পদার্থবিদ্ বলবেন, শক্তি হলো কৃত কার্যের হার ও মোট কাজ করার সময়ের (T) গুণফল :

$$E=p\times T,$$

$$=\frac{W}{t}\times T,$$

t আর T ভিন্ন ভিন্ন সময়।

পদার্থবিদ আরো বলবেন, 'শক্তি নিত্য, এর বিনাশ নেই — এ

কেবল রূপ বদলায়।' এই সব রূপ হলো তাপ, আলো, শব্দ, তড়িৎ, চুম্বক ইত্যাদি। কিন্তু পরমাণু-জিজ্ঞাসার পাঠকদের কাছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়বে যে এই মন্তব্য নেহাতই সেকেলের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

শক্তির একক

শক্তির চরম একক হলো আর্গ এবং ব্যবহারিক একক ওয়াট-ঘণ্টা। বাড়িতে যে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হয় আমরা তার দাম দিই কিলোওয়াট-ঘণ্টা হিসেবে। এক হাজার ওয়াট হলো এক কিলো-ওয়াট। একটি একশো ওয়াট বাল্ব ১০ ঘণ্টা জ্বালালে এক কিলোওয়াট-ঘণ্টা শক্তি খরচ হয়। এক কিলোওয়াট-ঘণ্টা শক্তি একটি এক কিগ্রা (কিলোগ্রাম)-বস্তুকে প্রতি সেকেণ্ডে এক মিটার বেগে প্রায় আধ ঘণ্টা গড়াতে পারবে। আবার ঐ একই শক্তি পারে একশো কাপ চায়ের জল গরম করতে। আমাদের মাঝে মাঝে এই সুপরিচিত একক কিলোওয়াট-ঘণ্টা ব্যবহার করতে হবে। এইটুকু মনে রাখা দরকার যে এটি হলো ৩.৬×১০^{১৩} আর্গের সমান।

শক্তির বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন একক ব্যবহার করা হয়। যেমন ক্যালরি। ক্যালরি হলো তাপ-শক্তির একক। এক গ্রাম জলের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে খরচ হয় এক ক্যালরি। এক হাজার ক্যালরি হলো ১.১৬৩ ওয়াট-ঘণ্টার সমান।

তেজস্ক্রিয় অ্যাটম থেকে যে সব তেজকণা বেরোয় তাদের শক্তি বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে আর একটি একক। তার নাম এম-ই-ভি অর্থাৎ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। একটি ইলেক্ট্রনকে এক ভোল্ট তড়িৎ-বিভবে ত্বরিত করলে ইলেক্ট্রনটি এক ইলেক্ট্রন ভোল্ট বা ই-ভি শক্তি অর্জন করে। আমাদের চেনা এককে

ই-ভি $= ১.৬ \times ১০^{-১২}$ আর্গ

এম-ই-ভি $= ১.৬ \times ১০^{-৬}$ আর্গ

$= ৪.৪ \times ১০^{-২০}$ কিলোওয়াট-ঘণ্টা

তাহলে এখন এক এম-ই-ভি'র আলফা-কণা বলতে স্থূলবুদ্ধিতে আমরা কি বুঝব? আলফা-কণার ভর হলো প্রায় ৬.৪×১০^{-২৪} গ্রাম, শক্তি হলো ১.৬×১০^{-৬} আর্গ; তাহলে বায়ুশূন্য স্থানে এটি সেকেণ্ডে প্রায় ৭০০০ কিলোমিটার বেগে ছুটবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে এম-ই-ভি এককটি খুবই ছোট। কিন্তু পরমাণু-শক্তির প্রসঙ্গে পরে একে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে।

তেজস্ক্রিয় অ্যাটম থেকে আলফা-বিটা-কণা ছাড়াও তেজরশ্মি বেরোয় যাকে আমরা বলেছি গামা-রশ্মি। গামা-রশ্মি আলোক-জাতীয়। বেতার-তরঙ্গ, দৃশ্য আলো ও এক্স-রশ্মির মতো এটিও তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ, এবং এই তরঙ্গের বেগ আলোর বেগের সমান। গামা-রশ্মির শক্তিও বলা হয় এম-ই-ভি এককে। তরঙ্গের সঙ্গে শক্তি কেমনভাবে যুক্ত হতে পারে সেটা হেঁয়ালির মত মনে হওয়া বিচিত্র নয়। এই সুযোগে সেই আলোচনাও করে নেওয়া যেতে পারে।

আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম সোপান তৈরি করেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক তাঁর কোয়াণ্টামবাদ দিয়ে। এই মতবাদ অনুযায়ী, বিকিরণজাত শক্তি বার হয় স্তবকে স্তবকে, ধারাবাহিকভাবে নয়। এক-একটি বিকিরণ-স্তবককে বলা হয় ফোটন। এই ফোটনের শক্তি অঙ্কের সমীকরণে

$$E = h\nu$$

এখানে E হলো আর্গ এককে শক্তি; ν (গ্রীক বর্ণমালার অক্ষর নিউ) হলো কম্পাঙ্ক অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে তরঙ্গ-সংখ্যা; h হলো প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক—৬.৬২৫৬×১০^{-২৭} আর্গ সেকেণ্ড। কম্পাঙ্ক বলা হয় 'হার্টজ্'এ। প্রতি সেকেণ্ডে এক সাইক্‌ল হলো এক হার্টজ্ বা হা। ১০০০ হা হবে কি-হা, ১০০০০০০ হা হবে মেগা-হার্টজ্ বা মে-হা। তাহলে কোনো একটি রশ্মির ফোটনের শক্তি জানা থাকলে তার তরঙ্গ-প্রবাহের কম্পাঙ্ক বার করা যায়, অথবা তার কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য জানা থাকলে শক্তি বার করা যায়। ১০ মিটার তরঙ্গ-

দৈর্ঘ্যের (কম্পাঙ্ক প্রতি সেকেণ্ডে ৩০ মে-সা) বেতার-তরঙ্গের ফোটনের শক্তি হলো প্রায় ২×১০^{-১৯} আর্গ। আবার লাল আলোর ফোটনের (তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৬×১০^{-৫} সে-মি) শক্তি হবে প্রায় ৩×১০^{-১২} আর্গ। এই একই উপায়ে বার করা যাবে এক এম-ই-ভি গামা-রশ্মির কম্পাঙ্ক প্রায় ২.৫×১০^{৮} মে-হা। রেডিওতে কোনো নতুন স্টেশন ধরতে গেলে আমাদের প্রায়ই কম্পাঙ্ক আর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নিয়ে হিমসিম খেতে হয়। এক্ষেত্রে মনে রাখা ভাল যে কম্পাঙ্ককে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে আলোর বেগ যা হলো প্রতি সেকেণ্ডে ৩×১০^{১০} সেন্টিমিটার।

বস্তু থেকে শক্তি, শক্তি থেকে বস্তু

পরমাণু-প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা যে অঙ্কের গোলকধাঁধায় জড়িয়ে গেছি সেখান থেকে বেরোতে গেলে আরো এক ধাপ পার হতে হবে। সেটি হলো আইনস্টাইনের সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সমীকরণ :

$$E = mc^২$$

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদের বিশেষ বিধান পদার্থবিজ্ঞানে যে সব নতুন ধারণা নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত করল তার মধ্যে একটি হলো c অর্থাৎ আলোর বেগই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গতির সর্বোচ্চ সীমা। আলোর চেয়ে দ্রুত বেগে আর কিছু যেতেই পারে না। অপর একটি ধারণা — বস্তু এবং শক্তির তুল্যমূল্যতা অর্থাৎ বস্তুকে বিনাশ ক'রে শক্তি এবং শক্তিকে বিনাশ ক'রে বস্তু উৎপন্ন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে বিনাশ অর্থে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করা, পোড়ানো নয়। পদার্থশাস্ত্রে সেকেলে পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বস্তু ও শক্তির নিত্যতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু বস্তুকে নিশ্চিহ্ন ক'রে শক্তি আমদানি করা অথবা শক্তি থেকে বস্তু সৃষ্টি করা, এ একেবারেই আধুনিক মতবাদ। এরই অঙ্কের রূপ ঃ

$$E = mc^২$$

E আর্গ-এককে শক্তি, m গ্রাম-এককে বস্তুর ভর এবং c প্রতি

সেকেণ্ডে সেন্টিমিটারে আলোর বেগ। তাহলে দেখা যাবে যে এক গ্রাম বস্তু—তা সে কয়লাই হোক আর সোনাই হোক—যদি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন ক'রে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে সেই শক্তির পরিমাণ হবে

$$E = ১ \times (৩ \times ১০^{১০})^{২} \text{ আর্গ}$$
$$= ৯ \times ১০^{২০} \text{ আর্গ}$$
$$= ২৫,000,000 \text{ কি-ও-ঘ।}$$

জ্বালানি হিসেবে আমরা সাধারণত ব্যবহার করি কয়লা। এক গ্রাম ভাল কয়লা যদি শুদ্ধ অক্সিজেন গ্যাসে পোড়ানো হয় তবে আমরা পাব ৮000 ক্যালরি। তা দিয়ে বড়জোর তিন কাপের মতো চায়ের জল গরম করা যায়। ভারতীয় কয়লা বাতাসে পুড়িয়ে গড়ে প্রতি কিলোগ্রামে ৫000 কিলোক্যালরি বা ৫·৮ কিলোওয়াট-ঘণ্টা তাপশক্তি পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে, এটি হলো রাসায়নিক শক্তি—পোড়ালে কয়লা বিনষ্ট হয় না, অন্য রাসায়নিক যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়। যদি কোনোদিন কয়লাকে সত্যি সত্যি নিশ্চিহ্ন ক'রে নিয়ন্ত্রিত হারে শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়, তবে এক গ্রাম কয়লা দিয়ে কলকাতা শহরকে বর্তমান হারে কুড়ি বছর ধরে অনায়াসে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা যেতে পারে।

বস্তু থেকে শক্তির রূপান্তরের এই যে ধারণা আইনস্টাইনের মাথায় এসেছিল সেটা তিনি দেখিয়েছিলেন অঙ্কের সূত্রে। ল্যাবরে-টরিতে এর সত্যিকার প্রমাণ পাওয়া গেছে তারও অনেক পরে। অ্যাটমবোমা বিস্ফোরণের অনেক আগেই বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষায় ধরা পড়েছিল যে তীব্র শক্তিসম্পন্ন তেজরশ্মি থেকে পজিট্রন-ইলেক্-ট্রন জোড়া-কণার সৃষ্টি হয়, আবার ইলেক্ট্রন-পজিট্রন নিশ্চিহ্ন হয়ে গামা-রশ্মির সৃষ্টি করে। তাছাড়া নিউক্লিয়াসের বন্ধন-শক্তির মূল রহস্যের সমাধানও হয়েছে এই সূত্র দিয়েই। তবে একথা ঠিক যে আস্ত একটি পরমাণুকে নিঃশ্চিহ্ন করার কৌশল আজও জানা নেই।

কিছু পূর্বে কথা হচ্ছিল হিলিয়ম নিউক্লিয়াসের বন্ধন-শক্তি সম্বন্ধে

—যা পরমাণু-ভর-এককে ০·০৩০৬৭। শক্তির বিভিন্ন একক সম্বন্ধে খানিকটা পরিচয় হয়েছে আমাদের—সুতরাং এখন যদি বলা যায় যে ১ পরমাণু-এককে ভর ($১·৬৫৯৮ \times ১০^{-২৪}$ গ্রাম) হবে ৯৩১ এম-ই-ভি, তাহলে বুঝতে আর কোনো বাধা নেই। অতএব হিলিয়ম নিউক্লিয়াসের বন্ধন-শক্তি দাঁড়াচ্ছে প্রায় ২৮ এম-ই-ভি।

পরমাণু-প্রসঙ্গ আলোচনায় এই পর্যন্ত এসে বিভিন্ন মৌল-দের সম্বন্ধে খবরাখবর নেওয়া অসমীচীন হবে না। কিছু কিছু মৌল প্রায় প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই চলে আসছে। আবার অনেক-গুলি মৌল জানা গেছে মাত্র অল্প কিছু দিন আগে। পরমাণুর ভাঙা গড়া বুঝতে গেলে মৌল-দের নাম, প্রতীক চিহ্ন এবং তাদের অন্যান্য কয়েকটি ধর্ম জানা দরকার। এই ধর্মগুলির মধ্যে বিশেষ ক'রে জানা দরকার পরমাণু-অঙ্ক এবং পরমাণু-ভার, পরমাণু-অঙ্কের সঙ্গে জড়িত মৌলটির রাসায়নিক নাম এবং পরমাণু-ভার বলতে মৌলগুলি একটি বিশেষ মৌলের অনুপাতে কত বেশি ভারি তাই বোঝায়। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা পরের অধ্যায়ে করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের শেষে এই সব তথ্য সমেত মৌল-দের একটি তালিকা যোগ করা হয়েছে। মৌলগুলি যে সব বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানীরা প্রথম আবিষ্কার করেন বলে জানা আছে এবং যে সনে আবিষ্কারের ফল প্রকাশিত হয় তা-ও দেওয়া হল। তালিকা থেকে দেখা যাবে ক্রমিকসংখ্যার মতো পরমাণু-অঙ্ক এক দুই তিন ক'রে এগিয়ে গেছে এবং ৯২ পার হয়ে ১০৫ পর্যন্ত চলে গেছে। ১০৫ নম্বর পরমাণুটি আবিষ্কার হয়েছে ১৯৭০ সনে। পরমাণু-ভারের শ্রেণীতে কোনো কোনো সংখ্যা দশমিকের ডানদিকে তিন চার বা পাঁচ ঘর পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে। এটা যে খামখেয়াল নয় তা নিশ্চয় পাঠকদের জোর দিয়ে বোঝাবার দরকার নেই। মৌলগুলির বন্ধন-শক্তির হিসাবে এর প্রয়োজনীয়তার কথা কিছু পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। মৌল-তালিকায় দেখা যাবে, কিছু কিছু মৌলের পাশে তারকা চিহ্ন এবং এগুলির পরমাণু-ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যায় দেখান

আছে। এগুলি অস্থির বা অস্থায়ী। মৌল অস্থির বলার অর্থ মৌল নিজ থেকে ভেঙে যাওয়া, যার ফলে সৃষ্টি হয় তেজস্ক্রিয়তার। সে আলোচনা পরের অধ্যায়ে করা হয়েছে।

মৌলের তালিকা

পরমাণু-অঙ্ক	মৌলের নাম	রাসায়নিক প্রতীক	আবিষ্কারক	খ্রীস্টাব্দ	পরমাণু-ভার
১	হাইড্রোজেন	H	ক্যাভেণ্ডিশ	১৭৬৬	১·০০৭৯৭
২	হিলিয়ম	He	র‍্যামসে	১৮৯৫	৪·০০২৬
৩	লিথিয়ম	Li	অ্যাফভেডসন	১৮১৭	৬·৯৩৯
৪	বেরিলিয়ম	Be	ভাকেলিন, ভোয়েলার বুসী	১৭৯৮	৯·০১২২
৫	বোরন	B	গে-লুসাক, থেনার্ড, ডেভি	১৮০৮	১০·৮১২১
৬	কার্বন	C	প্রাগৈতিহাসিক		১২·০১১৫
৭	নাইট্রোজেন	N	রাদারফোর্ড, শীলে, ক্যাভেণ্ডিশ, প্রিস্টলে প্রভৃতি	১৭৭২	১৪·০০৬৭
৮	অক্সিজেন	O	প্রিস্টলে	১৭৭৪	১৫·৯৯৯৪
৯	ফ্লোরিন	F	মোয়াসাঁ	১৮৮৬	১৮·৯৯৮৪
১০	নিয়ন	Ne	র‍্যামসে ও ট্রাভার্স	১৮৯৮	২০·১৮৩
১১	সোডিয়ম (নেট্রিয়ম)	Na	ডেভি	১৮০৭	২২·৯৮৯৮
১২	ম্যাগনেসিয়ম	Mg	ডেভি	১৮০৮	২৪·৩১২
১৩	অ্যালুমিনিয়ম	Al	ভোয়েলার	১৮২৭	২৬·৯৮১৫
১৪	সিলিকন	Si	বার্জিলিয়স	১৮২৪	২৮·০৮৬
১৫	ফস্‌ফরাস্‌	P	ব্রাণ্ড	১৬৬৯	৩০·৯৭০৮

পরমাণু-অঙ্ক	মৌলের নাম	রাসায়নিক প্রতীক	আবিষ্কারক	খ্রীস্টাব্দ	পরমাণু-ভার
১৬	সালফার	S	প্রাগৈতিহাসিক		৩২·০৬৪
১৭	ক্লোরিন	Cl	শীলে	১৭৭৪	৩৫·৪৫৩
১৮	আর্গন	A	র‍্যালে ও র‍্যামসে	১৮৯৪	৩৯·৯৪৮
১৯	পটাশিয়ম	K	ডেভি	১৮০৭	৩৯·১০২
২০	ক্যালসিয়ম	Ca	ডেভি	১৮০৮	৪০·০৮
২১	স্কাণ্ডিয়ম	Sc	নিলসন	১৮৭৯	৪৪·৯৫৬
২২	টাইটেনিয়ম	Ti	গ্রেগর	১৭৯১	৪৭·৯০
২৩	ভানাডিয়ম	V	শেফস্ট্রয়েম	১৮৩০	৫০·৯৪২
২৪	ক্রোমিয়ম	Cr	ভ্যাকেলিন	১৭৯৭	৫১·৯৯৬
২৫	ম্যাংগানিজ	Mn	গান	১৭৭৪	৫৪·৯৩৮০
২৬	আয়রন (ফেরাস)	Fe	প্রাগৈতিহাসিক		৫৫·৮৪৭
২৭	কোবাল্ট	Co	ব্রাণ্ট	১৭৩৫	৫৮·৯৩৩২
২৮	নিকেল	Ni	ক্রনস্টেডণ্ট	১৭৫১	৫৮·৭১
২৯	কপার (তামা)	Cu	প্রাগৈতিহাসিক		৬৩·৫৪
৩০	জিংক (দস্তা)	Zn	ভারতে ১৩শ শতাব্দীতে, পরে মার্গ্রাফ	১৭৪৬	৬৫·৩৭
৩১	গ্যালিয়ম	Ga	বোয়াবোদ্রাঁ	১৮৭৫	৬৯·৭২
৩২	জার্মেনিয়ম	Ge	উইনক্লার	১৮৮৬	৭২·৫৯
৩৩	আর্সেনিক	As	ম্যাগনাস	১২৫০	৭৪·৯২
৩৪	সেলেনিয়ম	Se	বার্জিলিয়স	১৮১৮	৭৮·৯৬
৩৫	ব্রোমিন	Br	বালার্ড	১৮২৬	৭৯·৯০৯
৩৬	ক্রিপটন	Kr	র‍্যামসে ও টাভার্স	১৮৯৮	৮৩·৮০
৩৭	রুবিডিয়ম	Rb	বুন্‌সেন ও কির্শফ	১৮৬১	৭৫·৪৭

পরমাণু-অঙ্ক	মৌলের নাম	রাসায়নিক প্রতীক	আবিষ্কারক	খ্রীস্টাব্দ	পরমাণু-ভার
৩৮	স্ট্রন্‌সিয়ম	Sr	ডেভি	১৮০৮	৮৭·৬২
৩৯	ঈট্রিয়ম	Y	গ্যাডোলিন	১৭৭৪	৮৮·৯০৫
৪০	জারকোনিয়ম	Zr	ক্লাপ্রথ	১৭৮৯	৯১·২২
৪১	নায়োবিয়ম (কলাম্বিয়ম)	Nb	হ্যাচেট	১৮০১	৯২·৯০৬
৪২	মলিবডেনাম	Mo	হিয়েলম	১৭৮১	৯৫·৯৪
*৪৩	টেকনিসিয়ম	Tc	পেরিয়র ও সেগ্রে	১৯৩৭	(৯৯)
৪৪	রুথেনিয়ম	Ru	ক্লাউস	১৮৪৪	১০১·০৭
৪৫	রোডিয়ম	Rh	ওলাস্টন	১৮০৩	১০২·৯০৫
৪৬	প্যালেডিয়ম	Pd	ওলাস্টন	১৮০৩	১০৬·৪
৪৭	সিলভার (আরজেনটাম)	Ag	প্রাগৈতিহাসিক		১০৭·৮৭০
৪৮	ক্যাডমিয়ম	Cd	স্ট্রোমায়ার	১৮১৭	১১২·৪০
৪৯	ইণ্ডিয়ম	In	রাইখ ও রিখটার	১৮৬৩	১১৪·৮২
৫০	টিন (স্ট্যানাম)	Sn	প্রাগৈতিহাসিক		১১৮·৬৯
৫১	অ্যান্টিমনি (স্টেবিয়ম)	Sb	ইতিহাসের আদি যুগ		১২১·৭৬
৫২	টেলুরিয়ম	Te	রাইখেনস্টাইন	১৭৮২	১২৭·৬০
৫৩	আয়োডিন	I	কুর্তোয়া	১৮১১	১২৬·৯০৪৫
৫৪	জিনন	Xe	র‍্যামসে ও ট্রাভার্স	১৮৯৮	১৩১·৩০
৫৫	সিজিয়ম	Cs	বুনসেন ও কির্শফ	১৮৬০	৩২·৯০৫৫
৫৬	বেরিয়ম	Ba	ডেভি	১৮০৮	১৩৭·৩৪

পরমাণু-অঙ্ক	মৌলের নাম	রাসায়নিক প্রতীক	আবিষ্কারক ও	খ্রীস্টাব্দ	পরমাণু-ভার
৫৭	ল্যান্‌থানাম	La	মোসান্দের	২৮৩৯	১৩৮·৯১
৫৮	সিরিয়ম	Ce	ক্লাপ্রথ, বার্জি-লিয়স ও হিসিংগের	১৮০৩	১৪০·১২
৫৯	প্রসিওডিমিয়ম	Pr	ওয়েলসবাক	১৮৮৫	১৪০·৯০৭
৬০	নিওডিমিয়ম	Nd	ওয়েলসবাক	১৮৮৫	১৪৪·২৪
*৬১	প্রমিথিয়ম	Pm	মারিনস্কি ও গ্লেণ্ডেনিন	১৯৪৫	(১৪৫)
৬২	স্যামারিয়ম	Sm	বোয়াবোদ্রাঁ	১৮৭৯	১৫০·৩৫
৩৬	ইউরোপিয়ম	Eu	দেমার্কে	১৯০১	১৫১·৯৬
৬৪	গ্যাডোলিনিয়ম	Gd	মারিগনাক	১৮৮০	১৫৭·২৫
৬৫	টার্বিয়ম	Tb	মোসান্দের	১৮৪৩	১৫৮·৯২৪
৬৬	ডিসপ্রোসিয়ম	Dy	বোয়াবোদ্রাঁ	১৮৮৬	১৬·২৫০
৬৭	হোলমিয়ম	Ho	সোরেট	১৮৭৮	১৬৪·৯৩০
৬৮	আরবিয়ম	Er	মোসান্দার	১৮৪৩	১৬৭·২৬
৬৯	থুলিয়ম	Tm	ক্লীভ	১৮৭৯	১৬৮·৯৩৪
৭০	ঈটারবিয়ম	Yb	মারিগনাক	১৮৭৮	১৭৩·০৪
৭১	লুটেসিয়ম	Lu	আর্বেন	১৯০৭	১৭৪·৯৭
৭২	হাফনিয়ম	Hf	কস্টার ও হেভেসি	১৯২৩	১৭৮·৪৯
৭৩	ট্যান্টালাম	Ta	একবার্গ	১৮০২	১৮০·৯৪৮
৭৪	টাংস্টেন (ওলফ্রাম)	W	দেলহুইয়ার	১৭৮৩	১৮৩·৮৫
৭৫	রিনিয়ম	Re	নড্যাক, নড্যাক, ট্যাক, বার্গ	১৯২৫	১৮৬·২০
৭৬	অসমিয়ম	Os	টেন্যান্ট	১৮০৪	১৯০·২

পরমাণু-অঙ্ক	মৌলের নাম	রাসায়নিক প্রতীক	আবিষ্কারক	খ্রীস্টাব্দ	পরমাণু ভার
৭৭	ইরিডিয়ম	Ir	টেন্যান্ট	১৮০৪	১৯২·২
৭৮	প্লাটিনাম	Pt	উলোয়া, উড	১৭৩৫ ১৭৪১	১৯৫·০৯
৭৯	গোল্ড (অরাম)	Au	প্রাগৈতিহাসিক		১৯৬·৯৬৭
৮০	মার্কারী বা পারা (হাইড্রাজাইরাম)	Hg	”		২০০·৬১
৮১	থ্যালিয়ম	Tl	ক্রুকস	১৮৬১	২০৪·৩৭
৮২	লেড (প্লামবাম)	Pb	প্রাগৈতিহাসিক		২০৭·১৯
৮৩	বিসমাথ	Bi	জিওফ্রয়	১৭৫৩	২০৮·৯৮০
৮৪	পোলোনিয়ম	Po	কুরি	১৮৯৪	(২১০)
৮৫	অ্যাসটেটাইন	At	কর্সন, ম্যাকেঞ্জি, সেগ্রে	১৯৪০	(২১০)
৮৬	রেডন	Rn	ডর্ন	১৯০০	(২২২)
৮৭	ফ্রান্সিয়ম	Fr	পেরে	১৯৩৯	(২২৩)
৮৮	রেডিয়ম	Ra	কুরি	১৮৯৮	(২২৬)
৮৯	অ্যাক্‌টিনিয়ম	Ac	দেবিয়ের্ন, পিসেল	১৮৯৯	(২২৭)
৯০	থোরিয়ম	Th	বার্জিলিয়স	১৮২৮	২৩২·০৩৮
৯১	প্রোট্যাক্‌টিনিয়ম	Pa	হান ও মাইটনার	১৯১৭	(২৩১)
৯২	ইউরেনিয়ম	U	ক্লাপ্রথ	১৭৮৯	২৩৮·০৩
*৯৩	নেপচুনিয়ম	Np	ম্যাকমিলান ও এবেলসন	১৯৪০	(২৩৭)
*৯৪	প্লুটোনিয়ম	Pu	সিবর্গ, ম্যাক-মিলান, কেনেডি, ওয়াল	১৯৪০	(২৪২)

পরমাণু-অঙ্ক	মৌলের নাম	রাসায়নিক প্রতীক	আবিষ্কারক	খ্রীস্টাব্দ	পরমাণু-ভার
*৯৫	আমেরেসিয়ম	Am	সিবর্গ, জেমস্, রশো	১৯৪৪	(২৪৩)
*৯০	কুরিয়ম	Cm	সিবর্গ, জেমস, গিওরশো	১৯৪৪	(২৪৫)
*৯৭	বার্কলিয়ম	Bk	টমসন, গিওরশো সিবর্গ	১৯৪৯	(২৪৯)
*৯৮	ক্যালিফোর্নিয়ম	Cf	টমসন, স্ট্রীট, গিওরশো, সিবর্গ	১৯৫০	(২৪৯)
*৯৯	আইনস্টাইনিয়ম	E	গিওরশো প্রভৃতি	১৯৫২	(২৫৪)
*১০০	ফের্মিয়ম	Fm	গিওরশো প্রভৃতি	১৯৫২	(২৫২)
*১০১	মেণ্ডেলেভিয়ম	Mv	গিওরশো, হার্ভে, চোপিন, টমসন, সিবর্গ	১৯৫৫	(২৫৬)
*১০২	নোবেলিয়ম	No	গিওরশো, সিক্কেল্যাণ্ড, ওয়াল্টন, সিবর্গ	১৯৫৭	(২৫৪)
*১০৩	লরেন্সিয়ম	Lw	গিওরশো, সিক্কেল্যাণ্ড, লার্স, লাটিমার	১৯৬১	(২৫২)
*১০৫	রাদারফোর্ডিয়ম	R	গিওরশো প্রভৃতি	১৯৬৯	(২৫৮)
*১০৫	হানিয়ম	Ha	গিওরশো প্রভৃতি	১৯৭০	(২৬০)

* প্রাকৃতিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। গবেষণাগারে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। নেপচুনিয়ম ও প্লুটোনিয়ম অতি অল্প পরিমাণে প্রাকৃতিক অবস্থায় পাওয়া যায়।

মৌল তালিকায় ব্রাকেটে লাটিন নাম।

পরমাণু-ভার তালিকায় ব্রাকেটে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আইসোটোপের ভর সংখ্যা। এই পরমাণুগুলি অস্থায়ী।

তেজস্ক্রিয়তা

ইচ্ছামতো নিউক্লিয়াস-তৈরি

নিউক্লিয়াস কি দিয়ে তৈরি জেনে যাবার পর হয়তো মনে হবে এ তো মজা মন্দ নয়। শুধু যদি প্রোটন আর নিউট্রন দিয়েই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত নিউক্লিয়াস তৈরি হয়ে থাকে তবে তো খুবই সহজ হয়ে গেল সমস্তটা। এমন কি আমরা ইচ্ছামতো সংখ্যায় প্রোটন আর নিউট্রন জুড়ে নতুন নতুন নিউক্লিয়াস তৈরি করতে পারি। কিংবা সত্যি তৈরি না করলেও তৈরি করার কথা ভাবতে বাধা কি? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হবে তা যদি সম্ভব হতো তাহলে মৌলের সংখ্যা বিরানব্বই না হয়ে একটা মস্ত বড় রকমের কিছু হতো। পৃথিবীতে মৌলের সংখ্যামাত্র বিরানব্বইতেই সীমাবদ্ধ কেন? এর পিছনে নিশ্চয় কোনো জোরালো যুক্তি আছে।

এই অনুমানই ঠিক। মৌলের সংখ্যা কি আর অকারণে বিরানব্বই হয়েছে? পদার্থ-বিজ্ঞানীর চোখে এই বিশ্বসংসারের দিকে তাকালে দেখা যাবে সৃষ্টির কিছুই যা-খুশি-তাই নয়। এমন কি নিউক্লিয়াসের ভাঙাগড়াও চলেছে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে—তার কোনো ব্যতিক্রম নেই, অন্যথা নেই। এত নিখুঁত সে নিয়ম যে তাকে অঙ্কের ছকে ফেলেও মিলানো যায়—অনেকের মতে পদার্থ-বিজ্ঞানের সঙ্গে অঙ্কের সম্পর্ক সেই জন্যই এত ঘনিষ্ঠ। নিউক্লিয়াস-তৈরি নিয়ে আলোচনা করার শুরুতে কতকগুলো নিয়মকানুন সম্বন্ধে পরিচিত হওয়া দরকার। যে কোনো একটি নিউক্লিয়াসকে $^{A}_{Z}X$ বলে চিহ্নিত করার রেওয়াজ আছে। এখানে X হলো মৌলের নাম, যেমন কার্বন, অক্সিজেন ইত্যাদি, Z হলো প্রোটন-সংখ্যা আর A হল প্রোটন ও নিউট্রনের মিলিত সংখ্যা। একটি

গোটা অ্যাটমে যতগুলি প্রোটন আছে ততগুলি ইলেকট্রনও আছে। সুতরাং Z শুধু প্রোটন-সংখ্যাই নয় অনাহিত পরমাণুতে ইলেকট্রন-সংখ্যাও। Z-এর পোষাকী নাম হলো পরমাণু-অঙ্ক বা -সংখ্যা আর A-এর পোষাকী নাম হলো ভর-অঙ্ক বা ভর-সংখ্যা। এ কথা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে $^{A}_{Z}X$ নিউক্লিয়াসটির মধ্যে (A-Z)-সংখ্যক নিউট্রন আছে। কোনো মৌলের নিউক্লিয়াসে ক'টি প্রোটন থাকে এসব এখন আদ্যোপান্ত জানা। কাজেই পরমাণু-অঙ্ক অর্থাৎ Z বলে দেওয়া আর মৌলের নাম বলে দেওয়া একই কথা : যেমন Z যদি হয় ৬ তবে সেই X হলো কার্বন বা C ; Z যদি হয় ৮ তবে মৌলের নাম অক্সিজেন বা O ; Z যদি হয় ৯২ তবে মৌল হলো ইউরেনিয়ম বা U।

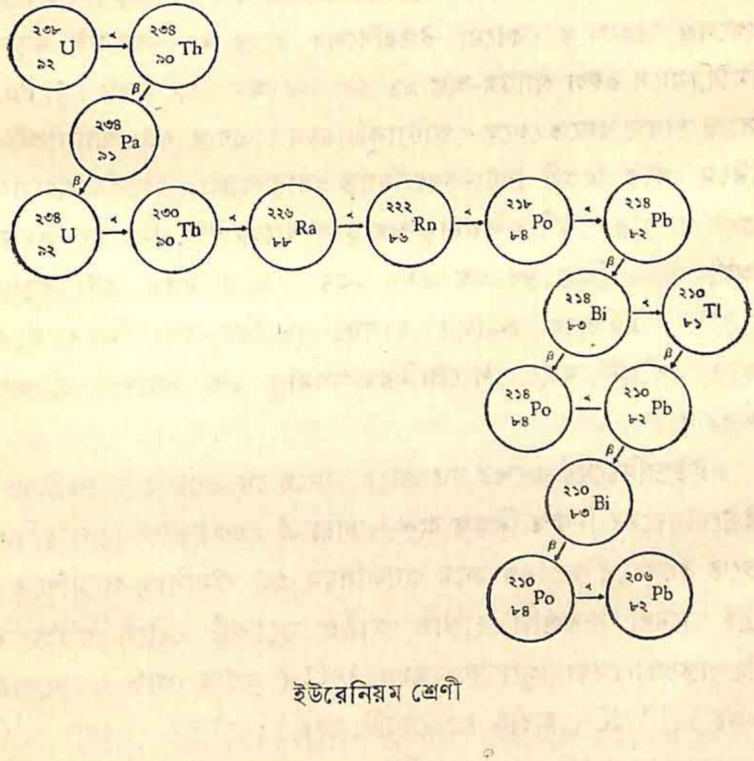
এখন ধরা যাক আমরা ঠিক করলাম এমন একটি নিউক্লিয়াস তৈরি করব যাতে থাকবে ২৭টি প্রোটন আর ৩৫টি নিউট্রন। এটি যে কোবাল্ট হবে সেটা বোঝা এমন কিছু কঠিন হবে না—এবং তার ভর-অঙ্ক হবে ৬২, ছোট করে $^{৬২}_{২৭}$Co। এদিকে আবার তালিকায় দেওয়া আছে কোবাল্টের ভর-অঙ্ক ৫৯, ৬২ নয়। আমরা তর্কের খাতিরে যদি ৬২ ভর-অঙ্কের কোবাল্ট তৈরি করিও তবুও সেটা বেশীক্ষণ থাকবে না, কয়েকটি তেজকণা নিজে বার ক'রে দিয়ে নিউক্লিয়াস ফিরে আসবে ৫৯এ—যে অবস্থায় কোবাল্ট প্রকৃতিতে বিরাজ করে। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে আমরা ইচ্ছেমত যা-খুশি তাই দিয়ে নিউক্লিয়াস তৈরি করতে পারছি না।

এই যে কোবাল্টের নিউক্লিয়াস তৈরি করতে গিয়ে আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের কাছে হেরে গেলাম—এমনটা হলো কেন? উত্তরে আমাদের আগেকার আলোচনায় ফিরে যেতে হয়, যেখানে বলা হয়েছে নিউক্লিয়াসের আয়তন খুবই ছোট এবং তারই মধ্যে রয়েছে প্রোটন-নিউট্রনরা। এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে দুটি বিপরীত-ধর্মী বল সব সময় কাজ করছে। একটি হলো আকর্ষী বল, যার দ্বারা প্রোটন ও নিউট্রনরা পরস্পরকে টানছে। আবার প্রোটনদের মধ্যে পজিটিভ চার্জ থাকায় তৈরি হচ্ছে বিকর্ষী বল, যার ফলে

প্রোটনরা কেবলই ছিটকে বাইরে চলে আসতে চাইছে। যতক্ষণ আকর্ষী বল বিকর্ষী বলের চেয়ে বেশী ততক্ষণই একটি স্থায়ী নিউক্লিয়াস তৈরি করা সম্ভব। যখনই কোনো কারণে বিকর্ষী বল হয়ে পড়ে আকর্ষী বলের সমান বা তার চেয়ে বেশী, তখনই সেই নিউক্লিয়াসের ভারসাম্য বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। এক কথায় এটি স্থায়ী অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হচ্ছে অস্থায়ী অবস্থায়। অস্থায়ী নিউক্লিয়াস দু-একটি তেজকণা বার ক'রে দিয়ে স্থায়ী অবস্থায় ফিরে আসার চেষ্টা করবে। এই হলো তেজস্ক্রিয়তার উৎপত্তির ইতিহাস। কোবাল্টের নিউক্লিয়াস-তৈরির যে কথা হচ্ছিল সেটা আমরা করলেও কিছুক্ষণের মধ্যে সেই নিউক্লিয়াস নিজে থেকে ভেঙে অন্য আকার নেবে। অর্থাৎ ৬২ ভর-অঙ্ক দিয়ে আমরা তৈরি করছি একটি অস্থায়ী কোবাল্ট নিউক্লিয়াস।

তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হবার পর এই নিয়ে পুঙ্খানুপঙ্খ পরীক্ষা চলেছিল এবং খনিজ পদার্থের মধ্য থেকে যত-রকমের তেজ-বিকিরণ পাওয়া সম্ভব তার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ ক'রে এ-সম্বন্ধে সবরকম জ্ঞাতব্য তথ্যই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দেখা গেছে সবচেয়ে ভারী তেজস্ক্রিয় পরমাণু হলো ইউরেনিয়ম এবং কমতে কমতে তেজস্ক্রিয়তা গিয়ে শেষ হচ্ছে সীসের পরমাণুতে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয় মৌলগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় — ইউরেনিয়ম-শ্রেণী, থোরিয়ম-শ্রেণী ও অ্যাকটিনো-ইউরেনিয়ম-শ্রেণী। এখানে বার বার তেজস্ক্রিয়তা কথাটি ব্যবহার করার আগে ভেবে দেখা ভাল যে কথাটির মানে আমাদের ঠিকমত জানা আছে কিনা। তেজস্ক্রিয়তা একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, সেই সঙ্গে আবার এটি নিউক্লিয়াসের একটি বিশিষ্ট গুণও বলা যায়। প্রকৃতিতে কয়েক রকমের মৌল পাওয়া যায় যাদের পরমাণুর নিউক্লিয়াসগুলি অস্থির। একটি অস্থির নিউক্লিয়াস আলফা, বিটা এবং গামা-রশ্মি বিকিরণ করে। একটি তেজকণা বার ক'রে পুরনো নিউক্লিয়াসটি একটি নতুন নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এই নতুন নিউক্লিয়াসটি টলমলে গোছের হতে পারে।

তখন সে আবার একটি তেজকণা বার ক'রে দেবে। এইরকম চলতে থাকবে যতক্ষণ না একটি স্থায়ী বা স্থির নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। আগেই বলা হয়েছে যে আলফা-কণা একটি হিলিয়ম-নিউক্লিয়াস অর্থাৎ এর চার্জ +২ এবং ভর ৪ : ${}^{৪}_{২}He$; সুতরাং কোনো একটি নিউক্লিয়াস ${}^{A}_{Z}X$ থেকে আলফা-কণা বেরবার পর তার নতুন আকার হবে ${}^{A-৪}_{Z-২}X$। আবার বিটা কণার চার্জ −১ ও ভর নগণ্য। সুতরাং ঐ নিউক্লিয়াস ${}^{A}_{Z}X$ থেকে যদি একটি বিটা কণা বেরয় তবে নতুন নিউক্লিয়াসটি হবে ${}_{Z+১}^{A}X$ কেননা বিটা-কণার চার্জ নেগেটিভ। গামা-রশ্মি বার হলে নিউক্লিয়াসের ভার বা চার্জের কোনো পরিবর্তন হয় না, উত্তেজনা কিছুটা কমে এই মাত্র।



ইউরেনিয়ম শ্রেণী

তেজস্ক্রিয় শ্রেণী

পূর্ব পৃষ্ঠায় ছবিতে তেজস্ক্রিয়তার নিয়মানুযায়ী ইউরেনিয়মের বংশ-তালিকা দেওয়া হলো। ইউরেনিয়ম-বংশের অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহ হলেন $^{238}_{92}U$ অর্থাৎ কিনা যে ইউরেনিয়ম পরমাণুর ভর-অঙ্ক ২৩৮ আর পরমাণু-অঙ্ক ৯২। এই $^{238}_{92}U$ থেকে যখন একটি আলফা-কণা বেরিয়ে যায় তখন ইনি হন থোরিয়ম $^{234}_{90}Th$। একটি আলফা-কণার সঙ্গে সঙ্গে ভর-অঙ্ক কমছে ৪ আর পরমাণু-অঙ্ক কমছে ২। এই নতুন নিউক্লিয়াসের পরমাণু-অঙ্ক দাঁড়াচ্ছে ৯০ এবং ভর-অঙ্ক হচ্ছে ২৩৪। এরপর $^{234}_{90}Th$ থেকে বার হচ্ছে বিটা-কণা। বিটা-কণা কিন্তু ১-সংখ্যক নেগেটিভ চার্জ নিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং হরে-দরে পরমাণু-অঙ্ক না কমে তার সঙ্গে যোগ হচ্ছে ১। বিটা-কণা বেরিয়ে গেলেও ভর-অঙ্কে কোনো ইতরবিশেষ হচ্ছে না—কাজেই নতুন নিউক্লিয়াসে রইল অ্যাটম-অঙ্ক ৯১ এবং ভর-অঙ্ক ২৩৪ অর্থাৎ $^{234}_{91}Pa$, সহজ ভাষায় বলতে গেলে প্রোট্যাক্‌টিনিয়ম। এবার এই প্রোট্যাক্‌টি-নিয়ম থেকে একটি বিটা-কণা নির্গত হবার পালা। হিসেব করলেই দেখা যাবে রূপান্তরিত পরমাণু-অঙ্ক হয়ে যাচ্ছে ইউরেনিয়মের সমান অর্থাৎ ৯২ ; কিন্তু ভর-অঙ্ক এখন ২৩৪। তার মানে এটা হলো $^{234}_{92}U$। এইভাবে ক্রমাগত আলফা বা বিটা-কণা নির্গত হতে হতে পৌছন যাবে পোলোনিয়ম-পরমাণু এবং সর্বশেষে সীসের পরমাণুতে।

ইউরেনিয়মের বংশের মত আরো আছে থোরিয়ম ও অ্যাকটিনো-ইউরেনিয়মের নিজস্ব নিজস্ব বংশ—তারা ঐ একইভাবে রূপান্তরিত হতে হতে পৌছয় যথাক্রমে ক্যালসিয়ম এবং স্ট্রনসিয়ম-পরমাণুতে। এই বনেদী বংশগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি মৌলে স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয়তা দেখা গিয়েছে, যেমন ^{14}C (অর্ধায়ু প্রায় ৬ হাজার বছর) ; ^{40}K (অর্ধায়ু ৪৫ কোটি বছর) ; ^{87}Rb (অর্ধায়ু প্রায় এক হাজার কোটি বছর) প্রভৃতি।

এই যে প্রকৃতির আশ্চর্য খেয়ালে তেজস্ক্রিয়তার জন্ম হচ্ছে এটা

ঘটছে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিউক্লিয়াসগুলির ভেতর থেকে। বাইরের আবহাওয়ার তারতম্য এর রূপান্তর প্রক্রিয়াতে বিন্দুমাত্র প্রভেদ ঘটাতে পারে না। কোনো তেজস্ক্রিয় মৌলের নিউক্লিয়াস ভাঙতে ভাঙতে কতদিনে শেষ পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে তার ভিন্ন ভিন্ন হিসাব আছে। কোনো তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস যতদিনে কমতে কমতে অর্ধেক হচ্ছে সেই সময়টাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় তার অর্ধায়ু। এই অর্ধেকও আবার অর্ধেক হচ্ছে ঠিক অতখানি সময় পার হলে— এইভাবে চলতে থাকে কমার অনুপাত। হিসাব ক'রে দেখা গেছে ইউরেনিয়ম-২৩৮-এর অর্ধায়ু ৪·৭ কোটি বছর—কিন্তু রেডিয়মের অর্ধায়ু মাত্র ১৬২০ বছর। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে কুরী-রা যে ২০০ মিলিগ্রাম রেডিয়ম আহরণ করেছিলেন আজ তার মধ্যে ১৯৫ মিলিগ্রাম অবশিষ্ট আছে। রেডন নামে গ্যাসের নিউক্লিয়াসের অর্ধায়ু মাত্র ৩·৪ দিন। ৫ মিলিগ্রাম রেডনের একমাস বাদে যা বাকি থাকবে তা হলো ০·০২ মিলিগ্রাম।

তেজস্ক্রিয়তার ধারণা আবার সংখ্যাতত্ত্বের আওতাতেও পড়ে। একটি অশান্ত নিউক্লিয়াসের অসংখ্য প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে থেকে ঠিক কোন্ দুটি প্রোটন আর কোন্ দুটি নিউট্রন মিলে আলফা-কণা হয়ে বাইরে আসবে সেকথা কেউই বলতে পারে না। পরীক্ষা করেও এটা জানা সম্ভব নয়। কেবল এইটুকুই পরীক্ষা করা যায় যে নির্দিষ্ট সময়ে কতগুলি আলফা-কণা বেরচ্ছে। এই তেজকণা নির্গমনের হার মূল নিউক্লিয়াসের সংখ্যার সমানুপাতিক। সমীকরণের আকারে $A=\frac{dN}{dt}=\lambda N$, এখানে N হলো মূল নিউক্লিয়াসের সংখ্যা, $A=\frac{dN}{dt}$ হলো তেজকণা বিকিরণের হার, λ ক্ষয়-ধ্রুবক। অর্ধায়ু $t_{\frac{1}{2}}$-এর সঙ্গে এই ক্ষয়-ধ্রুবকের একটি সম্বন্ধ আছে। $t_{\frac{1}{2}}=\frac{0\cdot693}{\lambda}$। কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের বর্ণনা দিতে গেলে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য হলো তার অর্ধায়ু, তার থেকে কি কি তেজকণা

বেরচ্ছে যেমন আলফা, বিটা, গামা এবং সেই কণাগুলির শক্তি এম-ই-ভি'তে। তেজস্ক্রিয়তার প্রসঙ্গ এই অবধি রেখে আর একটি বহুল প্রচলিত কথায় আসা যাক—কথাটি হলো আইসোটোপ।

একই পরমাণু-অঙ্কের বিভিন্ন-ভর-বিশিষ্ট পরমাণুদের বলে আইসোটোপ। যে-সব পরমাণুর প্রোটন-সংখ্যা এক অথচ নিউট্রন-সংখ্যা আলাদা তারা হলো আইসোটোপ। আইসোটোপ বললেই প্রশ্ন উঠবে কার আইসোটোপ? প্রোটন-সংখ্যা এক হওয়ার জন্য যাদের রাসায়নিক সংজ্ঞা এক, সেইসব পরমাণু হবে একই মৌলের আইসোটোপ। আমরা যদি একটু আগেকার ইউরেনিয়ম বংশ-তালিকার দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব ^{২৩৮}U ও ^{২৩৯}U ইউরেনিয়মের আইসোটোপ, আবার ^{২০৯}Pb, ^{২১০}Pb, ^{২১৪}Pb, এরা সব লেড বা সীসের আইসোটোপ। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে আইসোটোপ-মাত্রেই তেজস্ক্রিয় নয়। আজকাল প্রায়ই শোনা যায় চিকিৎসায়, খাদ্য-সংরক্ষণে বা বস্তুর গঠন-পরীক্ষায় আইসোটোপ ব্যবহার করা হচ্ছে। সেগুলি সবই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বা চলতি কথায় রেডিও আইসোটোপ কিন্তু এমনও অনেক স্থায়ী আইসোটোপ আছে যেগুলি তেজস্ক্রিয় নয় অর্থাৎ আর ভাঙে না। ^{২০৬}Pb হলো এই রকম একটি আইসোটোপ।

স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয়তার ব্যাপারটা বুঝতে পারার পর থেকেই কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল একটি চিন্তা—মধ্যযুগের তান্ত্রিকদের মত লোহাকে সোনা করার চেষ্টা নয়, তবে অনেকটা সেইরকম বললেও ভুল হবে না। তাঁরা চাইলেন তেজকণা দিয়ে পরমাণু ভেঙে একটি মৌলকে অন্য মৌলে রূপান্তরিত করতে। এক্ষেত্রেও পথপ্রদর্শক হলেন লর্ড রাদারফোর্ড। ১৯১৯ সনে তিনিই প্রথম দেখালেন কেন্দ্রিণ-বিক্রিয়া বা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশান। বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন-গ্যাসের মধ্যে রাখা ছিল আলফা-কণার উৎস। তিনি দেখলেন এর ফলে এখান থেকে প্রোটন বেরচ্ছে। তখনকার দিনে তেজকণা দেখবার বা মাপবার কোনো সূক্ষ্মযন্ত্র ছিল না। জিঙ্ক

সালফাইডের প্রতিপ্রভ পর্দা ব্যবহার করা হতো। এক-একটি তেজ-কণা ঐ প্রতিপ্রভ পর্দায় একটি অতি ক্ষীণ আলোর বিন্দু সৃষ্টি করে। ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে বছরের পর বছর ধরে এক-একটি ক'রে ক্ষীণ আলোকরশ্মি গুণে রাদারফোর্ড ও তাঁর ছাত্ররা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের রহস্যভেদ করেছেন একের পর এক। নাইট্রোজেনকে আলফা-কণা দিয়ে আঘাত ক'রে যখন প্রোটন পাওয়া গেল দূরদর্শী রাদারফোর্ড বুঝলেন যে প্রোটন আসছে ঐ নাইট্রোজেন-নিউক্লিয়াস ভেঙে। মানুষের হাতে সেই প্রথম নিউক্লিয় বিক্রিয়া ঘটলো। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে রাদারফোর্ড শুধু নাইট্রোজেন নয়, বোরন, ফ্লোরিন, সোডিয়ম, অ্যালুমিনিয়ম প্রভৃতি অনেক ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুকে আলফা-কণা দিয়ে আঘাত ক'রে দূর-পাল্লার প্রোটন দেখতে পেলেন। প্রোটনগুলি অ্যাটম ভেঙে বেরচ্ছে সে-কথা ঠিক কিন্তু ঠিক কি ক'রে বেরচ্ছে সেটা জানা গেল আরো পরীক্ষার পর। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ঢঙে লিখলে বলা যায়

$${}^{১৪}_{৭}N + {}^{৪}_{২}He \rightarrow {}^{১৭}_{৮}O + {}^{১}_{১}H ।$$

নাইট্রোজেন-নিউক্লিয়াসের ভর ১৪, পরমাণু-অঙ্ক ৭, তার মধ্যে তীর-বেগে ঢুকে গেল একটি আলফা-কণা যেটি আসলে হিলিয়মের নিউক্লিয়াস—ভর ৪, আধান ২। সব মিলে ভর দাঁড়াল ১৮ আর আধান ৯। শক্তি-সামঞ্জস্য রাখতে সেটি ভেঙে হলো ${}^{১৭}_{৮}O$ এবং একটি প্রোটন—ভর ও আধানের সমতা বজায় রইল। দুই দিকে শক্তির নিত্যতার নিয়মটিও বজায় রাখতে হবে। পি এম এস্ ব্ল্যাকেট নামে ইংরেজ বিজ্ঞানী উইলসন মেঘ-প্রকোষ্ঠে এই সংঘাতের ছবি তুলে মাপজোপ ক'রে দেখালেন হিসেব ঠিক আছে।

সমস্যার কিন্তু শেষ নেই। রাদারফোর্ড আলফা-কণার সংঘাতে অনেক পরমাণু ভাঙলেন বটে কিন্তু পটাশিয়মের চেয়ে ভারী কোনো পরমাণুতে কেন্দ্রিণ-বিক্রিয়া ঘটাতে পারলেন না। পরমাণু-অঙ্ক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটমের আধানও বাড়ে।

আলফা-কণার আধান পজিটিভ। তাই যখন সে কোনো নিউ-

ক্লিয়াসের কাছে আসে, সেখানে তাকে একটা আধান-প্রাচীরের সম্মুখীন হতে হয়। সে প্রাচীর পার হতে পারবে কিনা তা নির্ভর করে আলফা-কণাটির গতিশক্তি কতটা তার উপর। রাদারফোর্ড যে-সব আলফা-কণা ব্যবহার করেছিলেন তাদের শক্তি মোটামুটি ৫ এম-ই-ভি। হয়ত এই সীমিত শক্তিই পটাশিয়মের চেয়ে বেশী আধানের নিউক্লিয়াসে ঢুকতে-না-পারার কারণ। পটাশিয়ম থেকে ভারী অ্যাটম না ভাঙার এ একটা কারণ হলো বটে কিন্তু রাদারফোর্ড অনেকগুলি হাল্কা অ্যাটমও ভাঙতে পারেন নি, যেমন হিলিয়ম, লিথিয়ম, কার্বন, অক্সিজেন ইত্যাদি। কেন যে তা হয় নি তার কারণ বার করাও খুব দুরূহ নয়। ধরা যাক আমরা একটা আলফা-কণা দিয়ে হিলিয়ম নিউক্লিয়াসে আঘাত করলাম—উদ্দেশ্য লিথিয়ম ও প্রোটন পাওয়া। তাহলে বিক্রিয়াটি হবে

$$^{8}_{2}\text{He}+{}^{8}_{2}\text{He}\rightarrow{}^{7}_{3}\text{Li}+{}^{1}_{1}\text{H}\text{ ।}$$

প্রথম $^{8}_{2}\text{He}$ হলো হিলিয়ম গ্যাসের নিউক্লিয়াস। দ্বিতীয়টি হলো আলফা-কণা। এখন হিসেব করা যাক আলফা-কণার গতিশক্তি কত হলে আলফা দিয়ে হিলিয়ম ভাঙা যাবে। বস্তু ও শক্তির নিত্যতা কিন্তু সব সময় বজায় রাখা চাই। এই কথাটি মনে রেখে এবার চলে আসা যাক অঙ্কে। ধরা গেল $^{8}_{2}\text{He}$-এর ভর $m(^{8}\text{He})$, লিথিয়মের ভর $m(^{7}\text{Li})$, প্রোটনের ভর $m(\text{H})$, যে আলফা-কণা দিয়ে আঘাত দেওয়া হচ্ছে তার শক্তি E এবং যে লিথিয়ম ও প্রোটন সৃষ্টি হলো তার গতিশক্তি নগণ্য। তাহলে

$$m(^{8}\text{He})c^{2}+m(^{8}\text{He})c^{2}+E=m(^{7}\text{Li})c^{2}+m(\text{H})c^{2}\text{ ।}$$

এখানে সব শক্তি আর্গ-এককে—সুতরাং

$$E=[m(^{7}\text{Li})+m(\text{H})-2m(^{8}\text{He})]c^{2}\text{ ।}$$

ভরের অ্যাটম-এককে $m(^{7}\text{Li})=$ ৭·০১৬০১, $m(\text{H})=$ ১·০০৭৯৭, $m(^{8}\text{He})=$ ৪·০০২৬।

সুতরাং $E=($৭·০১৬০১ + ১·০০৭৯৭ − ২ × ৪·০০২৬$)c^{2}$,
$=($০·০১৮৭৮$)c^{2}$ ।

তাহলে এম-ই-ভি-এককে $E=১৭\cdot৫$।

[এক অ্যাটম-ভর = $১\cdot৬৬\times ১০^{-২৪}$ গ্রা বা ৯৩১ এম-ই-ভি]
সুতরাং আলফা-কণা দিয়ে হিলিয়ম গ্যাস থেকে প্রোটন বার করতে গেলে লাগবে অন্তত ১৮·০ এম-ই-ভি শক্তি-বিশিষ্ট আলফা-কণা। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয়তা থেকে যে-সব আলফা-কণা বেরয় তার সব থেকে বেশী শক্তি হলো ৭·৭ এম-ই-ভি। এখন উপায় ?

ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। আহিত কণাগুলিকে আরও গতিশক্তি দেবার জন্য ১৯৩১ সালের পর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে নানা-ধরণের সব অ্যাটম-ভাঙার যন্ত্র। এদের নাম কক্রফ্ট-ওয়ালটন-জেনারেটর, ভ্যাণ্ডিগ্রাফ মেশিন, সাইক্লোট্রন, বিটাট্রন, সিন্‌ক্রোট্রন প্রভৃতি। পরে আরো কয়েকটি ত্বরণযন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে যাদের নাম কসমোট্রোন ও বিভাট্রোন। আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটনকে ৫০০ জি-ই-ভি (১ জি-ই-ভি = ১০০০ এম-ই-ভি) পর্যন্ত শক্তি-সম্পন্ন করা যায়। পরের অধ্যায়ে সে-প্রসঙ্গ আলোচনা করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ত্বরণযন্ত্র—কিসের ত্বরণ

অ্যাকসেলারেটর

ত্বরণযন্ত্র বা অ্যাকসেলারেটর নামটি এখন প্রায়ই শোনা যায় ; তার প্রধান কারণ কলকাতায় একটি বড় গোছের অ্যাকসেলারেটর তৈরি হয়েছে। পরমাণুর রহস্যের সঙ্গে এই যন্ত্রের সম্পর্ক কি ? কিসের জন্যই বা এই নামে একটি আলাদা অধ্যায় সংযুক্ত হলো ? এর উত্তরে বলতে হয়, মোটর গাড়ী তৈরি না করলেও আমাদের উদ্দেশ্য তার কলাকৌশলগুলি জেনে ফেলা। এখানে মোটর গাড়ীর প্রসঙ্গ এসে পড়ায় পাঠক হয়ত একটু বিভ্রান্ত হতে পারেন। কেননা, অ্যাকসেলারেটর নামটি এমনিতেই একটু বিভ্রান্তিকর।

পরমাণু-প্রসঙ্গে আমরা যে ত্বরণযন্ত্র বা অ্যাকসেলারেটরের নাম করছি তার সঙ্গে কিন্তু কারবুরেটর বা উইণ্ডশীল্ড ওয়াইপার বা গাড়ীর কলকব্জা-সংক্রান্ত কোনো কিছুরই কোনো সম্পর্ক নেই। অ্যাকসেলা-রেটরের কাজ অ্যাকসেলারেট করা, সাদা বাংলায় যাকে বলে ত্বরিত করা, কিন্তু সব সময় যে অ্যাকসেলারেটর মোটর গাড়ীকেই ত্বরিত করবে-তার কোনো মানে আছে কি ? যাঁদের আরো বেশী ত্বরা তাঁরা ক্যারাভেলে ভ্রমণ করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তাঁদের ত্বরিত না ক'রে যখন ভীমবেগে প্রোটনের দল ত্বরিত হয়, তখনই এই ত্বরণযন্ত্র বা অ্যাকসেলারেটর হয়ে পড়ে বিরাট এবং জটিলতাপূর্ণ একটি বৈজ্ঞানিক সমস্যা। চেষ্টা চলছে প্রোটনদের প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ কিলোমিটার বেগে ত্বরিত করার—এই কলকাতাতেই। পরিকল্পিত যন্ত্রে প্রোটনদের ছয় থেকে যাট এম-ই-ভি পর্যন্ত শক্তি-সম্পন্ন করা হবে।

ছুটন্ত প্রোটন

এই পর্যন্ত শুনে খুশী হয়ে কেউ কেউ আর কোনো প্রশ্ন নাও করতে পারেন। প্রোটনদের কলকাতাতেই এত জোরে ছোটানো হবে এই তো যথেষ্ট, কিন্তু যাঁদের স্বভাবটা খুঁতখুতে তাঁরা হয়ত বলতে পারেন এখনই প্রোটনদের ত্বরিত করার এত তাড়া কেন, এবং ক'রেই বা হবে কি? তাছাড়া কলকাতায় যানবাহনের যা অবস্থা তাতে প্রোটনদের এত জোরে ছোটানো কি যুক্তিসঙ্গত? তাহলে এঁদের বলতে হয় নির্ভয়ে পথ চলুন, যত জোরেই ছুটুক না কেন প্রোটনদের সঙ্গে কারো ধাক্কাধাক্কি লাগতেই পারে না। কোনো শহরের কোনো রাস্তা দিয়েই ছোটার বাসনা এদের নেই। এদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত পথ ছাড়া এরা কিছুতেই ত্বরান্বিত হবে না এবং সে-পথ তৈরি করাটাই একটা সমস্যাবিশেষ। তারই নাম অ্যাকসেলারেটর। অ্যাক-সেলারেটর তৈরির উদ্দেশ্য প্রোটনদের ত্বরিত করা, অবশ্য প্রোটন ছাড়া ডয়টেরন, আলফা প্রভৃতি অন্যান্য আহিত কণারাও এতে ত্বরিত হয়, সুবিধার জন্য আমরা এখানে বার বার প্রোটনের নাম করছি। ত্বরিত করার কথাটা আগে বলা অনেকটা ঘোড়ার সামনে গাড়ী এনে হাজির করার ব্যাপার। এবার প্রোটনদের থামিয়ে রেখে ব্যাপারটার মূলে প্রবেশ করা যাক।

রাসায়নিক ও পারমাণবিক পরিবর্তন

যে বস্তুময় জগৎ আঁটোসাঁটো, তরলিত বা গ্যাসীভূত—নানারূপে দৃশ্যমান—কখনো বৃক্ষ, কখনো বীজ, কখনো শাখা, কখনো পত্র, কখনো মেঘ, কখনো বা জলরূপে—তাপ- বা বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োগে তার সবটাই যে কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি মৌল বা তাদের যৌগে রূপান্তরিত হয়ে পঞ্চভূতে বিলীন হবে তা পরীক্ষা-দ্বারা বহুকাল আগেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। এটা কি ধরণের পরীক্ষা? আপনারা সকলেই জানেন এটা রাসায়নিক পরীক্ষা। প্রকৃতিতে রাসায়নিক পরিবর্তন এমনিতে তো ঘটছেই, মানুষের

হাতেও অনায়াসে ঘটছে। একটি জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ধরালেই এক টুকরো কাগজের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটবে ; কিন্তু পদার্থের আদিতে আছে যে-পরমাণু এবং তারও অন্তঃস্থলে আছে যে-নিউক্লিয়াস তার কণিকাগুলি এমনই বজ্রবাঁধনে আঁটা যে কোনো মানুষের সাধ্য নেই যে কোনো রাসায়নিক উপায়ে তাদের আলাদা করে। অন্তত এই রকমই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল। বারণ করলে কার না জেদ চেপে যায় ? সুতরাং এ অপমান পদার্থবিদ্‌দেরও সহ্য হলো না—তাঁরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এটা এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়, এমন তো হামেশাই ঘটছে—মানব-সভ্যতার ইতিহাসই হলো প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের ইতিহাস। অ্যাকসেলারেটরের জন্মকথাও এই ইতিহাসের ধারাকে বহন ক'রে চলেছে, সৃষ্টিবহির্ভূত কিছু ঘটায়নি।

ইংলণ্ড, ১৯১৯

যুদ্ধঘোষণা হলো ১৯১৯ সনে। অন্য কোথাও হলে হয়ত আমরা বেশী খুশী হতাম, কিন্তু হলো ইংলণ্ডে, লর্ড রাদারফোর্ডের ল্যাবরেটরিতে। রাদারফোর্ডের সৈন্যসংখ্যা বেশী ছিল না, তাতেই তিনি নাইট্রোজেন-অ্যাটমের ব্যূহ ভেদ করলেন। রাদারফোর্ড লক্ষ্য করেছিলেন প্রকৃতিতে যে-সব মৌল পদার্থ স্বাভাবিকভাবেই তেজস্ক্রিয়, —যেমন রেডিয়ম বা থোরিয়ম, যার থেকে আলফা-কণা বার হচ্ছে—সেই-সব আলফা-কণা দিয়ে স্থায়ী মৌলের নিউক্লিয়াসে আঘাত করলে কেন্দ্রিণ-বিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব। তবে স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে যে আলফা-রশ্মি বেরয় তার শক্তি খুব বেশী নয়, তাছাড়া প্রকৃতি থেকে আহরণ করার মত তেজস্ক্রিয় বস্তুর পরিমাণও খুব কম। প্রকৃতির উপর ভরসা ক'রে বসে থাকা বৈজ্ঞানিকের স্বভাব নয় এবং একবার যুদ্ধঘোষণা করে পশ্চাদপদ হওয়াও নেহাত কাপুরুষতা। ১৯২৬ এবং '২৭ সন থেকে অনুমান করা হচ্ছিল যে আলফা-কণার বদলে প্রোটন দিয়ে পরমাণু-কেন্দ্রকে আঘাত করলে কেন্দ্রিণ-বিক্রিয়া

ঘটবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে কারণ তা হলে অনেক কম শক্তিতে কাজ হচ্ছে। অথচ এমন কোনো স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় মৌল জানা নেই যা থেকে প্রোটন বেরয়। একমাত্র উপায়, যদি কৃত্রিম উপায়ে কোনো কৌশলে প্রোটনকে ত্বরিত করা যায়। রাদারফোর্ডের দুই সেনাপতি কক্রফ্‌ট আর ওয়ালটন (ওয়াটসন নয়) প্রতিপক্ষকে এই পথে বিধ্বস্ত করতে অগ্রসর হলেন। স্যার জন কক্রফ্‌টের ডায়েরি থেকে—

'নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঠিক যে কি হবে জানা ছিল না, এদিকে লর্ড রাদারফোর্ড বলছেন চালিয়ে যাও। তিন-চার বছর লেগে গেল যন্ত্রটা তৈরি করতে। আমরা চারটে কাঁচের সিলিণ্ডারের একটা টাওয়ার তৈরি করলাম, প্রত্যেকটা চার মিটার উঁচু। একটা হাই-ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে সেটাকে আরো উচ্চ বিভবে রূপান্তর করলাম। তারপর আমরা আরো দুটো কাঁচের সিলিণ্ডার নিলাম। মধ্যটা ভ্যাকুয়াম ক'রে তার মধ্যে হাই ভোল্টেজে হাই-ড্রোজেন অ্যাটম ছোঁড়া হলো। যন্ত্রের তলা দিয়ে যখন এই হাই-ড্রোজেন অ্যাটমগুলো বেরিয়ে এল তখন তাদের কি অবিশ্বাস্য গতি—এক সেকেণ্ডের কম সময়ে আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হয়ে যেতে পারে এমন তাদের বেগ। তারপর আমরা এদের দিয়ে আঘাত করলাম একটা লিথিয়মের আস্তরণে। মুহূর্তের মধ্যে লিথিয়মের নিউক্লিয়াস দু টুকরো হয়ে দুটো হিলিয়ম নিউক্লিয়াসে পরিণত হলো।'

যুদ্ধে জয়

যুদ্ধে জিতলেন তাঁরা। যে যন্ত্রে মানুষ প্রথম বিধাতার উপর টেক্কা দিয়ে নিউক্লিয়াসে পরিবর্তন ঘটাল তার নাম কক্রফ্‌ট-ওয়ালটন জেনারেটর। এটি হলো সমস্ত আধুনিক অ্যাকসেলারেটরের পূর্ব-পুরুষ। তারপর তিরিশ বছরে আরো অনেক কিছু ঘটে গেছে, ত্বরণযন্ত্র হয়েছে বিচিত্রতর, জটিলতর, বিশালকায়। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে কলকাতার এই যন্ত্রটি নেহাতই মাঝারি গোছের। সে-

সম্বন্ধে আমরা একটু পরেই বিস্তারিত আলোচনা করবো ; কিন্তু মূল প্রশ্নের এখনো মীমাংসা হয় নি। প্রশ্ন হলো প্রোটনকে অবিশ্বাস্য বেগে ছোটানোর সঙ্গে নিউক্লিয়াস-ভাঙার সম্পর্ক কি। সম্পর্ক অতি নিকট। নিউক্লিয়াসের মধ্যে পরমাণু-কণিকাগুলিকে বেঁধে রেখেছে যে বন্ধন-শক্তি, সামান্য উত্তাপে তার কিছুই হয় না। সামান্য তাপ বা অল্প বিভবে মলিকিউলের মধ্যেকার বাঁধন খুলে শুরু হয় রাসায়নিক বিক্রিয়া ; কিন্তু নিউক্লিয়াসের মধ্যে পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটানোর একটি মাত্র উপায়—তা হলো তার মধ্যে উচ্চশক্তির আহিত কণা দিয়ে আঘাত করা। যে-সব প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে নিউক্লিয়াস তৈরি তাদের পারস্পরিক বাঁধন এত শক্ত যে কোনো আহিত কণা দিয়ে তার মধ্যে বদল ঘটানো দশ, বিশ, একশো, এমন কি এক হাজার ইলেকট্রন ভোল্টের কর্ম নয়। প্রোটনের ক্ষেত্রে অন্তত কয়েক মিলিয়ন-ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি হতে হবে।

মিলিয়ন ভোল্ট শুনে ভয় পাবার কিছু নেই, তবে কিনা আমরা ফিউজের তার বদলাতে হলেই মিস্ত্রি ডাকি, কাজেই কয়েক কোটি নাট, বল্টু, সুইচ, তারের কুণ্ডলী, 'তেজস্ক্রিয়তা', 'সাবধান', 'প্রবেশ নিষেধ' ইত্যাদি নোটিশ-সমন্বিত একটি অ্যাকসেলারেটর দেখলে তার দশ মাইল দূর থেকে হাঁটার বাসনা হবে তাতে আর আশ্চর্য কি ? কিন্তু নির্ভয়ে এগোন, আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত।

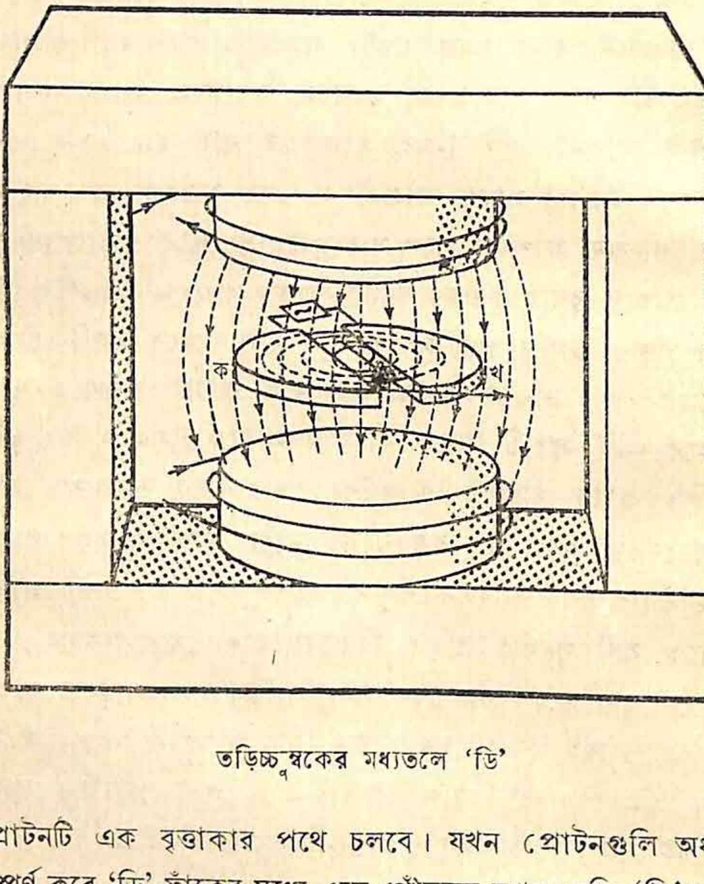
জটিলতা, জটিলতা

এগিয়ে এলে প্রথমেই চোখে পড়বে একটি বাড়ী। স্থাপত্যরীতি মোগল, ফরাসী না দেশলাইএর বাক্স সেদিকে মনোযোগ দেবেন না। ভিতরে কি হচ্ছে সেটাই মুখ্য। বলাই বাহুল্য, ভিতরে গিয়ে সবাই সবকিছু দেখে আকৃষ্ট হবেন না। আপনি যদি মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ার হন তবে দৈত্যাকার দুশো পঞ্চাশ মেট্রিকটনের ম্যাগনেটের,

—যার মেরুতলের ব্যাস অষ্টাশী ইঞ্চি—নিখুঁত সূক্ষ্মতায় মুগ্ধ হবেন। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হলে এর সাড়ে চারশো কিলোওয়াট ক্ষমতার বেতার-কম্পাঙ্কের অসিলেটরটি আপনার মনোহরণ করবে। তত্ত্বীয়বিজ্ঞানী হলে সমস্ত যন্ত্রটা আপনার কাছে ম্যাজিক বাক্সের মতো, তার থেকে বার হওয়া প্রোটন, ডয়টেরন, আলফা-কণাদের দিকেই আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। যে যাই হন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্বন্ধে আগ্রহী না হয়ে পারবেন না। যদি মনে করে থাকেন আপনার পক্ষে সাইক্লোট্রন-সম্বন্ধে ঔৎসুক্য অনধিকার চর্চা তাহলে বৃথাই এতক্ষণ পরমাণু-বৃত্তান্ত পড়লেন। একটি আহিত কণা অর্থাৎ চার্জড পার্টিক্‌লকে যদি ধাক্কা মেরে একটি চৌম্বক-ক্ষেত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তবে কণাটি বৃত্তপথে ঘুরতে থাকবে—এই সত্যটি আছে যাবতীয় সাইক্লোট্রনের মূলে। ছুটন্ত আহিত কণার অতঃপর কি কর্তব্য ? তার কর্তব্য তাকে যত জোরে ধাক্কা দেওয়া হবে তত বড় বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকা। প্রত্যেকবার একটি আবর্তন শেষ না হতেই সেই হতভাগ্য আহিত কণাকে যদি পুনর্বার তড়িত বিভবের ধাক্কা মেরে বৃত্তপথে ফেরত পাঠানো যায় তবে তার বেগ সমানুপাতিকভাবে বাড়তে থাকবে এবং প্রতিবারই সে আগের চেয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করবে। লরেন্স নামে এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী (তাঁর সঙ্গে লেডী চ্যাটার্লির কোনো সম্পর্কই নেই) আহিত কণার গতিবেগ বাড়াবার এই অভিনব উপায় আবিষ্কার করেছিলেন ১৯৩২ সনে। সাইক্লোট্রন আবিষ্কারের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কারও পান।

পরপৃষ্ঠায় ছবিতে ইংরেজি অক্ষর D'র আকারের দুটি ইলেক্‌ট্রোডের (তড়িদ্‌দ্বার-এর) মাঝখানে ধরা যাক একটি প্রোটনের উৎস রাখা হয়েছে। ক-নামক 'ডি'-তে পজিটিভ ও খ-নামক 'ডি'-তে নেগেটিভ বিভব দেওয়া আছে। স্বভাবতই প্রোটনগুলি খ-নামক 'ডি'র দিকে আকৃষ্ট হবে। একবার 'ডি'র মধ্যে ঢুকে গেলে সেখানে আর তড়িৎ-ক্ষেত্র নেই। ডি-দুটি যদি একটি তড়িচ্চুম্বকের

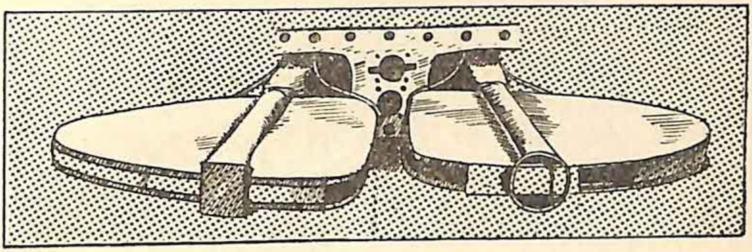
মধ্যতলে এমনভাবে রাখা থাকে যে চৌম্বক বলরেখাগুলি 'ডি'-তলের উপর লম্বভাবে অবস্থান করে, তবে ডি'র মধ্যে ঢুকেই



তড়িচ্চুম্বকের মধ্যতলে 'ডি'

প্রোটনটি এক বৃত্তাকার পথে চলবে। যখন প্রোটনগুলি অর্ধবৃত্ত সম্পূর্ণ করে 'ডি'-ফাঁকের মধ্যে এসে পৌঁছচ্ছে তখন যদি 'ডি'গুলির বিভব-চিহ্ন উল্টে দেওয়া যায় অর্থাৎ খ পজিটিভ ও ক নেগেটিভ হয় তবে প্রোটনগুলি আবার ক-'ডি'-র দিকে আকৃষ্ট হবে। ক ও খ-র মধ্যে বিভব পার্থক্য যদি V হয় তবে খ থেকে বেরবার সময় প্রোটনগুলির শক্তি হবে e × V। e প্রোটনের চার্জ বা আধান। এর পরে ক-'ডি'-র অর্ধবৃত্ত পথ অতিক্রম ক'রে খ-'ডি'-র মুখে আসবার সময় শক্তি হবে e × ২V। প্রথম অর্ধবৃত্ত থেকে দ্বিতীয়টি একটু বড় হবে। তৃতীয়টি হবে আরও একটু বড়।

এইভাবে চলবে। ক ও খ-র মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট কম্পাঙ্কর পরবর্তী তড়িৎ বিভব দিতে পারলে প্রোটন-কণাগুলি এইভাবে শক্তি আহরণ



কলকাতা সাইক্লোট্রনের 'ডি'

ক'রে চলবে, যতক্ষণ না তারা ডি-বাক্সের শেষ সীমানায় এসে পেঁছয়। লরেন্সের কৌশল হলো এক সঙ্গে এক মিলিয়ন ভোল্ট বিভব উৎপাদন না ক'রে অপেক্ষাকৃত অল্প বিভবের মধ্যে আহিত কণাগুলিকে বার বার ঘুরিয়ে তাদের উচ্চশক্তিতে শক্তিমান করা। চক্রাকার পথে ত্বরণ সৃষ্টি করার জন্যই এর নাম হলো সাইক্লোট্রন।

সাইক্লোট্রন কলকাতায় নতুন কিছু নয়। সাহা ইনস্টিটিউটে বর্তমানে যে সাইক্লোট্রনটি চালু আছে তার শক্তি ৪ এম-ই-ভি। বিজ্ঞানী বি ডি নাগচৌধুরী, যিনি কলকাতায় সাইক্লোট্রনটি বসান, বার্কলেতে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিয়েশান ল্যাবরেটরিতে তিনি সাক্ষাৎ ডঃ লরেন্সের ছাত্র ছিলেন।

প্রোটন ছাড়া অন্যান্য আহিতকণা সাইক্লোট্রনের সাহায্যে ত্বরিত করা হয়েছে। যেমন ডয়টেরন* ^{২}H, ট্রাইটন ^{৩}H, আলফা ^{৪}He হিলিয়ম ^{৩}He। পরে অবশ্য আরো ভারী কণা ত্বরিত করা হয়েছে।

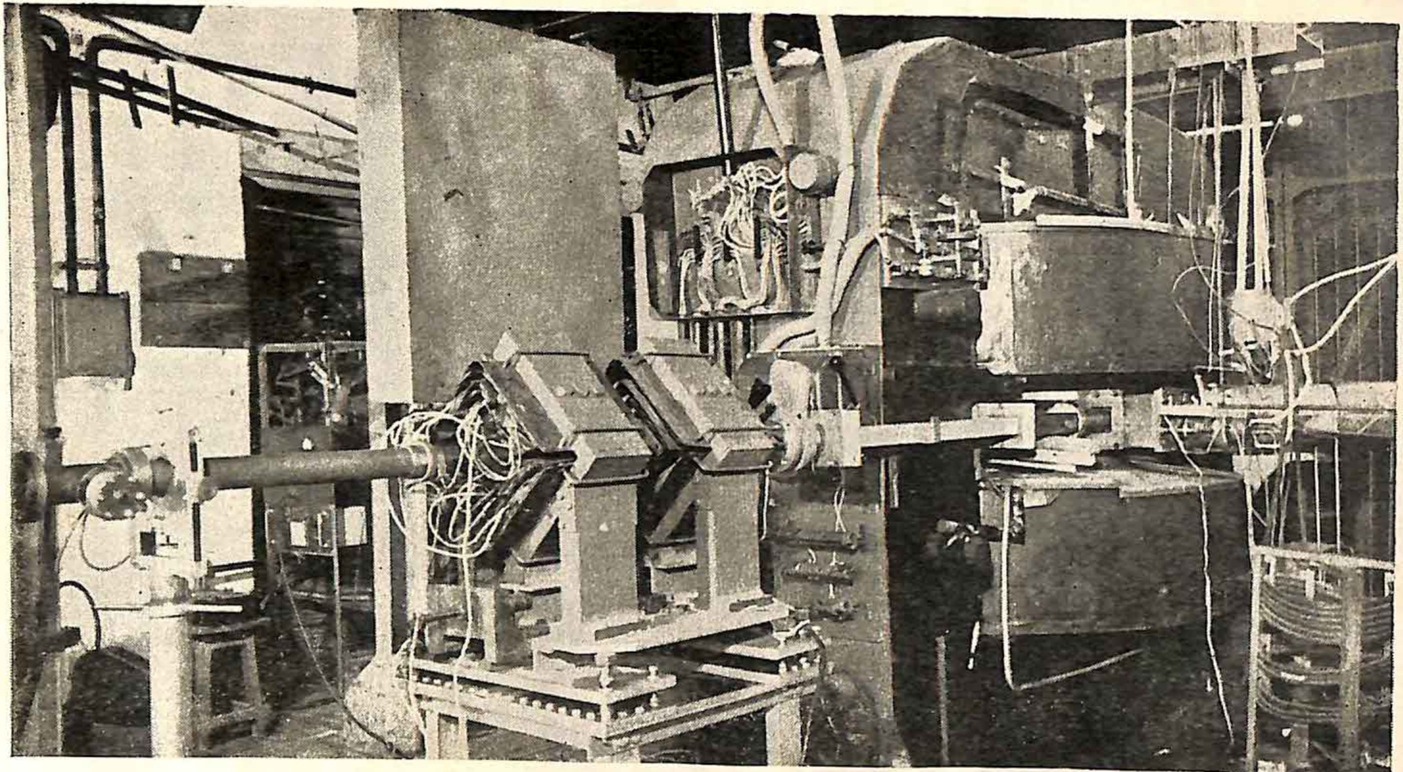
* ডয়টেরন ^{২}H এবং ট্রাইটন ^{৩}H—এরা হাইড্রোজেনের আইসোটোপ। ^{২}Hতে আছে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন, ^{৩}Hতে একটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন। মনে আছে নিশ্চয় ^{১}H হলো হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস।

যে-সব সাইক্লোট্রন এখনও চালু আছে তাদের মধ্যে কয়েকটি নিচের তালিকায় দেওয়া হলো—

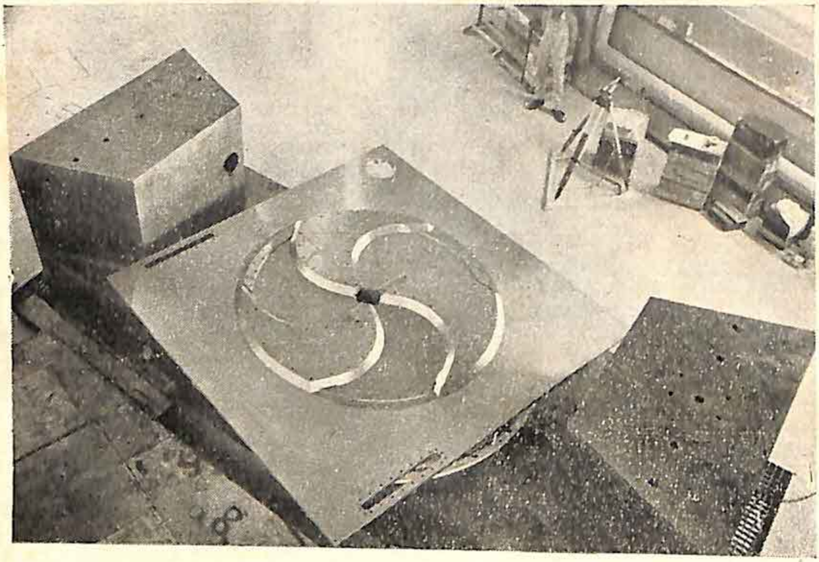
মেরুতলের ব্যাস	এম-ই-ভি'তে শক্তি	স্থান
৩৭″	৪ ^{১}H	কলকাতা
৪২·৫″	১৫ ^{২}H	কিয়াটো, জাপান
৬১·৫″	২০ ^{২}H	বার্মিংহাম, ইংলণ্ড
৮৩″	২২ ^{২}H	স্টকহলম, সুইডেন
৮৬″	২২ ^{১}H	ওকরিজ, টেনেসি, আমেরিকা
৯০″	১৪ ^{১}H	লিভারমোর, ক্যালিফোর্নিয়া, আমেরিকা

এই তালিকাটি দেখলেই বোঝা যাবে, সাইক্লোট্রন দিয়ে ত্বরিত-শক্তি একটা বিশেষ সীমার বাইরে আর বাড়ানো যায় না। বাড়াবার জন্যে তৈরি হলো সিনক্রো-সাইক্লোট্রন। অবশ্য তৈরি হলো বলতে যত সোজা, প্রকৃতপক্ষে ততটা নয়। তবে আমরা এখন সাইক্লোট্রনের যান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে না গিয়ে শুধু মূল প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করবো।

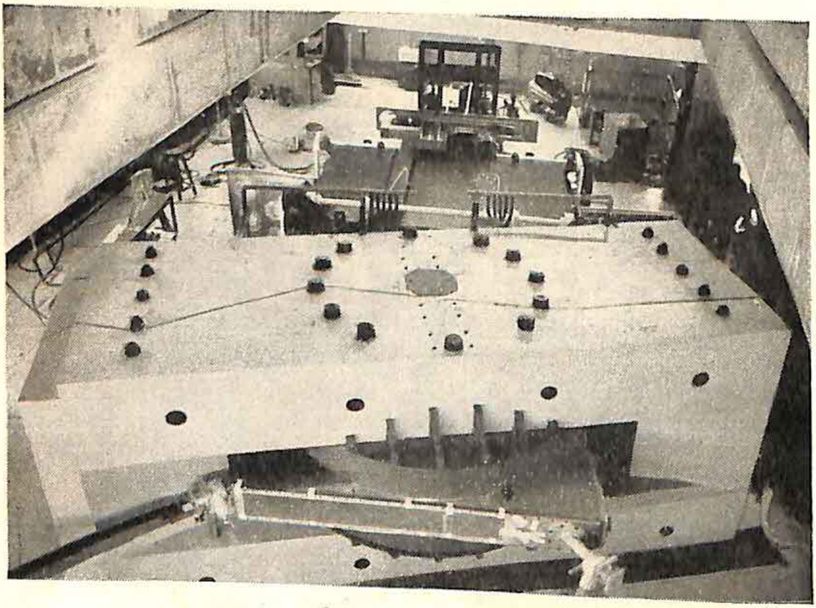
সাইক্লোট্রন-গোষ্ঠীর মধ্যে তরুণতম এ-ভি-এফ সাইক্লোট্রন—এজিমুথালি ভেরিয়িং ফিল্ড সাইক্লোট্রন—যাকে বলা যেতে পারে দিগাংশিকভাবে পরিবর্তী চৌম্বকক্ষেত্র আছে এমন সাইক্লোট্রন। এরও একটি পূর্ব-ইতিহাস আছে। ১৯৩৮ সনে যখন সাইক্লোট্রন-বিশারদরা ফোকাসিং নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন তখন এল এইচ টমাস নামে একজন তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্ একটি নতুন ধরনের প্রস্তাব করলেন। আশ্চর্যের বিষয় টমাস সাইক্লোট্রনের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না। তড়িৎগতিবিদ্যার সাহায্য নিয়ে টমাস দেখালেন যে সমসত্ত্ব চৌম্বকক্ষেত্র ব্যবহার না করে যদি দিগাংশিকভাবে পরিবর্তী চৌম্বকক্ষেত্র ব্যবহার করা যায় তাহলে ফোকাসিং-এর কোনো ভাবনাই থাকে না। ঐ পরিবর্তী চৌম্বকক্ষেত্রই বিপথগামী আহিত-কণাগুলিকে মধ্যতলে ফিরিয়ে আনবে। এই নীতি অনুসরণ ক'রে আরো যে নতুন



সাহা ইন্‌স্টিটিউটের সাইক্লোট্রন



এ-ভি-এফ সাইক্লোট্রনের মেরুতল



ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের ভেরিএবল এনার্জি সাইক্লোট্রন তৈরি হচ্ছে

ধরণের সাইক্লোট্রন তৈরি হলো, সেটা নানা নামে পরিচিত—যেমন স্পাইরাল-রিজ সাইক্লোট্রন, সেকটার-ফোকাস সাইক্লোট্রন, আইসো-ক্রোনাস সাইক্লোট্রন, এ-ভি-এফ সাইক্লোট্রন, ভেরিএবল-এনার্জি সাইক্লোট্রন প্রভৃতি।

এখনকার চালু বিভিন্ন ত্বরণযন্ত্রগুলির শক্তি-সীমা কতদূর তা নিচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে—

ত্বরণযন্ত্র	প্রোটন শক্তি	প্রথম ব্যবহার
ককক্রফট্ ওয়ালটন জেনারেটর	০·২- ১ এম-ই-ভি	১৯৩০
ভ্যান ডি গ্রাফ জেনারেটর	০·৫- ৮ ,,	১৯৩০
ট্যানডেম ভ্যান ডি গ্রাফ	৫-১১ ,,	১৯৫৮
এম্পারার ট্যানডেম	১০-২০ ,,	১৯৬৬
সাইক্লোট্রন	২-২২ ,,	১৯৩১
লিনিয়ার প্রোটন অ্যাক্সেলারেটর	১০-৫০ ,,	১৯৫৪
এ-ভি-এফ. সাইক্লোট্রন	১০-৬৫ ,,	১৯৬০
সিনক্রোসাইক্লোট্রন	২০-৭০০ ,,	১৯৪৫
সিনক্রোট্রন		
—কসমোট্রন, ব্রুকহাভেন	৩ জি-ই-ভি	১৯৫২
—বিভাট্রন, বার্কলে	৬·২ ,,	১৯৫৪
—সিনক্রোফেজোট্রন, ডুবনা	১০ ,,	১৯৫৭
এ-জি-সিনক্রোট্রন		
—CERN জেনিভা	২৮ ,,	১৯৫৯
—ব্রুকহাভেন	৩৩ ,,	১৯৬০
সারপুকভ (মস্কোর কাছে)	৭৬ ,,	১৯৬৭
ফার্মি ন্যাশনাল অ্যাকসেটারেটার, ইলিনয়, আমেরিকা	৫০০ ,,	১৯৭২
সোভিয়েট ইউনিয়ন	১০০০ ,,	(পরিকল্পনা আছে)

ত্বরণযন্ত্র	প্রোটন শক্তি	প্রথম ব্যবহার
মেসন ফ্যাক্টরি—		
TRIUMPF, ভ্যাঙ্কুবার, ক্যানাডা	৫২০ এম-ই-ভি	১৯৭৪
LAMPF, লস এলামস, আমেরিকা	৮০০ ,,	১৯৭২
SIN, জুরিখ, সুইজারল্যাণ্ড	৫৯০ ,,	১৯৭৪

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ত্বরণযন্ত্রগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায় : উচ্চশক্তি- ও নিম্নশক্তি-বিশিষ্ট ত্বরণযন্ত্র। যে শক্তিতে আঘাত করলে বস্তুর কেন্দ্রক থেকে মেসন, পায়ন ইত্যাদি মৌলিক কণা বেরতে থাকে সেটাকে উচ্চশক্তির নিম্ন সীমা বলে ধরা হয়। আর নিম্নশক্তি বলতে বোঝায় ২ থেকে ২০ এম-ই-ভি। নিম্নশক্তির ত্বরণযন্ত্রে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে পরমাণুর গুণাবলী, কিন্তু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হলে কি হবে, এই নিউক্লিয়াসের যে কত রহস্য তার অন্ত পাওয়া ভার। মামুলী সাইক্লোট্রনে ত্বরিত কণাদের বিম-কারেণ্ট ৮–১০ মাইক্রো-আম্পিয়র হয়। সিনক্রোসাইক্লোট্রনের গড় বিম-কারেণ্ট কয়েক মাইক্রোআম্পিয়রের বেশী পাওয়া শক্ত কিন্তু এ-ভি-এফ সাইক্লোট্রনে ১ মিলিআম্পিয়র বিম-কারেণ্ট পেতে কোনো অসুবিধাই নেই। তাই এর সাহায্যে মাঝারি শক্তির কেন্দ্রক গবেষণার এক নতুন দিক খুলে গেল। বেশী বিম-কারেণ্ট পাওয়ার জন্য কেন্দ্রক-পদার্থবিদ্যা ছাড়া কেন্দ্রক-রসায়ন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান—এমনকি বিশেষ বিশেষ তেজস্ক্রিয় মৌল তৈরির কাজেও এর প্রয়োগ হচ্ছে। আহিত কণার সাহায্যে কেন্দ্রিণ বিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণার কাজেও এ-ভি-এফ সাইক্লোট্রন খুব উপযোগী।

বিরাট সরকারী প্রকল্প

বিপদের কথা, এখন শুধু কাগজ-পেন্সিল হাতে নিয়ে আর বুদ্ধি খাটিয়ে তেমন কিছু আবিষ্কার করা যাচ্ছে না। যান্ত্রিক জটিলতা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় পৌঁছেচে যে বড় সাইক্লোট্রন তৈরি করাটা শেষ অবধি এঞ্জিনীয়ারিং সমস্যায় দাঁড়াচ্ছে।

প্রথমত কি করে কয়েক মিলিয়ন ভোল্ট বিভব উৎপন্ন করা যেতে পারে ?

দ্বিতীয়ত এমন কি অপরিবাহী বা অন্তরক মাধ্যম পাওয়া যেতে পারে যার এই উচ্চ বিভব-ধারণ ক্ষমতা আছে ?

কক্রফট ও ওয়ালটন যে কাসকেড জেনারেটর তৈরি করেছিলেন তা থেকে এক এম-ই-ভি'র বেশী শক্তি পাওয়া যায় নি। লরেন্সের সাইক্লোট্রনের কৌশল হলো এক সঙ্গে মিলিয়ন ভোল্ট বিভব উৎপাদন না ক'রে অপেক্ষাকৃত অল্প বিভবের মধ্যে বার বার ঘুরিয়ে আহিত কণার শক্তি বৃদ্ধি করা। যান্ত্রিক এবং এঞ্জিনিয়ারিং জটিলতার মধ্যে আর বেশী না গিয়েও এটা বোঝা সহজ যে আজকালকার বিরাট গবেষণা-প্রকল্পগুলি কোনো ব্যক্তিবিশেষের সাধ্যের বাইরে। কাজেই এগুলি প্রায় সবই হয় সরকারী প্রকল্প। লরেন্স যখন সাইক্লোট্রন তৈরি করেছিলেন তখন তা ছিল একান্তভাবে বিজ্ঞানীর নিজস্ব যন্ত্র, গবেষণাগারের কারখানায় এর সব যন্ত্রাংশ তৈরি হতো। এটি ছিল আকারে ছোট এবং বিশেষ জটিলতাও এর মধ্যে ছিল না। আজ-কালকার এ-ভি-এফ সেই তুলনায় অতিকায় এবং দক্ষ কারিগরী শিল্পের একটি কীর্তি বিশেষ। কলকাতায় ২২৪ সে মি ব্যাসের মেরুতল-সমন্বিত এ-ভি-এফ সাইক্লোট্রনের যে তড়িচ্চুম্বকটি আছে তার লোহার ওজন ২৫৩ মেট্রিক টন। যে কুণ্ডলী দিয়ে ঐ চুম্বকে তড়িৎ-সঞ্চালন করা হয় শুধু তার তামার ওজন ৯ মেট্রিক টন। ভারী শিল্পের সাহায্য ছাড়া এইসব যন্ত্র আজকাল আর তৈরি করা সম্ভব নয়। টেকনোলজি ও বিজ্ঞান এখন পরস্পর-নির্ভর। দেশের টেকনোলজি প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত এসব কাজে হাত দেওয়ার কথাই ওঠে না। মস্কোর কাছে সারপুকভে যে ৭০ জি-ই-ভি অ্যাক্সেলারেটর আছে তার তড়িচ্চুম্বকের ওজন ২০,০০০ টন। যে-বৃত্তাকার পথে প্রোটন ত্বরিত হয় তার ব্যাস ৫০০ মিটার। আমেরিকায় ৫০০ জি-ই-ভি যন্ত্র ফার্মি ন্যাশনাল অ্যাকসেলারেটরের ব্যাস ৩ কিলোমিটার। রাশিয়া যে ১০০০ জি-ই-ভি যন্ত্র পরিকল্পনা

করেছে তার ব্যাস হবে সাড়ে ছয় কিলোমিটার। কলকাতার অ্যাক্সেলারেটরটি মধ্যশক্তির—এর থেকে ৬-৬৫ এম-ই-ভি প্রোটন, ১২--৬০ এম-ই-ভি ডয়ট্রন ও ২৪-১২০ এম-ই-ভি অ্যালফাকণা ত্বরান্বিত করা যাবে। এ ছাড়া কার্বন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলের কেন্দ্রকও উচ্চ শক্তিতে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে। এক লাফেই তো আর রাশিয়ায় আমেরিকার মত হাজার-বিলিয়ন-ভোল্ট অ্যাক্সেলারেটর করা সম্ভব নয়। তবে পারমাণবিক টেকনোলজিতে হাত পাকাবার পর সেটা করা যেতে পারে। বিলিয়ন ভোল্টে পৌঁছতে গেলে যে প্রস্তুতি চাই তার সূচনা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা

অনাহিত মৌলিক কণা নিউট্রন

অ্যাটম-ভাঙার চেষ্টায় আলফা- বা প্রোটন-ব্যবহারের কথা এতক্ষণ হলো। আলফা বা প্রোটন আহিত কণা। এর পজিটিভ আধান নিউক্লিয়াসের পজিটিভ আধানের সঙ্গে বিকর্ষী বল তৈরি করে বলেই তাদের নিউক্লিয়াসের কাছে যেতে বাধা, কিন্তু নিউট্রনের তো কোনো আধান নেই। নিউক্লিয়াসের মধ্যে তবে নিউট্রন ছুঁড়ে অ্যাটম-ভাঙার চেষ্টা করা হয়নি কেন ? তার কারণ অন্য কিছু নয়, নিউট্রন-কণাটির অস্তিত্ব ১৯৩২ সনের আগে জানা-ই ছিল না। এটি আবিষ্কৃত হয় রাদারফোর্ডের প্রিয় ছাত্র ও সহকর্মী চ্যাড্উইকের হাতে। তিনি অনেক গবেষণার পর দেখলেন পরীক্ষা-করে-পাওয়া তথ্যগুলি যুক্তি-সঙ্গত ভিত্তিতে খাড়া করতে হলে নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন ছাড়া আর একটি অনাহিত মৌলিক কণার অস্তিত্ব থাকতে হবে যার ভর হবে প্রায় প্রোটনের সমান। কোনো আধান নেই বলে এর নাম দেওয়া হয় নিউট্রন।

নিউট্রন আবিষ্কারের কিছুদিন পরেই ১৯৩৪ সনে আর একটি ব্যাপারে বিজ্ঞানী-মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কারক মাদাম ও পিয়ের কুরীর মেয়ে-জামাই আবিষ্কার করলেন কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা। এই বিজ্ঞানী দম্পতির নাম ইরে কুরী ও ফ্রেডারিক জোলিও। বিজ্ঞানের ইতিহাসে দুই পুরুষ ধরে স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার নজির আর নেই। অবশ্য পিতা-পুত্র একসঙ্গে পেয়েছেন এমন ঘটনাও ঘটেছে। সার উইলিয়ম ও সার লরেন্স ব্র্যাগের কথা আমরা আগেই বলেছি। যাই হোক জোলিও-কুরী দম্পতি কি করলেন দেখা যাক। তাঁরা অ্যালুমিনিয়ম-২৭

আইসোটোপটির উপর আলফা-কণা আঘাত ক'রে দেখলেন তা থেকে প্রোটনের সমান আধান ছাড়াও নিউট্রন বেরচ্ছে। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে ঠেকল। কারণ তখন বিক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা ছিল—

$$ {}^{২৭}_{১৩}Al + {}^{৪}_{২}He \rightarrow {}^{৩০}_{১৪}Si + {}^{১}_{১}H $$

কিন্তু নিউট্রন বেরলে তো সেটা পরিণত হবে ${}_{১৩}{}^{২৬}Al$তে, অথচ অ্যালুমিনিয়মের ঐরকম কোনো আইসোটোপের কথা এযাবৎ কাল জানা ছিল না। আর তাছাড়া পজিটিভ আধানই বা আসে কোথা থেকে? জোলিও-কুরী দম্পতি দেখলেন যদি ধরা যায়—

$$ {}^{২৭}_{১৩}Al + {}^{৪}_{২}He \rightarrow {}^{৩০}_{১৪}Si + {}^{১}_{0}n + {}^{0}_{১}e $$

তাহলে হয়ত গোলমালটা মেটে। ${}^{১}_{0}n$ হলো নিউট্রন যার ভর এক আর আধান শূন্য। $+{}^{0}_{১}e$টা আবার কি বস্তু? ওটা হলো পজিট্রন অর্থাৎ বিটা-কণা বা ইলেকট্রনের মতই একটি কণিকা, কিন্তু যার আধান ইলেকট্রনের বিপরীত অর্থাৎ পজিটিভ। তাই ইলেকট্রনের সঙ্গে মিলিয়ে এই যমজ ভাইটির নাম রাখা হয়েছিল পজিট্রন। এর অস্তিত্ব খুব বেশী আগে জানা ছিল না। ১৯২৮ সনে অঙ্কের সাহায্যে এইরকম একটি কণিকার প্রথম ধারণা করেন বৃটিশ বিজ্ঞানী পি এ এম ডিরাক। তারপর ১৯৩২ সনে নভোরশ্মির ভিতর থেকে উইলসন মেঘ-প্রকোষ্ঠে তার প্রথম ছবি পান অ্যাণ্ডারসন। ইলেকট্রন আর পজিট্রনের ভর এক কিন্তু আধান বিপরীত। তাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যাবে কি ক'রে? উপায় কিন্তু খুব সোজা। চুম্বক-তত্ত্বের একটি প্রাথমিক সূত্র হলো যে চুম্বকক্ষেত্রে যদি একটি চলন্ত আহিত কণা ছাড়া যায় তবে তা বৃত্তাকারে চলবে। পজিটিভ কণিকা যদি হয় দক্ষিণাবর্তী (অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা যে দিকে চলে সেইদিকে ঘূর্ণমান) তা হলে নেগেটিভ কণিকা হবে বামাবর্তী। তাই মেঘ-প্রকোষ্ঠটি চুম্বকক্ষেত্রে রাখলে ইলেকট্রন ও পজিট্রন উল্টো-দিকে রেখাপাত করবে এবং কোনটি কি তৎক্ষণাৎ ধরা যাবে। জোলিও-কুরী দম্পতি এইভাবেই তাঁদের সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলেন। আণ্ডারসন যে পজিট্রনের ছবি তুলেছিলেন তা এসেছিল নভোরশ্মি

(কসমিক রশ্মি)'র সঙ্গে এবং আমরা জানি যে নভোরশ্মির উৎস পৃথিবী থেকে অনেক দূরে অজানা সব ভান্তঃপ্রদেশ। ল্যাবরেটরিতে পজিট্রন তৈরী হলো ঐ প্রথম। তবে তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় জোলিও-কুরী দম্পতি আবিষ্কার করে বসলেন সেই সঙ্গে। তাঁরা দেখলেন যে যতক্ষণ আলফা-কণা দিয়ে অ্যালুমিনিয়মকে আঘাত করা হচ্ছে ততক্ষণ নিউট্রন ও পজিট্রন দুই-ই বেরচ্ছে কিন্তু যদি আলফা-কণার উৎসটি সরিয়ে নিয়ে আঘাত বন্ধ করা হয় তবুও পজিট্রন বেরোনো বন্ধ হচ্ছে না। অনেক রকম মাপ নিয়ে দেখা গেল পজিট্রন নির্গমনের হার ৩·২৫ মিনিটে অর্ধেক হচ্ছে। মনে করা যেতে পারে যে, ${}^{২৭}_{১৩}Al$এর সঙ্গে ${}^{৪}_{২}He$ ধাক্কা দিয়ে হলো ফসফরাসের একটি আইসোটোপ ${}^{৩০}_{১৫}P$ এবং আর একটি নিউট্রন। আর ফসফরাসের এই আইসোটোপটি অস্থায়ী এবং তেজস্ক্রিয়। তার থেকে পজিট্রন বেরচ্ছে।

$${}^{৩০}_{১৫}P \rightarrow , {}^{৩০}_{১৪}Si + {}_{+১}^{0}e$$

এই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার অর্ধায়ূ ৩·২৫ মিনিট। জোলিও-কুরীরা কিন্তু একটি পরীক্ষা ক'রেই কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার সিদ্ধান্তে পোঁছন নি। অ্যালুমিনিয়ম ছাড়া হাতের-কাছে-পাওয়া অনেক মৌলতেই তাঁরা এই পরীক্ষা চালালেন। ম্যাগনেসিয়ম, বোরন প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে সুফল পাওয়া গেল। প্রকৃতিতে পাওয়া স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা ছাড়াও দেখা গেল মানুষের হাতে তেজস্ক্রিয়তা উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। পরমাণু বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ক'রে এক নতুন অধ্যায় যুক্ত হলো — কৃত্রিত তেজস্ক্রিয়তা। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা ব্যাপারটিকে মানুষের কল্যাণকর নানা কাজে লাগান হয়েছে—পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

ততদিন নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ও নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি বিষয়গুলি বেশ সাবালক হয়ে পড়েছে। দু-চারজন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে এই সব আলোচনা আর সীমাবদ্ধ নয়। ইউরোপ, আমেরিকার অনেক গবেষণাগারেই প্রতিভাবান বিজ্ঞান-কর্মীরা এর নানা সমস্যা নিয়ে

মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন। জোলিও-কুরীদের ঐ ঐতিহাসিক পরীক্ষার সমসাময়িক কালে পদার্থবিদ্যার রঙ্গমঞ্চে উদয় হলেন আর এক জ্যোতিষ্ক, পরমাণুশক্তির ইতিহাসে যাঁর নাম প্রথম পাতায় থাকবে। তিনি হলেন তখনকার রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক এনরিকো ফার্মি। মাত্র বাইশ বছর বয়সেই ফার্মি প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। গাণিতিক ও ব্যবহারিক পদার্থ-বিদ্যা—দুটি দুরূহ বিষয়েই যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন তিনি। আমরা যখনকার কথা বলছি ততদিনে তিনি বিটা কণা-ক্ষয়-সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখে বিখ্যাত হয়ে গেছেন। ১৯৩৪ সনে জোলিও-কুরীদের ফলাফলের কথা জানতে পেরে তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। আলফা-কণার বদলে ভারী নিউক্লিয়াসগুলোকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলেও তো কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া উচিত। আর যেহেতু নিউট্রনের কোনো আধান নেই তার পক্ষে নিউক্লিয়াসে ঢোকাও খুব সোজা কিন্তু নিউট্রন আসবে কোথা থেকে ? ফার্মির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে এ সমস্যা তো কিছুই নয়। তেজস্ক্রিয় রেডিয়ম থেকে বেরয় রেডন গ্যাস, ফার্মি তার সঙ্গে মেশালেন বেরিলিয়ম পাউডার। রেডন থেকে যে আলফা-কণা বেরয়, বেরিলিয়মকে ধাক্কা দিয়ে নিউট্রন তৈরি করতে পারে। তেজস্ক্রিয়তা মাপার যন্ত্র গাইগার-গণকটি নিউট্রন-উৎস থেকে বেশ দূরে রাখা দরকার। ফার্মি একটি লম্বা বারান্দার এক মাথায় রাখলেন কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পরমাণু তৈরির মালমসলা, অন্য মাথায় তেজস্ক্রিয়তা মাপার যন্ত্রপাতি। চলতে লাগল তেজস্ক্রিয়তার পরীক্ষা।

এদিকে হলো আরেক বিপদ। তেজস্ক্রিয়তা বেরতে না বেরতেই তার আয়ু হয়ে যাচ্ছে শেষ ; সুতরাং ঐ অল্প সময়ের মধ্যে বারান্দার অপর প্রান্তে গিয়ে তার পরিমাণ মাপতে হলে তীরবেগে দৌড়নো ছাড়া গতি নেই। ফার্মি ও তাঁর সহকর্মীরা এইভাবেই কাজ করছিলেন। এইসময় একদিন স্পেন থেকে এক নামকরা পণ্ডিত এলেন ফার্মির সঙ্গে দেখা করতে। অল্প বয়স হলেও ততদিনে

ফার্মির নাম বিজ্ঞানীমহলে বেশ পরিচিত। স্পেনীয় বৈজ্ঞানিকটির অবশ্য ফার্মির সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ ছিল না। তিনি কেতাদুরস্ত পোষাক পরে ল্যাবরেটরিতে ঢুকছেন। একে-ওকে জিজ্ঞাসা করছেন ফার্মি কোথায়। জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে সবে লম্বা বারান্দাটিতে ঢুকেছেন এমন সময়ে উস্কো-খুস্কো-চুল ময়লা-কোট পরা দুটি লোক তাঁকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঝড়ের বেগে বারান্দা অতিক্রম ক'রে চলে গেল। বলাই বাহুল্য এদের একজন ফার্মি। পরে যখন স্পেনের পণ্ডিত ফার্মির আসল পরিচয় পেলেন তখন যে তিনি কিরকম হতভম্ব হয়ে গেলেন সেটা সহজেই অনুমেয়।

বিজ্ঞানীদের অন্যমনস্কতা ও নানারকম পাগলামির গল্প অবশ্য বহুল প্রচলিত। ফার্মিও এই প্রচলিত ধারণার কোনো ব্যতিক্রম নন। তবে ফার্মি-সম্বন্ধে আরেকটি কৌতুকপ্রদ ব্যাপার হলো তাঁর নোবেল প্রাইজ পাওয়া। যে তথ্যটি আবিষ্কারের জন্য তাঁকে এই বিখ্যাত সম্মানে ভূষিত করা হয় পরে আবার তাঁর নিজের হাতেই আরেকটি আবিষ্কার প্রমাণ করে যে সেই প্রথম আবিষ্কারটি ভুল। অবশ্য ফার্মি আরো দুবার নোবেল প্রাইজ পেলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকত না। একবার তাঁর বিটা-কণা-ক্ষয় থিওরির জন্য, আরেকবার পরমাণু-বিভাজনে প্রথম নিয়ন্ত্রিত হারে চক্রবৃদ্ধি-বিক্রিয়ার সৃষ্টি ক'রে পরমাণু চুল্লী-তৈরির জন্য। সেই গল্পে আমরা এর পরেই আসছি।

ফিশন ও ফিউসন

অ্যাটম ভেঙে শক্তি ও অ্যাটম জুড়ে শক্তি

পরমাণু-প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এখন যেখানে পৌঁছেছি সেটা পরমাণু-তত্ত্বের সবচেয়ে চমকপ্রদ অধ্যায়। পরবর্তী চন্দ্রবিজয়ের ঘটনা বাদ দিলে এটাই বিংশ শতাব্দীর আশ্চর্যতম ঘটনা। ১৯৪৫ সনে হিরোশিমা আর নাগাসাকি ধ্বংস ক'রে প্রথম পৃথিবীর সামনে আত্মপ্রকাশ হলো পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তির। তবে বোমা বললে পুরোটা বলা হলো না এবং বেচারা পরমাণুর উপর বিলক্ষণ অবিচার করা হয়ে যায়। অ্যাটম মানেই কি অ্যাটম বোমা ? খুবই দুঃখের বিষয় অনেকের মনে এই জাতীয় একটা ধারণা চলতি হয়েছে। সেজন্য ব্যাপারটা খুলে বলাই ভাল।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার পর যে-দিকে বৈজ্ঞানিকদের ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো তা হলো পরমাণুকে ভেঙে শক্তি বার করা এবং তারও পরে পরমাণুকে জুড়ে শক্তি বার করা। অ্যাটম ভেঙে শক্তি, অ্যাটম জুড়ে শক্তি। বলাই বাহুল্য অ্যাটম বা পরমাণুর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রক। এখন মজা এই যে প্রায় সব সময়ই আমরা নিউক্লিয়াস-সংক্রান্ত কোনো কথা বলতে গেলে, সহজে যে-নামটি বলা যায় সেই অ্যাটম নামটি ব্যবহার করি। বলাটা ভুল, কিন্তু এরকমই হয়ে আসছে। তাই অ্যাটম-ভাঙা বা অ্যাটম-জোড়া বলতে বোঝাচ্ছে নিউক্লিয়াস ভাঙা বা নিউক্লিয়াস জোড়া। আর নিউক্লিয়াস যখন অ্যাটমেরই অংশ তখন বললেই বা এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে ? ইংরাজিতেও atomic energy, atóm bomb, atomic reactor ইত্যাদি বলা হয় যথাক্রমে nuclear energy, nuclear bomb, nuclear

reactor অর্থে। বাংলায় যখন বলা হয় পারমাণবিক শক্তি বা পারমাণবিক বোমা, তখন পরমাণু-কেন্দ্রিণ শক্তি- বা পরমাণু-কেন্দ্রিণ শক্তি-উদ্ভূত বোমা অর্থেই বলা হয়। বাংলায় আরো একটা ভুল করা হয়, সেটা হল অণু আর পরমাণু নিয়ে। আণবিক আর পারমাণবিক এক জিনিস নয়। অণু হলো মলিকিউল আর পরমাণু হলো অ্যাটম। কাজেই আণবিক মানে মলিকিউলার আর পারমাণবিক মানে অ্যাটমিক। অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনকে ভুল করে বলতে শোনা যায় আণবিক শক্তি-সংস্থা। তার বদলে পারমাণবিক শক্তি-সংস্থা বলাই সঙ্গত। আণবিক আর পারমাণবিক কথা দুটি শুনতে অনেকটা একরকম বলেই বোধ হয় গণ্ডগোলটার উৎপত্তি হয়েছে। ভাষার কাজ কোনো একটি বিশেষ ধারণা ব্যক্ত করা। কাজেই আমরা যখন অ্যাটম অর্থাৎ পরমাণুর কার্যকলাপ আর গঠনবৈচিত্র্য জেনে গেছি তখন অ্যাটমকে ভাঙা মানে যে নিউক্লিয়াসকে ভাঙা এটা বুঝতে আর কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়।

অ্যাটম-ভাঙার কথা কিন্তু আগেই একবার হয়ে গেছে। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে আলফা-কণার আঘাতে নিউক্লিয়াস ভেঙে লর্ড রাদারফোর্ড পরমাণু-কেন্দ্রিণ বিক্রিয়ার যে সূত্রপাত করেন সেই পথ ধরে এগিয়ে চললেন পরবর্তী কর্মীরা। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে নিউট্রন আবিষ্কারের পর নিউট্রনকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঢুকিয়ে ইউরেনিয়ম থেকে ইউরেনিয়ম-উর্ধ্ব মৌল-তৈরির যে চেষ্টা ফার্মি আরম্ভ করেন তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আরো দুদল গবেষক। ফরাসী দেশের জোলিও-কুরী দম্পতি এবং জার্মানীতে হান ও স্ট্রাসমান ঐ একই পরীক্ষায় উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। ইউরেনিয়মকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করার পর যে ঠিক কি হচ্ছে তাঁরা কেউই ধরতে পারছিলেন না। বিক্রিয়ান্ত পদার্থগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণে অন্য নানা মৌল ধরা পড়ায় সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে ইউরেনিয়ম থেকে অল্প ভারী বা কিছু হাল্কা অ্যাটম-ভারের মৌল পাওয়া যাবে। ফার্মি ও তাঁর সহকর্মীরা

ইউরেনিয়ম মৌলকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত ক'রে অন্তত চার রকমের বিভিন্ন তেজস্ক্রিয়তার প্রমাণ পান। রাসায়নিক বিশ্লেষণ ক'রে রেডিয়মের একটি আইসোটোপ (অ্যাটম-সংখ্যা ৮৮) পাওয়া যাচ্ছে বলে লেখেন হান ও তাঁর সহকর্মীরা। কিন্তু জোলিও-কুরী সম্প্রদায় কিছুদিনের মধ্যেই জানালেন হানদের ভুল হয়েছে—যেটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা বেরিয়ম (অ্যাটম-সংখ্যা ৫৬), রেডিয়ম নয়। এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে জার্মান বিজ্ঞানীরা মোটেই দমলেন না। আবার বহু পরীক্ষা ক'রে তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন যে যাকে তাঁরা আগেরবারে রেডিয়ম মনে করেছিলেন সেটা আসলে বেরিয়ম কিন্তু তাঁরা এই সঙ্গে জানালেন যে ইউরেনিয়মের সঙ্গে নিউট্রনের সংঘাতে যে কেন্দ্রিণ-বিক্রিয়া হচ্ছে তাতে বেরিয়ম উৎপন্ন হওয়া মানে ইউরেনিয়ম নিউক্লিয়াস ভেঙে প্রায় সমান দুটো টুকরো হওয়া। এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের কেন্দ্রিণ-বিক্রিয়া, এর অস্তিত্ব আগে জানা ছিল না। এর নাম দেওয়া হলো ফিশন বা বিভাজন।

ইউরেনিয়ম-কেন্দ্রে বিভাজনের এই খবরটা বেরয় খুবই ছোট করে "নেচার" নামে ইংলণ্ডের এক বিজ্ঞান-পত্রিকায়। ফ্রিশ ও মাইটনার নামে দুই জার্মান বিজ্ঞানী "নেচার" সম্পাদকের কাছে একটি চিঠি পাঠান। কাগজের এক কোণে নেহাতই অনাড়ম্বরভাবে ছাপা হয় সেই চিঠি। এতে তাঁরা লিখেছিলেন ইউরেনিয়ম-নিউক্লিয়াসে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে সেটি প্রায় সমান দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং প্রায় ২০০ এম-ই-ভি শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। এই খবরটা যে বিজ্ঞানজগতে এবং ভবিষ্যৎ সমাজে কি বিরাট আলোড়ন এনে দেবে সেটা সম্পাদক মশাই মোটেই বুঝতে পারেন নি। পারলে বড় বড় শিরোনামায় তিনি এই আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা ছাপাতেন—তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিভাজন পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। এর দ্বারা আইনস্টাইনের সেই ফরমুলা আবার নতুন ক'রে প্রমাণিত

হলো অর্থাৎ বস্তুর শক্তিতে রূপান্তরের কথা। বিভাজন এই তথ্যকে হাতেনাতে দেখিয়ে দিল। পরমাণুর কেন্দ্রে নিউট্রন ঢুকে পড়লে কেন্দ্রকের মধ্যে মহা গোলযোগ সৃষ্টি হয়—কেন্দ্রকের স্থায়ী অবস্থা হয়ে পড়ে টলমলে, শেষে এটি দুই ভাগ হয়ে গেলে আবার শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। সংক্ষেপে এই হলো বিভাজনের ঘটনা, কিন্তু যেটা যুগান্তকারী বলা হচ্ছে সেটা হলো এই বিভাজনের ফলে লব্ধ একটি বিশেষ ব্যাপার। টুকরো দুটির ওজন যোগ করলে দেখা যায় মূল নিউক্লিয়াসের ওজন থেকে কম। বৈজ্ঞানিকের পরিভাষায় তাই বিভাজন মানেই খানিকটা বস্তু অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া।

আপাতদৃষ্টিতেই তাই মনে হলেও আসলে কিন্তু বস্তু অবলুপ্ত হচ্ছে না। হারিয়ে যাওয়া বস্তু চেহারা বদলে পরিণত হচ্ছে শক্তিতে। পৃথিবীতে হারায় না কিছুই। তবে বিভাজনের বিস্ময় হলো এই যে একটি ইউরেনিয়ম-পরমাণুর কেন্দ্রে বিভাজন ঘটিয়ে বার হচ্ছে ২০০ এম-ই-ভি শক্তি অর্থাৎ একটি পরমাণু থেকে দুশো মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট। এক গ্রাম ইউরেনিয়মে আছে প্রায় $২\cdot৫ \times ১০^{২১}$টি নিউক্লিয়াস। এর তাৎপর্য কি বুঝতে খুব বেশী বুদ্ধির দরকার করে না। বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়ে গেল। বিভাজন নিয়ে বহু লোক একসঙ্গে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন। এখানে মনে রাখা দরকার বিভাজন কেবল ইউরেনিয়মেই সম্ভব হয়েছিল। যে-কোনো মৌলের অ্যাটমে যে কোন অবস্থায় বিভাজন ঘটতে পারে না। প্রশ্ন উঠতে পারে কেবল ^{২৩৮}U-এই কেন বিভাজন হবে, অন্য কিছুতে কেন হবে না? তার উত্তরে বলা চলে যে কোনো ভারী নিউক্লিয়াসে একটি অতিরিক্ত নিউট্রনের আগমন কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দুই বিপরীত-ধর্মী শক্তির ভারসাম্য বিচ্যুত করে। পারার একটি ফোঁটাকে বড় থেকে বড় করতে করতে সেটা আর গোল থাকে না, লম্বাটে ডাম্বেলের আকার ধারণ করে। সেই সময় একটি ছুঁচ ফুটিয়ে তাকে দুটি ফোঁটায় পরিণত করা যায়। তখন তার মধ্যে কি কি শক্তি কাজ করে যাতে পারার ফোঁটাটি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

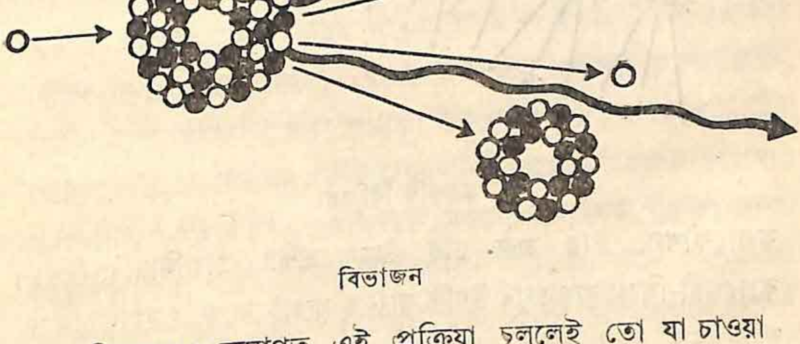
কণায় বিভক্ত না হয়ে ঠিক দুটি গোল আকার পায়? এই তুলনাটি প্রসারিত করে নিয়ে আসা যায় নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে। মোটামুটিভাবে এইভাবে চিন্তা করতে শুরু করেই নীলস বোর ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে নিউক্লিয়াসের লিকুয়িড ড্রপ-মডেল বা তরল ফোঁটার মডেল তৈরি করেন। মনে রাখা ভাল অ্যাটমের মডেল তৈরির সময়ও বোর সেই কাজে যুক্ত ছিলেন। পারার বেলায় কাজ করে মহাকর্ষ আর পৃষ্ঠ-টান, নিউক্লিয়াসের বেলায় আধানের বিকর্ষী-বল আর আকর্ষী কেন্দ্রিণ-বল। বিকর্ষী-বল চায় ভেঙে ফেলতে, আর কেন্দ্রিণ-শক্তি চায় ধরে রাখতে।

ততদিনে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়েছে। হিটলারের অত্যাচার ও পীড়নের ভয়ে বহু ইহুদী দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সেই সময়কার অনেক নামজাদা বৈজ্ঞানিক। ইটালি থেকে ফার্মি, জার্মানি থেকে আইন-স্টাইন ও আরো প্রায় জন কুড়ি প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী চলে এলেন সাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকায়। এখানে এসে তাঁরা নির্ঝঞ্ঝাটে বিজ্ঞান চর্চা করার সুবিধা পেলেন। ডেনমার্ক থেকে নীলস বোরও মাঝে মাঝে এসে যোগ দিয়েছেন এঁদের সঙ্গে। পরমাণুর ভেতরের বিচিত্র শক্তির দু-একটি ঝলক তখন দেখা দিলেও এ-সম্বন্ধে ছিল সম্পূর্ণ ধারণার অভাব। এমন কি ১৯৩৮ সনেও সাইক্লোট্রন আবিষ্কর্তা বিখ্যাত বিজ্ঞানী লরেন্স বলেছিলেন পরমাণু থেকে শক্তি আহরণ ক'রে কাজে লাগানো নেহাত পাগলের মত চিন্তা।

বিভাজনের ফলে পরমাণু থেকে শক্তি বার হলো। খুবই ভাল কথা। কিন্তু একবার মাত্র। এ যেন একটি দেশলাই কাঠি ফস ক'রে জ্বলে নিভে যাওয়া। জঙ্গলে যখন দাবানল জ্বলে, তখন যে-রকম একটি গাছ থেকে তার পাশের গাছে, তারপর তারও আশেপাশের গাছে জ্বলতে জ্বলতে সারা বন জুড়েই আগুন বিস্তৃত হয় সেইরকম একটা কিছু দরকার। দাবানলেরই বা দরকার কি, সাধারণ উনুন কয়লা বা কাঠের আগুন কি করে জ্বলে? দেশলাই তো একবার

তাপ দিল মাত্র। তারপর সেই তাপ ক্রমে কয়লা বা কাঠের অন্য সব টুকরোগুলিতে সঞ্চারিত হয়, তিন-চার ঘণ্টা ধরে সেই আগুন জ্বলতে থাকে। বিভাজনের দ্বারা পরমাণু-শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে মাত্র একবার—তা সে শক্তির পরিমাণ যাই হোক না কেন। সুতরাং প্রচণ্ড শক্তির আধার পরমাণু থেকে আরো শক্তি টেনে বার করতে হলে একবার বিভাজনই যথেষ্ট নয়। এমন কোনো একটা ব্যবস্থা দরকার যাতে বেশ ইচ্ছামত, অনেকক্ষণ ধরে, নিয়ন্ত্রিত হারে শক্তিটা বার হতে থাকে।

এই সমস্যার সম্মুখীন হলেন এনরিকো ফার্মি ও তাঁর দলবল। বিভাজনের সময় একটা বিশেষ পথের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছিল, সেই পথে এগোতে লাগলেন এঁরা। বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াস যে শুধু দ্বিধাবিভক্ত হচ্ছে তাই নয়—তার থেকে দুটি-তিনটি নিউট্রনও বেরিয়ে যাচ্ছে। এটা তথ্য-হিসেবে বিশেষ মূল্যবান। এই পলাতক নিউট্রনদের দিয়ে কি অন্য পরমাণুর কেন্দ্রে বিভাজন ঘটানো যায় না? তার পরে আবার বিভাজনের ফলে পলায়মান নিউট্রন দিয়ে

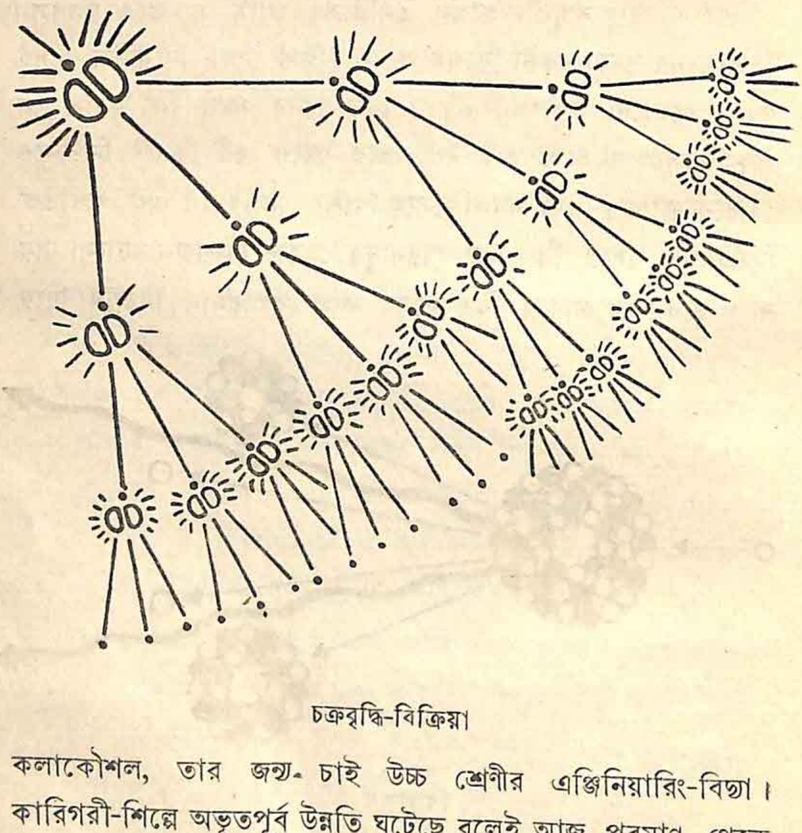


বিভাজন

আরো বিভাজন? ক্রমাগত এই প্রক্রিয়া চললেই তো যা চাওয়া হচ্ছে তাই পাওয়া যায়। এই চেষ্টা করতে গিয়ে কলম্বিয়া বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে আঁটলো না—শিকাগোর ফুটবল স্টেডিয়ম সাময়িকভাবে পরীক্ষাগারে পরিণত করলেন ফার্মি। চেষ্টা চলল একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটে, চারটে থেকে আটটা, আটটা থেকে ষোলোটা এইভাবে বিভাজন, যাকে বলে চেন-রিঅ্যাকশন, বা চক্রবৃদ্ধি-বিক্রিয়া।

এর পরে যা হলো সেটা এই যুগ ছাড়া অন্য কোন সময় সম্ভব হতো বলে মনে হয় না। কেননা শুধু মাথা খাটিয়ে বার করার পরও যা বাকি থেকে যাচ্ছে—হাতে কলমে পরীক্ষা করার জন্য যান্ত্রিক



চক্রবৃদ্ধি-বিক্রিয়া

কলাকৌশল, তার জন্য চাই উচ্চ শ্রেণীর এঞ্জিনিয়ারিং-বিদ্যা। কারিগরী-শিল্পে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে বলেই আজ পরমাণু থেকে শক্তি বার করা সম্ভব হয়েছে। অনেক সময় বলা হয় বটে এক জাহাজ এক্সপেরিমেণ্টের চেয়ে এক পাউণ্ড থিওরি শ্রেয়—অর্থাৎ

মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যাওয়াটাই আসল, হাতেকলমে সেটা পরীক্ষা করে দেখাটা তত নয়, কথাটা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যি নয়। নিয়ন্ত্রিত চক্রবৃদ্ধি-বিক্রিয়া হতে পেরেছিল অনেকাংশে এই এক্স-পেরিমেণ্টের দৌলতে।

এটা সম্ভব করলেন বৈজ্ঞানিক ফার্মি। তিনি কয়েকটি নব আবিষ্কৃত তথ্যকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবন করলেন এমন একটি কৌশল যার ফলে অ্যাটমের সীমাহীন শক্তির বন্সা এসে গেল মানুষের হাতের মুঠোয়। প্রকৃতির জটিলতম রহস্যকেও হার মানতে হলো মানুষের বুদ্ধির কাছে। ফার্মিই প্রথম কনট্রোলড্ চেন রিঅ্যাকশন বা নিয়ন্ত্রিত উপায়ে চক্রবৃদ্ধি-বিক্রিয়া করতে সক্ষম হন। ফার্মি দেখলেন বিভাজন-জনিত ছিটকে-বেরিয়ে-আসা নিউট্রনগুলির সংখ্যা ও গতি যদি কমিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তাদের ২৩৫U অর্থাৎ ইউরেনিয়মের একটি বিশেষ আইসোটোপের নিউক্লিয়াসে বিভাজন ঘটাবার ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এই গতিবেগ কমাবার উপায় কি? উপায় একই আকারের অন্য পরমাণুর সঙ্গে নিউট্রনগুলির ধাক্কা লাগিয়ে দেওয়া যাতে পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে এদের তেজ ও গতির খানিকটা ক্ষয় হয়। এই কাজে ব্যবহার করা হলো গ্র্যাফাইট। ফার্মি পর পর ইউরেনিয়াম আর গ্র্যাফাইটের স্তর সাজালেন, তার মধ্য দিয়ে চালানো হলো কনট্রোল-রড, মানে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য হাতল-জাতীয় জিনিস। ইউরেনিয়ম আর গ্র্যাফাইট দেওয়া হলো এইজন্যে যাতে ইউরেনিয়ম-পরমাণু থেকে তীরবেগে বেরিয়ে-আসা নিউট্রন ছুটোকে গ্র্যাফাইটের স্তর অনেক ধীর-গতি ক'রে দেয় এবং ঠিক ততটা গতিবেগ দেয় যাতে ইউরেনিয়ম নিউক্লিয়াসে বিভাজন ঘটানোর মত যথেষ্ট শক্তি থাকে। গ্র্যাফাইট নেওয়ার আরেকটা উদ্দেশ্য হলো এই যে এর মধ্যে দিয়ে নিউট্রনের গতি অবারিত থাকে অথচ তা নিউট্রনকে গ্রাস করে না। অবশ্য এই কাজটা হাইড্রোজেন দিয়েও হতে পারত। জলের মধ্যেও নিউট্রনের গতি কমিয়ে দেওয়ার গুণ আছে কিন্তু নানা কারণে সেটার বদলে গ্র্যাফাইট দিয়েই ফার্মি

তৈরি করলেন তাঁর প্রথম পরীক্ষামূলক ইউরেনিয়ম পাইল। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে তিনি এই পরীক্ষায় সফল হলেন। ইউরেনিয়ম-বিভাজন হলো, একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি এইভাবে চলতে লাগল বিভাজন—হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের বদলে শক্তি বেরতে লাগল একটু একটু ক'রে। যে-সব নিউট্রন বিভাজনের কাজে লাগল না, সেগুলি ২৩৮U-এর মধ্যে পুনঃপ্রবেশ ক'রে তার নিউক্লিয়াসে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটিয়ে তৈরি করল দুটি নতুম মৌল : নেপচুনিয়ম ও প্লুটোনিয়ম। এই দুটি মৌল প্রাকৃতিক অবস্থায় অতি অল্প পরিমাণে বিরাজ করে। পরে দেখা গেছে প্লুটোনিয়ম নিউক্লিয়াসেও খুব সাফল্যজনকভাবে বিভাজন সম্ভব হয়েছে।

ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত হারে পরমাণু থেকে শক্তি বার করার ক্ষমতা অবশেষে মানুষের করতলগত হলো। এই অত্যাশ্চর্য খবর কিন্তু তখনই প্রচার না ক'রে কিছুদিন গোপন রাখা হয়েছিল। মনে রাখা দরকার তখন যুদ্ধ চলেছে। যেখানেই নতুন কোনো শক্তির সম্ভাবনা আছে যা সামরিক কাজে লাগানো যেতে পারে সেখানেই অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে ঘটল আর এক ব্যাপার। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট তখন রুজভেল্ট। তিনি আইনস্টাইনের কাছ থেকে হঠাৎ এক চিঠি পেলেন। এই চিঠিতে আইনস্টাইন তাঁকে জানান ইউরেনিয়ম থেকে পাওয়া গেছে এক অভাবনীয় শক্তির উৎস—যা থেকে মারাত্মক বোমা তৈরি করা সম্ভব। ব্যাপারটা আন্দাজ ক'রে সেই সময় জার্মানরা ইউরেনিয়ম-রপ্তানি বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে বুদ্ধিমান ও তৎপর বিজ্ঞানীর অভাব ছিল না। প্রচণ্ড বোমা যারা আগে তৈরি করতে পারবে মহাযুদ্ধে সেই পক্ষের জয় নিশ্চিত। কাজেই এখন কে কত তাড়াতাড়ি বোমা-তৈরির রহস্যটি বার করতে পারে সেটাই হলো আসল প্রতিযোগিতা।

সুতরাং আইনস্টাইন লিখলেন, এ তথ্যটি আপনার গোচরে আনা কর্তব্য বিবেচনা ক'রে আমি এই চিঠি লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি। আপনার

সরকার এ দিকে যত শীঘ্র সাফল্যলাভ করতে পারেন ততই মঙ্গল।

আইনস্টাইনের চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্রের টনক নড়ল। এরপর যা আরম্ভ হলো তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। দেশের সবচেয়ে মাথাওয়ালা বিজ্ঞানী ও কারিগরদের একত্র ক'রে প্রায় দুশো কোটি টাকা খরচ ক'রে লস আলামস নামক নিউ মেক্সিকোর এক নির্জন জায়গায় গড়ে তোলা হলো এক বিচিত্র ও বিরাট গবেষণা-কেন্দ্র। কি করে বিভাজন-জনিত শক্তি যুদ্ধের কাজে লাগান যেতে পারে এই নিয়ে দিবারাত্র কাজ চলতে লাগল। সেই শহরে কেউই নিজের আসল নামে পরিচিত ছিলেন না। এমনই সতর্কতামূলক সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এঁদের হাতে যে সমস্যাটা তুলে দেওয়া হলো তার জটিলতার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার।

বোমা আর জ্বালানির মধ্যে তফাত এই যে জ্বালানিতে শক্তি নির্গমনের হার কম আর বোমা মানেই বিস্ফোরণ, অর্থাৎ একসঙ্গে সমস্ত শক্তিটা বার হওয়া। শিকাগোর অ্যাটমিক পাইলে যে-পরীক্ষা সফল হয়েছিল তাতে শুধু এইটুকু বোঝা গেল যে নিউট্রনদের গতি ও সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ক'রে এক বিপুল শক্তির উৎস মানুষের আয়ত্তের মধ্যে আনা যেতে পারে। কিন্তু বোমা তৈরি করতে হলে এমন উপায় বার করতে হবে যাতে একসঙ্গে সমস্ত অ্যাটমগুলির কেন্দ্রকে প্রচণ্ড বেগে বিভাজন ঘটে—সোজা কথায় অনিয়ন্ত্রিত হারে চক্রবৃদ্ধি-বিক্রিয়া। তখনকার মত ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন বাদ দিয়ে এই বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ধারণাকে কি ক'রে সত্যিকার রূপ দেওয়া যেতে পারে সেই চিন্তায় লস আলামসের কর্মীরা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন।

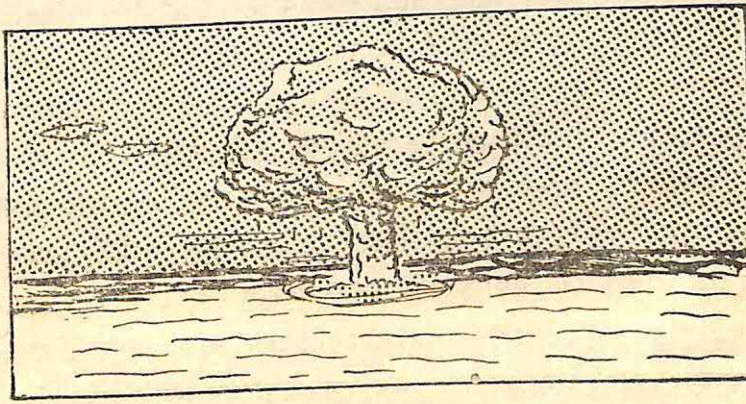
কাজটি মোটেই সহজ ছিল না। প্রথম কথা, বিভাজনকারী নিউট্রনটিকে আসতে হবে বিষম বেগে—তার গতি হওয়া দরকার সেকেণ্ডে দশ হাজার মাইল। বোমার জন্য যে পরিমাণ প্লুটোনিয়ম চাই তা তৈরি করাও এক প্রাণান্তকর প্রয়াস। এর আগে এই দুটি মৌল তৈরি করা গেছে বটে কিন্তু তা এতই অল্প পরিমাণে যে ধর্তব্যের

মধ্যে না আনলেও চলে। কিন্তু কৌশল যখন জানা আছে তখন চিন্তা কি—আরম্ভ হলো অ্যাটম বোমার জন্য প্রচুর প্লুটোনিয়ম ও ইউরেনিয়ম-২৩৫ উৎপন্ন করার দুরূহ চেষ্টা। একথা ভুললে চলবে না যে এটি সাধারণ কোনো এক্‌সপেরিমেণ্টের চেয়ে হাজার গুণ ভয়ের কাজ। তেজস্ক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণে একটু এদিক ওদিক হলেই ঘটবে বিস্ফোরণ। প্রতি মুহূর্তে সমস্ত কর্মীদের প্রাণ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা। অবশ্য অত্যধিক তেজস্ক্রিয় বস্তুগুলি হাত দিয়ে নাড়াচাড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কংক্রীটের মোটা দেওয়ালের পিছন থেকে যন্ত্রের সাহায্যে অতি সাবধানে সেগুলি নাড়াচাড়া করা হতো।

পরমাণু বোমা তৈরির সেই ঐতিহাসিক কাহিনী সংক্ষেপ করে উপসংহারে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, যে-কাজ করতে মানুষের অনায়াসে পঞ্চাশ বছর লেগে যাওয়ার কথা মহাযুদ্ধের সেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তা সম্পন্ন হলো মাত্র কয়েক বছরে। মানুষের বুদ্ধির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন উনিশশো চল্লিশ দশকের পরমাণু-বিজ্ঞানীরা।

সাধারণ লোকের কাছে পরমাণুর শক্তির প্রথম প্রকাশ ঘটল অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে—১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে জাপানে দুটি অ্যাটম বোমা ফাটবার পর। গত মহাযুদ্ধে সাধারণ বোমার সঙ্গে পরিচয় অনেক দেশের লোকেরই হয়েছে। কলকাতাতেও কয়েকটা ছোট্ট বোমা পড়েছিল (যার নাম অ্যান্টি-পারসোনেল বম), তাতে একটি লোক মারা গিয়েছিল, অন্য সম্পত্তির বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি। তার চেয়ে বহু গুণে অনিষ্টকর বোমায় ইংলণ্ড ও ইউরোপের নানা দেশ যে কতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু পরমাণু বোমা সাধারণ বোমার চেয়েও ঢের বেশী অনিষ্টকর, এখনো এর নাম শুনলে সারা পৃথিবীতে ভয়ের শিহরণ জাগে। পরমাণু বোমার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা সংক্ষেপে বলতে গেলে দুভাবে প্রকাশ পায়। একটি, বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, অন্যটি পরে। একটি বড় রাসায়নিক বোমায় থাকে প্রায় ২০০০ টন ডিনামাইট। একটি ছোট

সাইজের পরমাণু বোমার ক্ষতি করার ক্ষমতা প্রায় ২০,০০০ টন ডিনামাইটের সমান। অ্যাটম বোমা ফাটার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড উত্তাপে কাছাকাছি সমস্ত বস্তু গলে গিয়ে গ্যাসে পরিণত হয়। এই তাপের মাত্রা প্রায় এক কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। তাপের সঙ্গে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড চাপ—সে চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের হাজার গুণ। এই চাপের ফলে যাবতীয় গ্যাসীয় পদার্থ তিরিশ-চল্লিশ মাইল উপরে উঠে যায়, তারপর চাপ কমে এলে আস্তে আস্তে নিচে নামতে থাকে। এই সব জিনিসটা তখন দেখতে হয় একটি বিরাট ব্যাঙের ছাতার মত। পরমাণু বোমার সঙ্গে ব্যাঙের ছাতার মত দেখতে ছবির এই হলো আসল সম্পর্ক। আজকাল প্রায়ই শোনা যায় যে মাশরুম-ক্লাউড বা ছত্রাকার-মেঘ নাকি এ যুগের অমঙ্গলের প্রতীক। এই প্রতীকটি হলো পরমাণুর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার হুবহু প্রতিচ্ছবি। বোমা পড়ে যে জায়গাটা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায় সেখানে পরে আকাশ থেকে তেজস্ক্রিয় ভস্মবৃষ্টি হলে ঐরকই দেখতে হয়। তবে ব্যাঙের ছাতার আকৃতি বলে এই মেঘ মোটেই হেলাফেলার বস্তু নয়। বড় পরমাণু বোমা, যাকে বলে মেগাটন বোমা, ফাটলে তার ছাতাটির ব্যাস পঞ্চাশ-ষাট মাইল পর্যন্ত হতে পারে।



ছত্রাকার মেঘ.

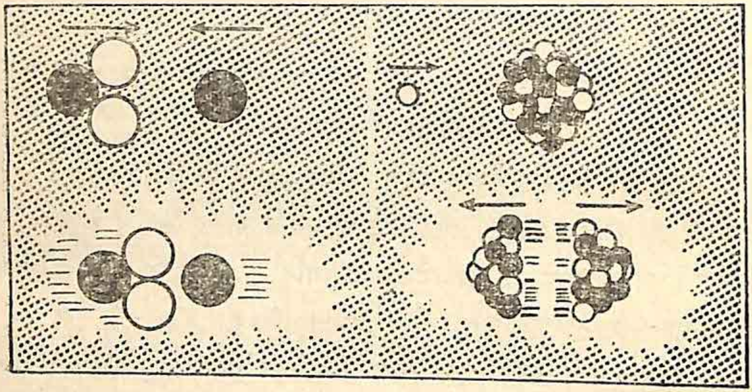
পরমাণু বোমা ফাটলে ঘটনাস্থলে মুহূর্তের মধ্যে প্রলয় কাণ্ড হয়ে বাড়ী-ঘর, রাস্তাঘাট, শহর-গ্রাম ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন তো হবেই। যদি এমন কোনো বন্দরে ফাটানো হয়, যেখানে অসংখ্য জাহাজ নোঙর বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তাহলে প্রবল ধাক্কায় কাছি ছিঁড়ে জাহাজগুলি আশেপাশের বাড়ীগুলির মাথায় গিয়ে পৌঁছন কিছু বিচিত্র নয়। এসব হলো পরমাণু বোমার প্রত্যক্ষ ফলাফল। এই মারাত্মক অস্ত্রটির আরো ভয়াবহ একটি দিক আছে যেটা সাধারণ বোমার নেই। পরমাণু বোমা ফাটার পর বহুদিন ধরে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে তিলে তিলে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। বড় কষ্টকর ও শোচনীয় সে মৃত্যু। ঠিক ঘটনাস্থলে না থাকলেও এই রশ্মির হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় নেই। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে আমেরিকানরা বিকিনি দ্বীপপুঞ্জে একটি পরমাণু বোমা ফাটায়। বিকিনির এই তেজস্ক্রিয় ভস্ম বৃষ্টির জলের সঙ্গে অনেক দূর দূর দেশে এমনকি কলকাতাতেও পড়েছিল। তখনও লোকে পরমাণুর রকমসকমে ঠিক ধাতস্থ হয়ে ওঠে নি। তাই অনেকে ভয় পেয়ে বলতে লাগলেন তরি-তরকারি ফলমূল সবেতেই জলের সঙ্গে ঢুকে পড়বে তেজস্ক্রিয়তা—মহা বিপদের উৎপত্তি হবে তাহলে। কেউ বললেন গাছের আম তেজস্ক্রিয় হয়ে গেছে, কেউ বা বললেন তেজস্ক্রিয় ঘাস খেয়ে গরুর দুধ হয়ে গেছে তেজস্ক্রিয়। মোটকথা তেজস্ক্রিয়তা কি, আর কি পরিমাণ মানুষের দেহে প্রবেশ ক'রে কি ধরণের অনিষ্ট করতে পারে এসব ভালো করে বুঝতে পারার আগেই মহা হৈ হৈ আরম্ভ হয়ে গেল। মনে হলো পৃথিবীতে প্রলয় হতে আর বেশী দেরী নেই।

তেজস্ক্রিয়তা অনেক ভালো কাজেও লাগান সম্ভব এবং আজকাল নানা কল্যাণকর কাজে এ এক বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু সে কথা পরে। এখন পরমাণু বোমা থেকে আরো একটা কি নতুন আবিষ্কার হলো সেটা দেখা যাক। আগেই বলা হয়েছে পরমাণু বোমা ফাটবার পর যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় সেটা অবিশ্বাস্যরকমের তীব্র—প্রায় সূর্যের ভেতরের উত্তাপের সমান।

সূর্যের ভেতরে যে প্রতিক্রিয়ায় অহর্নিশি তাপ উৎপন্ন হচ্ছে বলে জানা গেছে তাকে বলে তাপকেন্দ্রিণ-বিক্রিয়া বা ইংরাজীতে থার্মো-নিউক্লিয়ার-রিঅ্যাকশন। এতদিন পৃথিবীতে এ ধরণের বিক্রিয়া সম্ভব বলে মনে হয়নি, কেননা এর জন্য যে অপার্থিব উত্তাপ দরকার সেটা পৃথিবীতে প্রাকৃতিক অবস্থায় সৃষ্টি হয় না। পরমাণু বোমা যখন ফাটল, তখন দেখা গেল, না, তা তো নয়, এই উত্তাপ তো পৃথিবীতেই সম্ভব হলো। তাহলে ফিউসন বা সংযোজনও সম্ভব।

সংযোজন আবার কাকে বলে, একথা খুবই স্বাভাবিকভাবে মনে আসতে পারে। এতক্ষণ তো বিভাজনের কথা হচ্ছিল। কাইনেটিক থিওরি বা তাপগতি-তত্ত্বের বিধান অনুযায়ী যে-কোনো চাপ ও তাপ-মাত্রায় গ্যাস থাকলে তার অণু-পরমাণুগুলি সব সময় গতিশীল হয়। অণু-পরমাণুগুলি একটি গড় বেগে দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়ায়। গড় বেগ নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর। তাপমাত্রা কমলে বেগ কমবে, তাপ-মাত্রা বাড়লে বেগ বাড়বে। সাধারণ চাপ ও তাপমাত্রায় অণু-পরমাণু-গুলির গড় শক্তি এক ইলেকট্রন-ভোল্টের কয়েক শতাংশ হয়। তাপ বাড়তে বাড়তে কয়েক লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস তুলে দিলে গড় শক্তি বেশ কয়েক এম-ই-ভি পর্যন্ত হবে! এই অবস্থায় একটি পরমাণু আর একটি পরমাণুর সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে কেন্দ্রিণ-বিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। পরমাণুগুলির শক্তি তাপ-জনিত বলে এই ধরণের বিক্রিয়াকে তাপ-কেন্দ্রিণ-বিক্রিয়া বা থার্মো-নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন বলা হয়। হালকা মৌলের নিউক্লিয়াসগুলি তাপ কেন্দ্রিণ-বিক্রিয়ার ফলে একে অন্যের সঙ্গে জুড়ে যায়। দুটি নিউক্লিয়াস জুড়ে একটি নিউক্লিয়াস হওয়া—এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফিউসন বা সংযোজন। বিভাজনের মূল তত্ত্ব যেমন বস্তু ভেঙে তার খানিকটার শক্তিতে রূপান্তর, সংযোজনে তার বদলে হচ্ছে বস্তু জুড়ে তার খানিকটা অবলুপ্ত হয়ে শক্তিতে রূপান্তর। সূর্যের মত তাপে যদি সাধারণ বা ভারী হাইড্রোজেন রাখা যায় তাহলে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলির গতিবেগ এত বেড়ে যাবে যে তারা পরস্পরের মধ্যে আরম্ভ করে দেবে ধাক্কাধাক্কি। দুটি

নিউক্লিয়াস এই সময় জুড়ে গিয়ে একটি নতুন নিউক্লিয়াসে পরিণত হবে এবং দুটি নিউক্লিয়াসের যোগফল হবে মিলিত নিউক্লিয়াসটির কিছু বেশী। এই নষ্ট বস্তুর অংশ বদলে যাবে শক্তিতে।



ফিউসন ফিশন

তাপকেন্দ্রিণ সংযোজনের ফলে শক্তি সৃষ্টি নতুন কিছু নয়। সূর্যে এবং তারায় শক্তির উৎস এই প্রক্রিয়া। যখন সংযোজন বা বিভাজনের ব্যাপারটা জানা ছিল না তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর পদার্থবিদদের কাছে এক মহা রহস্য ছিল সূর্য-তারার শক্তির উৎস। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যে সব তারা আলো বিকিরণ করে আসছে সে-আলো আসছে কোথা থেকে এই চিন্তায় তাঁরা চিন্তিত ছিলেন। কোনো জানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তো এমন সম্ভব নয়। জানা প্রক্রিয়াতে যে-সব শক্তি উৎপাদনের উপায় আছে তাতে তো পুড়তে পুড়তে তারাদের দেহ ক্ষয়ে ছোট হয়ে ক্রমে বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কই সূর্য বা তারাদের তো ছোট হয়ে আসার বা আলো নিভে যাওয়ার কোনো লক্ষণই নেই। উনবিংশ শতাব্দীর দুই নামজাদা বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন আর ফন হেলম্‌হোলৎস হিসেবপত্র ক'রে বার করেছিলেন যে নিজের মহাকর্ষের টানে সূর্যদেহ ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে এবং এই মহাকর্ষজনিত শক্তিই রূপান্তরিত হচ্ছে তাপে। তারপর তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার

হলো। আবিষ্কার হলো পরমাণুর ভেতরের প্রচণ্ড শক্তির উৎস। তারপরই বোঝা গেল সূর্যের শক্তি উৎপাদনের রহস্যটি পরমাণুরই খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। সংযোজনের ফলে হাইড্রোজেন বদলে হয়ে যাচ্ছে হিলিয়ম এবং এই প্রক্রিয়ায় যে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হচ্ছে তার ফলে সম্ভব হচ্ছে আরো সংযোজন। এইভাবেই চলে এসেছে কোটি কোটি বছর। এর ফলে অবলুপ্ত বস্তুর পরিমাণ নেহাতই নগণ্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে সংযোজন কখন হয়। পরমাণু পরমাণুতে ধাক্কা লাগলেই কি ফিউসন হয়? উত্তরে বলতে হয় না তা হয়, না। সব পরমাণুতেই ফিউসন হয় না এবং সব অবস্থাতে হয় না। এর জন্য চাই একটা বিশেষ অবস্থা এবং বিশেষ অ্যাটম—ঠিক যেমন দরকার বিভাজনের সময়। সব সময় প্রকৃতিতে ফিউসন না ঘটার প্রধান কারণ হলো যথেষ্ট পরিমাণে উত্তাপের অভাব। প্রচণ্ড গরম ও মাঝা-মাঝি ধরণের গরম দুটি অ্যাটমে যদি ধাক্কা লাগে তাহলে তাপ বণ্টন হয়ে গিয়ে সব পরমাণুগুলিরই শক্তি এত কমে যাবে যে তাদের মধ্যে আর সংযোজন ঘটার সামর্থ্য থাকবে না। আগেই বলা হয়েছে সংযোজনের প্রথম ও প্রধান চাহিদা হলো উত্তাপ, প্রচণ্ড রকমের উত্তাপ। দুটি ডয়টেরিয়ম পরমাণুর মধ্যে সংযোজন ঘটাতে চাই সূর্যের ভেতরের তাপ—অন্তত দশ লক্ষ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

মৌলগুলির মধ্যে হাইড্রোজেন সংযোজন ঘটাবার জন্য প্রশস্ত। সূর্যের দেহে এই হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসেই সংযোজন ঘটছে। হাইড্রোজেন পরমাণু আছে তিন রকমের, কিম্বা আরো ঠিক করে বলতে গেলে তিন রকম অ্যাটম-ভারের। সাধারণ হাইড্রোজেনের অ্যাটম-ভার ১। ভারী হাইড্রোজেন ডয়টেবিয়ম হলো ২ অ্যাটম-ভার বিশিষ্ট। এ ছাড়া আছে আর একটি তৃতীয় প্রকারের হাইড্রোজেন অ্যাটম, এর নাম ট্রিটিয়ম, অ্যাটম-ভার ৩। এটি তেজস্ক্রিয় কিন্তু পৃথিবীতে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকেনা তৈরি করে নিতে হয়।

সমুদ্রের জলে অপর্যাপ্ত পরিমাণে সাধারণ ও ভারী হাইড্রোজেন

আছে। এজন্য সমুদ্রকে বলা হয়ে থাকে আমাদের সর্বোত্তম শক্তি-উৎস। কথাটার মধ্যে অতিরঞ্জন কিছু নেই। যদি সমুদ্র থেকে ডয়টেরিয়ম নিষ্কাষণের কোনো সহজ ও সুলভ উপায় বার করা যায় তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বহু লক্ষ বছর বেশ হেসে-খেলে কাটিয়ে দিতে পারে। হাইড্রোজেন থেকে বিদ্যুৎ তৈরির সেই সম্ভাবনার কথা পরে অনেক বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ফিউসন-প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি ফিশন-প্রক্রিয়ার চেয়ে হাজার গুণ বেশী। এই তথ্যটি বিজ্ঞানীরা সর্বসাধারণের গোচরে আনার পর যা হবার তাই হলো। অর্থাৎ যুদ্ধবিদরা চাইলেন এটাকে পরমাণু বোমার চাইতেও শক্তিশালী বোমার কাজে লাগাতে। পরীক্ষামূলকভাবে এই বোমা প্রথম ফাটালেন মার্কিনরা ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। এর শক্তি ছিল ৫০ লক্ষ টন ডিনামাইটের সমান। রুশরাও এই বোমা ফাটাতে দেরী করেন নি — তাঁরা বিস্ফোরণ ঘটান ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে। এর শক্তি ছিল ১০ লক্ষ টন ডিনামাইটের সমান। হাইড্রোজেন পরমাণুকে বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে এর নাম হাইড্রোজেন বোমা। তবে মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে শক্তিশালী দেশগুলি এই সব বোমা ফাটানো থেকে আপাতত নিরস্ত হয়েছেন। চীনারাও হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণে সাফল্য লাভ করেছেন।

যদি অ্যাটম বোমা পড়ে

অ্যাটম বোমা ক'রকম

চলতি ভাষায় আমরা যাকে অ্যাটম বোমা বলি তাদের সবগুলোই কিন্তু এক রকমের নয়। এদের মধ্যে বেশ বড় রকমের প্রভেদ আছে। যেমন সাধারণ অ্যাটম বোমা হলো গিয়ে ফিশন বোমা। ফিশন যে প্রক্রিয়া, হাইড্রোজেন বোমার ক্ষেত্রে সে-প্রক্রিয়া কিন্তু কার্যকর নয়। আমরা সকলেই জানি হাইড্রোজেন বোমার ভয়ঙ্করতা পরমাণু বোমার থেকে অনেক বেশী। এ হলো ফিউসন-প্রক্রিয়ায় উদ্ভুত। ফিশন হল একটি নিউক্লিয়াস ভেঙে দু টুকরো হওয়া এবং ফিউসন হল ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ দুটি নিউক্লিয়াস জুড়ে এক হওয়া, উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু খানিকটা করে উদ্বৃত্ত বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ফিশন বোমা ও ফিউসন বোমার পরে তৃতীয় রকমের যে বোমা ভয়ঙ্করতায় সে সকলকে ছাড়িয়ে যায়, এর নাম ফিশন-ফিউসন-ফিশন বোমা।

ফিশন বোমা

ফিশন বোমা কিন্তু যে-কোনো মৌলের পরমাণু দিয়ে বানানো যায় না। এর জন্যে বিশেষ রকম মশলা চাই যাতে ফিশন হতে পারে। জাপানে যে দুটি বোমা ফেলা হয়েছিল তার একটিতে ছিল ৬০ কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়ম। তার মধ্যে সৌভাগ্যবশতঃ মাত্র ২ কিলোতে ফিশন হয়েছিল। অবশ্য পরে আরো কার্যকর বোমা তৈরি করা গেছে যাতে ব্যবহৃত মশলার আরো অনেক বেশী অংশেই ফিশন হয়। যেসব মশলাকে ফিসাইল অর্থাৎ বিভাজনক্ষম বলা হয় তাদের মধ্যে আছে ইউরেনিয়ম-২৩৫, ইউরেনিয়ম-২৩৩ ও

প্লুটোনিয়ম-২৩৯। স্বাভাবিক ইউরেনিয়মে কিন্তু বোমা হওয়া শক্ত, কেননা এর থেকে শক্তি নির্গমন যে রেটে হবে তা বোমা আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

ফিউসন বোমা

ফিউসন প্রক্রিয়া চালু করার জন্য চাই প্রচণ্ড উত্তাপ—তাপমাত্রা কয়েক লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফিশন বোমা ফাটার সময় বিস্ফোরণের কেন্দ্রে ঐ রকমের তাপ এবং প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে দশকোটি টন চাপ সৃষ্টি হয়। তাই একটি ফিশন বোমার মশলার চারপাশে ফিউসনের উপযোগী হাল্কা মৌল—যেমন ডয়টেরিয়ম, ট্রিটিয়ম বা লিথিয়মের আস্তরণ দিলে, ফিশন বোমা বিস্ফোরদণর সঙ্গে সঙ্গে তাপকেন্দ্রিণ বিক্রিয়া দ্বারা ফিউসন শুরু হবে এবং যেহেতু সমস্ত প্রক্রিয়াটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘটছে, ঐ হালকা মৌলের আস্তরণটি বোমার মত ফেটে পড়বে। প্রথম হাইড্রোজেন বোমা ফাটার অনেক আগে থেকেই জানা গিয়েছিল যে এ ধরণের বোমা ফিশন বোমার থেকে অন্তত হাজার গুণ বেশী শক্তিশালী হবে। পরে কার্যক্ষেত্রে তা প্রমাণিত হয়েছে। ফিশন বোমার কাজ ফিউসন ট্রিগার করা—ধ্বংসকারী ক্ষমতা ফিউসন থেকেই আসে।

ফিশন-ফিউসন-ফিশন বোমা

এ বোমা সব থেকে শক্তিশালী ও মারাত্মক বলে মনে করা হয়। নাম থেকেই গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে আন্দাজ করা যায়। প্রথমে ফিশন বোমা ফেটে ফিউসন হওয়ার উপযোগী তাপ সৃষ্টি করবে এবং ফিউসন বোমা ফাটবে। তারও বাইরে ইউরেনিয়ম-২৩৮এর একটি আস্তরণ যদি দেওয়া থাকে তবে ফিউসনের সময় যে সমস্ত নিউট্রন বেরোয় তা দিয়ে আর একদফা ফিশন হবে। ফিশন-ফিউসন-ফিশন বোমার ধ্বংস করার ক্ষমতা ১-৫ কোটি টন বা ১০-৫০ মেগাটন ডিনামাইটের সমান। এক মেগাটন হলো দশলক্ষ টনের সমান।

ডিনামাইটের অনুপাতে বোমার বিধ্বংসী-ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের কিলোটন, মেগাটন ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। ফিশন-ফিউসন-ফিশন বোমার শেষ পর্যায়ের ফিশন থেকে তেজস্ক্রিয় ভস্ম অনেক বেশী হয় এবং বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

কোবাল্ট বোমা

উপরে লিখিত তিনরকম বোমা ছাড়াও মাঝে মাঝে শোনা যায় কোবাল্ট বোমার কথা। কোবাল্ট বোমা আর কিছুই নয় একটি হাইড্রোজেন বোমা যার খোলটি গড়া হয়েছে কোবাল্ট দিয়ে। বিস্ফোরণের ফলে এই খোল বাষ্পীভূত হয়ে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে যাবে এবং যেখানেই তা তেজস্ক্রিয় ভস্ম রূপে পড়বে সেখানেই নিয়ে যাবে মৃত্যুর পরোয়ানা। তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের অর্ধায়ু ৫·৩ বছর। তার মানে বোমা ফাটার পর অনেকদিন পর্যন্ত তা থেকে গামা রশ্মি বেরোতে থাকবে। বোমার খোল যদি অ্যালুমিনিয়ম বা অন্য কোন হালকা ধাতুর তৈরি হয় তবে সে হাইড্রোজেন বোমার দীর্ঘস্থায়ী কুফল বিশেষ কিছুই থাকে না। এইগুলিকে ক্লীন বম্‌ বা নির্মল বোমা বলে একসময় বৃহৎ-শক্তিরা নিজেদের বিবেক শুদ্ধ রেখেছিলেন। হাইড্রোজেন বোমাকে যদি নির্মল বলা সঙ্গত হয় তবে কোবাল্ট বোমা হবে অতিশয় দূষিত বোমা।

পরমাণু বোমার জাতিভেদের পরে আসছে এর বিস্ফোরণের স্থানভেদ। মধুকৈটভের মত স্থল, জল, অন্তরীক্ষ সর্বত্রই পারমাণবিক বিস্ফোরণের লীলাভূমি—তবে কোথায় ফাটানো হচ্ছে তার উপর বহুলাংশে বোমার কার্যকারিতা নির্ভর করে। চার রকম জায়গায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ হতে পারে। আকাশে, মাটিতে, মাটির নিচে ও জলের তলায়।

কোন্‌টিতে কি হয়?

মাটিতে বা মাটির সামান্য উপরে ইউরেনিয়ম বা প্লুটোনিয়ম বোমা

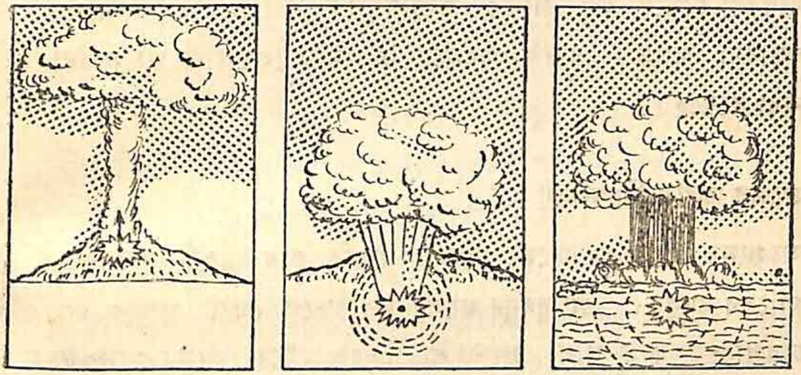
বিস্ফোরণ হলে কি হয় দেখা যাক। বিস্ফোরণ ঘটে এক সেকেণ্ডের কয়েক লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ে। সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে, মানে একেবারে বিস্ফোরণের কেন্দ্রবিন্দুতে, তাপ চড়াৎ করে চড়ে যায় দশ লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াসের সমান। ফলে আশেপাশে যে কি প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয় তা অনুমান করতে গেলে আমাদের কল্পনা হার মেনে যাবে। ঐ তাপে বোমার আবরণ এবং ভিতরের বিস্ফোরক দ্রব্য একেবারে গ্যাস হয়ে যায় এবং তার থেকে বার হতে থাকে তাপ বিকিরণ। গ্যাসগুলি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের আকার নেয়। ক্রমেই এই আগুনের গোলা আকারে বাড়তে থাকে।

আকাশে বিস্ফোরণ

২০ কিলোটনের বোমা যদি মাটি থেকে ২০০০ ফুট উপরে ফাটানো হয় তখন অগ্নিপিণ্ডের ঝলক ১০০ মাইল দূর থেকে দেখতে পাওয়া সম্ভব। বোমা ফাটার ০·০১৫ সেকেণ্ড পরে আগুনের গোলা ৬০০ ফুট থেকে বাড়তে বাড়তে এক সেকেণ্ড পরে হবে ৯০০ ফুট ব্যাসের। সঙ্গে সঙ্গে শব্দের থেকে দ্রুততর বেগে সংকোচন তরঙ্গ চলতে থাকে। চারপাশ থেকে ধূলো ও বস্তুকণা উপরে উঠে যায়। অগ্নিপিণ্ড ঠাণ্ডা ও ছোট হয়ে আসার পর ঊর্ধ্বাকাশে ব্যাঙের ছাতার মত মেঘ আকার নিতে থাকে। আট-দশ মিনিটের মধ্যে এই মেঘ প্রায় চল্লিশ হাজার ফুট উপরে উঠে ট্রপোপজে পৌঁছে যায়।

মেগাটন বোমার বিস্ফোরণ হলে এই মেঘ অনেক সময় ১০,০০০ ফুট বা আরো উঁচুতে উঠতে পারে। উঠতে উঠতে শেষে এমন অবস্থায় পৌঁছবে যেখানে ঐ মেঘের ঘনত্ব আশেপাশের ঘনত্বের সঙ্গে সমান। তখন সেটি আর না উঠে ঐখানেই ছড়িয়ে পড়বে এবং তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি ওখানেই বহু বছর থেকে ধীরে ধীরে ক্ষয় পেতে থাকবে। অবশ্য এই মেঘ থেকেও আশঙ্কার কথা আছে। ঐ তেজস্ক্রিয় মেঘকণিকা নিচে নেমে বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে মাটিতে পড়তে পারে এবং হাওয়ার দ্বারা বাহিত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এইভাবে মেগাটন বোমা থেকে পৃথিবীব্যাপী তেজস্ক্রিয় ভস্মপাতের আশঙ্কা। কিন্তু কিলোটন বোমার ক্ষেত্রে এই ফলআউট হবে একান্তই স্থানীয়।



আকাশে মাটিতে জলের নিচে

আকাশে বিস্ফোরণ হলে আগুনের গোলাটি থাকে মাটির সঙ্গে সংস্পর্শহীন। তাতে কী হয় ? তাতে কেবলমাত্র বোমার মশলাগুলি রেণু রেণু হয়ে বা গ্যাসীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে — তার মধ্যে ধুলো, বালি, মাটি বা অন্যান্য পদার্থের গুঁড়ো থাকতে পারে না। কিন্তু মাটিতে ফাটলে প্রচুর পরিমাণে ধুলোবালি তেজস্ক্রিয় হয়ে প্রথমে উপরে উঠে পরে চারপাশে পড়তে থাকে। সুতরাং তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ এক্ষেত্রে ঢের বেশি, যদিও তা অল্পকালের মধ্যে ক্ষয় পায়।

মাটির নিচে বিস্ফোরণ

যদি মাটির ৫০ ফুট নিচে একটি ২০ কিলোটনের পরমাণু বোমা ফাটানো হয় এবং সে জমি যদি পাথুরে না হয় তবে তাতে ৬০০ ফুট চওড়া এবং ৭০ ফুট গভীর একটি গর্ত হয়ে যাবে। উত্তপ্ত গ্যাস জমি ফুঁড়ে সিলিণ্ডারের আকারে বাইরে বেরিয়ে আসবে — তবে প্রাথমিক তাপ বিকিরণ অনেকেটাই শুষে যাবে মাটিতে, অল্প

পরিমাণ বাইরে আসবে। সুতরাং অকুস্থলের কাছাকাছি ছাড়া ক্ষতির পরিমাণ তত বেশি হবে না। এ-ধরনের বিস্ফোরণ মাটির নিচে সম্পূর্ণ চাপা রাখা যায়। এ নিয়ে নানান দেশে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং অনেক কল্যাণমূলক কাজে এর প্রয়োগের সম্ভাবনা আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

জলের তলায় বিস্ফোরণ

আগুনের গোলার বদলে এক্ষেত্রে তৈরি হবে একটি বৃহদাকার গ্যাসের বুদ্‌বুদ। এই বুদ্‌বুদ জলের উপরিতলে ফেটে পড়বে এবং চারপাশের ছুটে-আসা জলরাশি উপরে উঠে গিয়ে অনেকটা ফুলকপির আকারে ফেঁপে উঠবে। এভাবে প্রায় দশ লক্ষ টন জল উপরে উঠে যেতে পারে এবং জলস্তম্ভের উচ্চতা ৩০০০ থেকে ৮০০০ ফুট হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। জলের নিচে ও উপরতলে যে স্রোত উৎপন্ন হবে তাতে জাহাজ ও বন্দরের ক্ষতি হতে পারে। তবে বিকিরণ জলের মধ্যে হয়ে যাওয়ার ফলে উপরে বেশি আসার সুযোগ পাবে না।

যে-কোনো পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে সবচেয়ে বেশি কাজ পেতে হলে মাটি থেকে ২০০০ ফুট উপরে বোমাটি ফাটানোই প্রশস্ত। বিভিন্ন রকম পরীক্ষা ক'রে এটাই দেখা গেছে। হিরোশিমাতেও তাই করা হয়েছিল।

হিরোশিমাতে কী হয়েছিল ?

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে ৬ আগস্ট সকাল সওয়া আটটায় হিরোশিমাতে যে যার কাজে বেরিয়ে পড়েছে। ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগেই একবার সাইরেন বেজেছিল, তারপর যথারীতি অলক্লিয়ার সংকেত দেওয়া হয়ে গেছে এবং স্কুলের ছেলেমেয়েরা থেকে শুরু করে কর্মী, শ্রমিক প্রায় সকলেই আবার পথে বেরিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ

বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো ঘটল বিস্ফোরণ। কেউই এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। অবশ্য প্রস্তুত থাকলেও যে কি লাভ হতো তা বলা মুশকিল! কিন্তু পরে সরেজমিনে তদন্ত ক'রে বিশেষজ্ঞরা রিপোর্ট দিয়েছেন যে হিরোশিমার নগরবাসীরা যদি পরমাণু বোমার হাত থেকে কি কি উপায়ে আত্মরক্ষা করা যায় এ বিষয়ে অবহিত থাকতেন তাহলে ধ্বংসের পরিমাণ কিছু কম হতে পারত। হিরোশিমার ৭৫০০০ বাড়ির মধ্যে ৫৫০০০ সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছিল। অকুস্থল থেকে ৭২০০ ফুট দূরে যেসব রিইনফোর্স´ড কংক্রিটের বাড়ি ছিল সেগুলির বাইরের দেওয়াল ততটা নষ্ট হয়নি, কিন্তু ছাদগুলি ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। বিস্ফোরণের জায়গা থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরত্বেও কাঁচের জানলার শার্সি ভেঙে চুরমার হয়েছিল, ৫০০০ ফুট পর্যন্ত দূরত্বে দোতলা বাড়ি ধুলিসাৎ হয়েছিল। সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কাঠের ফ্রেমের বাড়িগুলি।

নাগাসাকিতে ফেলা বোমা যদিও হিরোশিমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল, নাগাসাকির জমি পাহাড়ে হওয়ার ফলে এখানে ক্ষতির পরিমাণ হয়েছে সেই অনুপাতে কম। উঁচু-নিচু জমির জন্য তাপ বিকিরণ সর্বত্র সমানভাবে পৌঁছতে পারে নি। যেসব বাড়ি ছিল পাহাড়ের আড়ালে সেগুলি মোটামুটি অক্ষতই ছিল। সমস্ত বাড়ির ৭৬ শতাংশ নষ্ট হয় হিরোশিমায়, কিন্তু নাগাসাকিতে এই ক্ষতি ৩৫ শতাংশ। নিচের চার্ট থেকে দুটি শহরের ধ্বংসের তুলনামূলক একটা চিত্র পাওয়া যাবে।

	হিরোশিমা	নাগাসাকি
মৃত	৭৮,১৫০	২৩,৭৫৩
নিখোঁজ	১৩,৯৮৩	১,৯২৮
আহত	৩৭,৪২৪	২৩,৩৪৫
অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত	২৩৫,৬৫৬	৮৯,০২৫

বিস্ফোরণের ঠিক নিচে মাটির উপর উত্তাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩০০০ ডিগ্রী-সেলসিয়াস। সেখান থেকে পৌনে এক মাইল পর্যন্ত

অগ্নিদগ্ধ-হয়ে ও স্বাভাবিক বিকিরণে মৃত্যু ঘটেছে বহু লোকের। অবশ্য গ্যাস পাইপ ফেটে ও অন্যান্য সহজ দাহ্য বস্তুতে আগুন লেগেও বহু প্রাণ ও ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। দু'মাইল দূরে গাছপালা ও কাঠের খুঁটি ঝলসে কালো হয়ে গিয়েছিল। অকুস্থলের আধ মাইলের মধ্যে একশোর মধ্যে নব্বই জন তৎক্ষণাৎ মারা যান। এই সংখ্যা দূরত্বের সঙ্গে কমেছে। যেমন এক থেকে দেড় মাইলের মধ্যে তাৎক্ষণিক মৃত্যুর হার ছিল শতকরা পঞ্চাশ।

হিরোশিমার বোমা যদি কিলোটন না হয়ে মেগাটন হতো এবং ফাটানো হতো মাটি থেকে ৮০০০ ফুট উপরে তবে ৮০ বর্গমাইলের মধ্যে সমস্ত বাড়িঘর মাটির সঙ্গে মিলিয়ে যেত, ২০০ বর্গমাইলের মধ্যে যে ক্ষতি হতো তার পরিমাণও গুরুতর, এমনকি ১০০০ বর্গমাইলেও এর প্রভাব অনুভব করা যেতে পারত। অর্থাৎ এ-রকম একটি বোমায় পৃথিবীর বৃহত্তম শহরও নিমেষে বিলুপ্ত হতে পারে।

পরমাণু বোমার আসল ভয়টা কোথায়

গত মহাযুদ্ধে পরমাণু বোমা বাদ দিয়ে যত বোমা ফাটানো হয়েছে তাতেও ধন-প্রাণ কম বিনষ্ট হয়নি। এই সমস্ত ক্ষতির পরিমাণ যাঁরা হিসেব ক'রে দেখেছেন তাঁরা বলেন একমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বোমার আকারে যত শক্তি খরচ হয়েছে তা ইতিহাসে যত যুদ্ধ ঘটে গেছে তাতে ব্যবহৃত সমস্ত বিস্ফোরণজনিত শক্তি একত্র করে যা হয় তার থেকেও বেশি। গত যুদ্ধে কেবলমাত্র জার্মানীর উপরেই বর্ষিত হয়েছে ১৩ লক্ষ টন বোমা, যদি শুধু বোমার ওজনের দিকটা ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়। এবং সব মিলিয়ে ফেলা হয়েছে (ঐ দু বছরে) পঞ্চাশ লক্ষ টন বিস্ফোরক। সে তুলনায় হিরোশিমা-নাগাসাকির বোমা ছিল মাত্র ২০০০০ টন রাসায়নিক বিস্ফোরকের সমান। সেটা এমন কিছু বেশি কি? যদিও মানুষ মারা এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করাই বোমা বর্ষণের মুখ্য উদ্দেশ্য, তবু পরমাণু বোমার

এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য এর নাম শুনলেই আঁৎকে উঠতে হয়।

সাধারণ বোমা পড়ার সময় যেমন ট্রেঞ্চের গর্তে খানিকক্ষণের জন্য ঢুকে পড়লেই নিশ্চিন্ত—তারপর অবস্থা শান্ত হলে হাত-পা ঝেড়ে উঠে এলেই হয়—পরমাণু বোমার বেলায় কিন্তু তা হচ্ছে না। রাসায়নিক বোমা একবার পড়লেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পরমাণু বোমা পিছনে রেখে যাচ্ছে তার লক্ষ লক্ষ অনুচর, যাদের বৈজ্ঞানিক নাম তেজস্ক্রিয়তা। এই তেজস্ক্রিয়তা আছে দুই জাতের। অকুস্থলে যে তেজস্ক্রিয়তার জন্ম হয় তার কিছুটা স্বল্পায়ু, কিছুটা দীর্ঘায়ু। স্বল্পায়ু তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু দীর্ঘায়ু তেজস্ক্রিয়তা বহুকাল ধরে ক্ষতিকর রশ্মি বিকিরণ করতে থাকে। বোমা বিস্ফোরণের পরে তাপ আর চাপে আশেপাশের যাবতীয় বস্তু গ্যাসের আকারে অনেক উপরে উঠে যায় সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এগুলি অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে আস্তে আস্তে নিচে নামতে থাকে। বৃষ্টির জলের সঙ্গে এগুলি অনেক দূর দূর দেশেও বাহিত হয়ে থাকে। অনেকের মনে থাকতে পারে ১৯৫৪ সালে বিকিনি দ্বীপপুঞ্জে পরীক্ষামূলকভাবে ফাটানো ফিশন-ফিউসন-ফিশন বোমার বিস্ফোরণের কথা। একটি জাপানী জেলে-জাহাজ না জেনে সেই তেজস্ক্রিয় ভস্মবৃষ্টির মধ্যে পড়েছিল। ভস্মে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ এত বেশি ছিল যে তেইশ জন জেলের মধ্যে একজন মারা পড়ে ও বাকি সকলেই গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়। বিকিনির এই তেজস্ক্রিয় ভস্ম বৃষ্টির জলের সঙ্গে অনেক দূরে চলে এসেছিল। দমদমে আগত প্লেনগুলির ডানায় এই তেজস্ক্রিয়তার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউটের কয়েকজন বিজ্ঞানী এই পরীক্ষা করেছিলেন।

অতঃপর কি কর্তব্য

পৃথিবীতে অনিষ্টকর কাজে ব্যবহারের জন্য জাপানে ফেলা বোমা

দুটিই যে প্রথম ও শেষ বোমা একথা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। কিন্তু তবু সাবধানের মার নেই। না জেনে সেই জাপানী জেলেদের মত ভয়ঙ্কর মৃত্যু নিশ্চয় কারো কাম্য নয়। আমাদের মাথায় একদিন পরমাণু বোমা ফাটতে পারে অন্তত ফাটার সম্ভাবনা আছে যুক্তির খাতিরে এরকম ধরে নিয়ে আমাদের কর্তব্য হবে এর হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায়গুলি বিবেচনা ক'রে দেখা।

স্বল্পায়ু তেজস্ক্রিয়তার হাত থেকে বাঁচতে গেলে আপনাকে বেশ কিছুদিন দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে বা আরো নিরাপদ থাকার জন্য মাটির তলায় বসবাস করতে হবে। একথা না বললেও চলে যে তার জন্য রসদ সংগ্রহ ক'রে রাখাও একান্ত প্রয়োজনীয়। খাদ্যদ্রব্য ও জলের যথেষ্ট সঞ্চয় যেন সেই মাটির তলার ঘরটিতে মজুদ ক'রে রাখা থাকে। সবদিক বিবেচনা ক'রে এমন খাবার রাখুন যেগুলি প্রস্তুত করতে বিশেষ হাঙ্গামা নেই। এর জন্য টিনের খাদ্যই প্রশস্ত। জলের কথাটা বিশেষভাবে স্মরণ রাখবেন। কেননা পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ফলে বাইরের (খোলা জায়গার) সমস্ত জল তেজস্ক্রিয় হয়ে যাবার বিশেষ আশঙ্কা এবং তেজস্ক্রিয়তা এমনই জিনিস যে জল ফোটালেও তা দূর হবার নয়। সেজন্যে দুর্ঘটনার আগে থেকেই যে জল বড় বড় মাটির জালায় ঐ গোপন কুঠরিতে রাখা থাকবে সেটা নির্ভয়ে পান করা যেতে পারে।

যদি অনিবার্য কারণে আপনাকে বাইরে আসতেই হয় তবে বেশি জামাকাপড় পরে আসবেন এবং পারতপক্ষে খোলা মাথায় আসবেন না। কেননা তেজস্ক্রিয়তার আক্রমণে জামাকাপড় অনেকটা বর্মের কাজ করবে। চুল বা নখের ডগা তেজস্ক্রিয়তা লুকিয়ে থাকার পক্ষে অতি উত্তম স্থান। এজন্য এগুলি বাঁচানো দরকার। দস্তানা পরলে আর চিন্তার কিছু থাকে না। বাড়িতে ঢোকার আগে জামাকাপড়, জুতো, মোজা, টুপি ছেড়ে হাত পা মুখ ধুয়ে ভেতরে প্রবেশ করবেন। তেজস্ক্রিয়তা লাগা পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি একেবারে

পুড়িয়ে ফেলাই সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ আছে কি নেই ধরা যায় গাইগার গণকের সাহায্যে।

কয়েকদিন পরেই ঘটনাস্থল তেজস্ক্রিয় ভস্মমুক্ত বলে সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হবে—তখন আপনি নির্ভয়ে বাইরে আসতে পারেন।

জেনে রাখবেন

বিস্ফোরণের প্রথম পর্যায়ে যে তাপ বিকিরণ হয় তার প্রভাব সব জিনিসে এক রকম নয়। যেমন একই ঘনত্বের তামা ও কাঠের জিনিসের মধ্যে তামার উপর ততটা প্রভাব পড়বে না, কিন্তু কাঠে আগুন ধরে যেতে পারে। কাঠের দেওয়াল সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। পালিস করা বা মসৃণ তলবিশিষ্ট জিনিসে পড়ে তাপ বিকিরণ বিচ্ছুরিত হবে কিন্তু অসম তলবিশিষ্ট জিনিস তাড়াতাড়ি গরম হয়ে উঠবে। সাদা জিনিসের চেয়ে কালো জিনিস বিকিরণ শুষে নেয়; সেজন্য জামা-কাপড় যথা সম্ভব হাল্কা বা সাদা রঙের পরাই ভাল। সেগুলি ঢিলাঢালা হওয়াই সঙ্গত, গায়ের সঙ্গে এঁটে থাকা যেন কোনোমতেই না হয়। গায়ের চামড়া দুভাবে পুড়তে পারে। সোজা-সুজি অগ্নিপিণ্ডের ঝলক থেকে, কিম্বা জ্বলন্ত জামাকাপড় থেকে। বিকিরণ যদি হয় প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে তিন ক্যালরি তাহলে বহু সহজদাহ্য জিনিসে আগুন লেগে যেতে পারে। ২-৩ ক্যালরি প্রতি সেন্টিমিটারে হলে চামড়া লাল হয়ে উঠবে, যেমন অতিরিক্ত রোদে পোড়া হলে হয়। ৫ ক্যালরি হলে গায়ে ফোস্কা পড়বে আর প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ১০ ক্যালরির বেশি হলে চামড়ার নিচের স্তর পর্যন্ত পুড়ে যাবে। কোন জিনিস কত ক্যালরি বিকিরণে পোড়ে ও কততে আগুন ধরে তার তালিকা নিচে দেওয়া হলো :

	ঝলসাবে	আগুন ধরে যাবে
	(ক্যালরি প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে)	
সুতী হাল্কা রঙের কাপড়	৪-৬	৮-১০
সুতী গাঢ় রঙের কাপড়	২-৩	৪-৬
খবরের কাগজ	৩-৪	৬-৮
শুকনো ঘাস	২-৩	৪-৬

তেজস্ক্রিয়তা থেকে কি হয়?

এরজন্য প্রথমে জানতে হবে গামা রশ্মির ডোজ, যার একক রয়েন্টগেন, সেই পরিমাণটি কতখানি। এক্স-রশ্মির ডোজও রয়েন্টগেন এককে মাপা হয়। সাধারণ ক্ষেত্রে হাত, পা ভাঙা দেখতে যে এক্স-রে ছবি তোলা হয় তাতে এক দুই রয়েন্টগেন ডোজ পড়ে। দাঁতের এক্স-রে ছবি তুলতে ৪-৫ রয়েন্টগেন ডোজ হয়। যাঁরা নিয়মিত তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের পক্ষে সপ্তাহে ১০-৩০ মিলি-রয়েন্টগেন (রয়েন্টগেনের এক হাজার ভাগ) ডোজ পর্যন্ত ক্ষতিকর নয় বলে ধরা হয়। ডোজ জানা হয়ে গেলে নিম্নলিখিত তালিকাটি অনুধাবন করা কষ্টকর হবে না।

ডোজ-রয়েন্টগেন	
০-২৫	বিশেষ কিছু কুফল নেই। রেডিয়ম ডায়েল ঘড়ির মাত্রা যেমন শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর নয়। কেরালার সমুদ্র উপকূলে মোনাজাইট বালির মধ্যে যে সব জেলেরা বংশানুক্রমে বাস ক'রে আসছে তাদের সম্বন্ধেও একই কথা।
২৫-১০০	গা গুলোনো বা বমি হতে পারে। খুব বেশি কিছু নয়। রক্তে হয়ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেও পারে।
১০০-২০০	প্রথম দিনে বমি ও ডাইরিয়া। দু'তিন সপ্তাহ পরে অক্ষিদে, ক্রমে রক্তশূন্যতা, খুব কম ক্ষেত্রেই মৃত্যু দেখা যায়। যদি হয় তবে ষষ্ঠ সপ্তাহে সম্ভব।
২০০-৪০০	প্রথম কয়েক ঘণ্টা বমি। এক সপ্তাহ বাদে নানা উপসর্গ দেখা দেবে, রক্তাল্পতা, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া, ছয় সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাবনা যদিও অনিবার্য নয়।
৪০০-৫০০	সবই অনুরূপ, কেবল মৃত্যুর সম্ভাবনা আর একটু বেশি।

৫০০-৭০০ প্রথম কয়েক ঘণ্টা বমি। কয়েক দিন পরে জ্বর, ডাইরিয়া, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেবে। ১০ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যু।

একথা জানলে হয়ত তরুণ বয়সীরা কিঞ্চিৎ সাহস পাবেন যে বিকিরণ সহ্য করার ক্ষমতা রুগ্ন ও বৃদ্ধদের চেয়ে স্বাস্থ্যকর ও অপেক্ষাকৃত কম বয়সীদের বেশি।

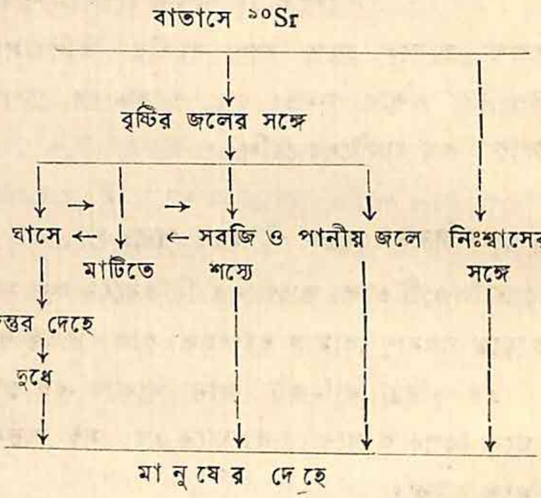
দীর্ঘায়ু তেজস্ক্রিয়তা থেকে কী হতে পারে?

আগের তালিকাটি হলো তাৎক্ষণিক বিকিরণের ফল সম্বন্ধে। আগেই বলা হয়েছে পরমাণু বোমার ভয়াবহতা হলো দীর্ঘস্থায়ী তেজস্ক্রিয়তা থেকে। এর চরিত্র খানিকটা জানা থাকলে এই সুবিধে যে কোন দিক থেকে বিপদ আসবে বোঝা যাবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের আয়ু সম্বন্ধে আগে আলোচনা করা হয়েছে। দেখা গেছে সব রকম তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু এক নয়, কেউ বেশি হারে বিকিরণ ক'রে শেষ হচ্ছে তাড়াতাড়ি, কেউ বা দীর্ঘদিন ধরে করছে বিকিরণ। শেষেরগুলি সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে, বলাই বাহুল্য।

এমনই একটি জিনিস হলো স্ট্রনসিয়ম-৯০। এর অর্ধায়ু প্রায় ২৮ বছর। কতরকমভাবে স্ট্রনসিয়ম-৯০ শরীরে ঢুকতে পারে দেখা যাক। হয়ত আমাদের দেশ থেকে বহু শত মাইল দূরে একটি পরমাণু বোমা ফাটান হলো, সেখান থেকে ধীরে ধীরে বৃষ্টির জলের সঙ্গে স্ট্রনসিয়ম-৯০ মাটিতে ও ঘাসে ঢুকে পড়ছে, ঘাস থেকে জন্তু, তাদের মাংস ও দুধের মধ্য দিয়ে আমাদের শরীরে। সরাসরি নিঃশ্বাসের সঙ্গেও আসতে পারে, হাওয়াতে যদি এর পরিমাণ বেশি হয়। তাছাড়া মাটি থেকে শাক্‌সব্‌জি, ফলের সঙ্গে আসতে পারে, খাবার জলের সঙ্গে আসতে পারে। এই স্ট্রনসিয়ম-৯০, যার সঙ্গে ক্যালসিয়মের বিশেষ মিল, মানুষের দাঁতে ও হাড়ে গিয়ে জমা হয়।

কতরকমভাবে স্ট্রনসিয়ম-৯০ শরীরে প্রবেশ করতে পারে তা নিচে দেওয়া হলো :



তবে সকলের পক্ষে স্ট্রনসিয়ম-৯০ এর প্রভাব একরকম হবে না। তা বহুলাংশে নির্ভর করবে স্বাস্থ্য, বয়স, কে কি ধরনের আহার করে ইত্যাদির উপর। সমর্থ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের থেকে বৃদ্ধ ও শিশুদের দেহে তেজস্ক্রিয়তা বেশি মাত্রায় প্রবেশ করে কারণ তাদের দেহে প্রতিরোধ করার শক্তি অপেক্ষাকৃত কম।

এইরকমভাবে তেজস্ক্রিয় সিজিয়ম-১৩৭ (যার অর্ধায়ু ৩০ বছর)-এর প্রবণতা হলো পেশীতে গিয়ে জমা হওয়া এবং এইভাবে সমস্ত মনুষ্যদেহে ছড়িয়ে পড়া। আগেই বলা হয়েছে এ-সবই ফিশন বোমার তেজস্ক্রিয়তার ফল।

কলকাতায় তেজস্ক্রিয় ভস্মবৃষ্টি

১৯৫৪ সনের মার্চ মাসের শেষ দিকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে কয়েকটি হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষামূলকভাবে ফাটানো হয়েছে এই মর্মে খবর পাওয়া যায়। বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাকে কলকাতায় সাংবাদিকরা এই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি

বলেন, তেজস্ক্রিয় ভস্মের চিহ্ন হয়ত ভারতে পাওয়া যেতে পারে। তখন তাঁর কয়েকজন ছাত্র এই নিয়ে পরীক্ষা চালাতে মনস্থ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, এ পি পাত্র, বিনায়ক বসু, মনোজ ব্যানার্জি, রঙ্গলাল ভট্টাচার্য ও ফজলে হোসেন। সাহা ইনস্টিটিউটের চারতলার ছাদ থেকে নিয়মিতভাবে ধুলো সংগ্রহ ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়, কিন্তু তাতে তেজস্ক্রিয়তার চিহ্ন পাওয়া গেল না। আগে পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণের পরে দেখা গিয়েছিল বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তর থেকে তেজস্ক্রিয় ধুলো বৃষ্টি ও তুষারপাতের সঙ্গে মাটিতে পড়ে। ১৯৫৪ সনের মার্চ ও এপ্রিলের প্রথম দিকে কলকাতায় মোটেই বৃষ্টি পড়েনি। সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয় ধুলো যদি বা এসে থাকে তা নিশ্চয় ভারতের বায়ুমণ্ডলে অনেক উঁচুতে ভেসে বেড়াচ্ছে এইরকম অনুমান করলেন বিজ্ঞানীরা। কলকাতায় আগত প্লেনের ডানা থেকে এই ধুলোর নমুনা পাওয়া যেতে পারে এইরকম চিন্তা ক'রে তাঁরা ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস কর্পোরেশনের সহযোগিতায় প্রতিদিন দমদম বিমানবন্দরে গিয়ে প্লেনের ডানা থেকে তৈলাক্ত ময়লা চেঁচে নিয়ে জমা করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়ল, যদিও তার পরিমাণ ছিল অতি সামান্য। পরে অবশ্য বৃষ্টির জলেও তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া গিয়েছিল। এই নিয়ে খবরের কাগজে কিছু হৈচৈও হয়। তবে বিজ্ঞানীদের মতে ঐ তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ এত কম যে তা থেকে জনসাধারণের স্বাস্থ্যহানির কোন আশঙ্কাই ছিল না।

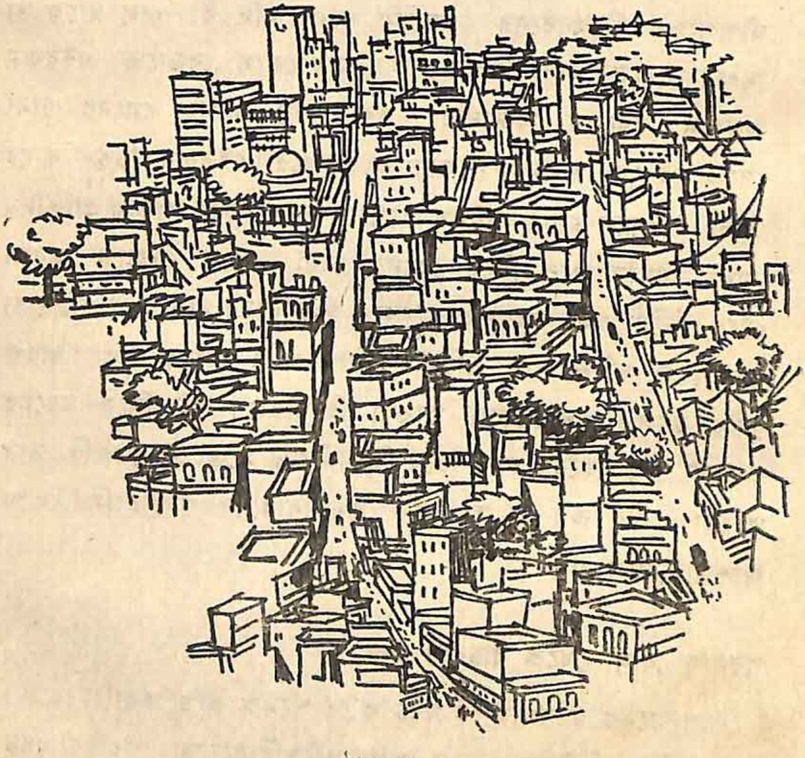
পরমাণু বোমা থেকে বাঁচবার জন্য

বিদেশে অনেক জায়গায় বহু খরচ ক'রে অনেক কাণ্ড করা হয়েছে। মাটির নিচে নিউক্লিয়ার-রেড-শেলটার তৈরি হয়েছে। করণীয় বিষয় সম্বন্ধে রেডিও ও টেলিভিসনে জনসাধারণকে প্রায়ই সতর্ক ক'রে দেওয়া হচ্ছে। যদিও উপায়গুলি সবই খরচ সাপেক্ষ তবু আমরা সেগুলি

নিয়ে এখানে কিছু আলোচনা করব। কখনও তেমন প্রয়োজন না হলেও যেমন দিনকাল পড়েছে তাতে সবই জেনে রাখা ভাল।

প্রথম কথা নতুন করে কোন শহরের প্ল্যান করতে হলে পারমাণবিক আক্রমণের কথা স্মরণ রেখে এমনভাবে করা উচিত যাতে ছোটখাট কিলোটন বোমায় তার আংশিক ক্ষতির বেশি কিছু না হয়।

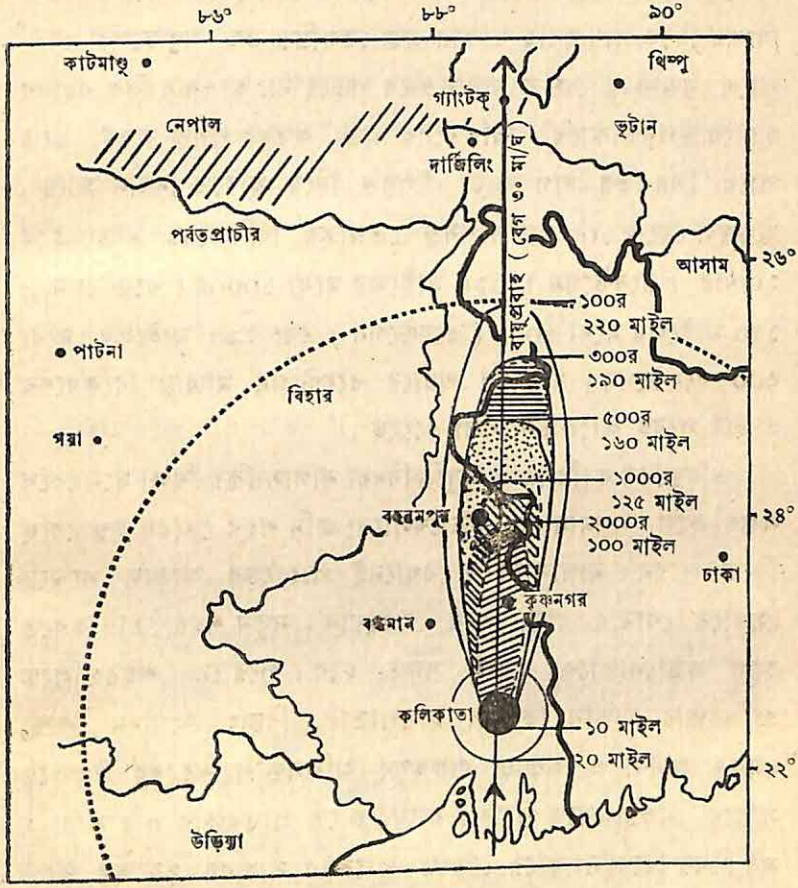
একটি সেকেলে ঘনবসতি পূর্ণ শহরের কেন্দ্রে বোমা পড়লে প্রায় সমস্ত শহরটি বিনষ্ট হবে। কিন্তু যে শহরে হাসপাতাল, দমকল, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি সব কোন একটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত নয়, সেখানে একই আকারের বোমা পড়লেও ক্ষতির পরিমাণ হবে অনেক কম। প্রসঙ্গত বলা যায় মেগাটন বোমা ব্যবহার করার আগে



ঠাসা শহর

শত্রুরাও ইতস্তত করবে, কেননা সে বোমার মারণরশ্মি কোন বিশেষ দেশে আটকে থাকবে না। কলকাতায় যদি একটি

১৫ মেগাটন বোমা পড়ে তবে তার জের কতদূর গিয়ে পড়তে পারে তা নিচের ছবি থেকেই স্পষ্ট হবে।



কলকাতায় ১৫ মেগাটন বোমা পড়লে

এইরকম একটি বোমা যেখানে পড়ছে তার দশ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে সব কিছু জ্বলে পুড়ে ছারখার হবে। তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি কোনদিকে কতদূর যাবে তা নির্ভর করবে কোনদিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে তার উপর। বোমা পড়ার পর দক্ষিণ থেকে সোজা উত্তরে বাতাস প্রবাহিত হয়েছে এইরকম ধরে নিয়ে ছবিটি আঁকা

হয়েছে। যদি বায়ু পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম বা পূর্বমুখী হয় তাহলে তেজস্ক্রিয় ভস্মের জের বিহারের এবং বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে পড়বে তাও ছবি থেকে অনুমান করা যেতে পারে। একটি বিশেষ দিকে বায়ুপ্রবাহ থাকার জন্য তেজস্ক্রিয়-ভস্ম অকুস্থলের চার-পাশে বৃত্তাকার ক্ষেত্রে সমানভাবে পড়বে না, হাওয়ার দিক বরাবর ছড়াবে উপবৃত্তাকারে। বিকিরণের মাত্রা, কতদূর পর্যন্ত কতটা হতে পারে ভিন্ন-ভিন্ন দাগ কাটা উপবৃত্ত দিয়ে ছবিতে দেখান আছে। অকুস্থল থেকে ১০০ মাইল পর্যন্ত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাত্রা হবে ২০০০র (রয়েন্টগেন), ১২৫ মাইলের মধ্যে ১০০০র (রয়েন্টগেন), ১৬০ মাইলের মধ্যে ৫০০র (রয়েন্টগেন) এবং ১৯০ মাইলের মধ্যে ৩০০ রয়েন্টগেন। মানুষের শরীরে রয়েন্টগেন মাত্রায় বিকিরণের প্রভাব পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

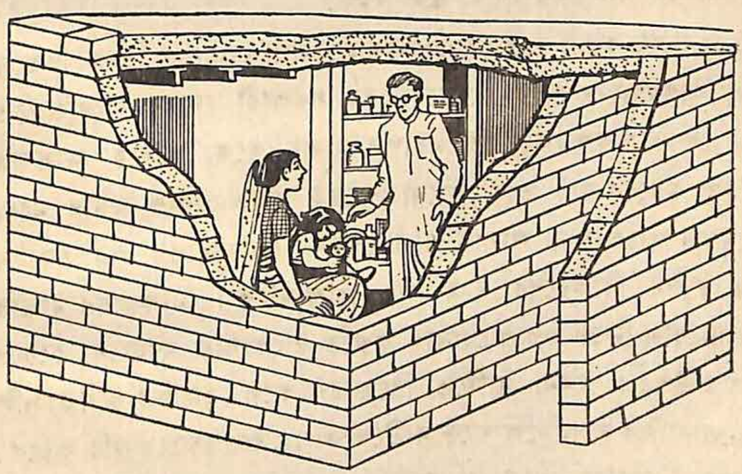
ভবিষ্যতের কারিগর ও প্রযুক্তিবিদরা নাগাসাকির শিক্ষা মনে রেখে সম্ভব হলে অসমান ও ঢেউ খেলানো জমি শহর তৈরির জন্য বেছে নিতে পারেন। নাগাসাকিতে যেখানেই পাহাড়ের আড়াল পড়েছে সেখানে বোমার ধাক্কা এসে পৌঁছয়নি। নতুন শহর তৈরি করতে হলে ছড়ানোভাবে করাই সঙ্গত হবে। পুরোনো শহরগুলিতে প্রতিরক্ষার উপায় হিসাবে হাসপাতাল, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, দমকল অফিস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অফিসগুলি শহরের উপকণ্ঠে সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। যাঁদের হাতে প্রতিরক্ষার ভার তাঁরা এ সব বিষয় বিবেচনা ক'রে দেখতে পারেন। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব এরকম কয়েকটি বিষয় এখন আমরা আলোচনা করব।

খোলা জায়গায় থাকবেন না

যদি বিপদসূচক সঙ্কেত না বাজে বিস্ফোরণের ঝলক দেখা মাত্রই ছুটে গিয়ে কোন ঢাকা বা বন্ধ জায়গায় আশ্রয় নেবেন। সময়মত সাইরেন বাজলে অবশ্য এর জন্য খানিকটা সময় পাওয়া যাবে। যদি খোলা রাস্তায় থাকেন তবে কোনো দেওয়ালের গায়ে মুখ ঢেকে উপুড়

হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাতের কাছে খবরের কাগজ বা ঐ জাতীয় ঢাকা দেবার কিছু থাকলে ঘাড়, গলা ও অন্যান্য খোলা অংশ আড়াল করুন। আর কিছু না পেলে নিজেরই জামাকাপড়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব খোলা অংশগুলি ঢুকিয়ে ফেলুন। যদি অফিস, স্কুল, কলেজ বা বাড়ির মধ্যে থাকেন তৎক্ষণাৎ টেবিলের নিচে আশ্রয় নেবেন। আগে থাকতে সময় পেলে চারিদিক ঢাকা বন্ধ ঘরে চলে যাওয়াই সঙ্গত। মাটির নিচের ঘর বা সিঁড়ির নিচের কুঠরি ইত্যাদিও নিরাপদ স্থান। যে সব দেশে টিউব অর্থাৎ মাটির নিচে রেলপথ আছে তাদের পারমাণবিক আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আর বাড়তি কিছু করতে হবে না। ঐ মাটির নিচের স্টেশনগুলিই হবে চমৎকার আশ্রয়।

যাঁরা নতুন বাড়ি করার বাসনা পোষণ করেন তাঁরা সব রকম বিপদের কথা বিবেচনা ক'রে একটি মাটির নিচের কুঠরি বা বেসমেণ্ট



আশ্রয় কক্ষ

জাতীয় ঘরের পরিকল্পনা করতে পারেন। পারমাণবিক আক্রমণ যদি নাও হয় গ্রীষ্মের দিনে ঐ ঘরে চমৎকার ঠাণ্ডায় সময় কাটানো যেতে

পারবে। যদি আপনার ইতিমধ্যেই নিজস্ব বাড়ি হয়ে গিয়ে থাকে কিম্বা যদি আপনি বংশানুক্রমে পৈতৃক বাড়িতে বাস করছেন তাহলেও আশঙ্কার কিছু নেই। যদি একটু খোলা জমিও থাকে সেখানে নিম্নলিখিত উপায়ে ৭-৮ জন লোক ধরে এমন আশ্রয় তৈরি ক'রে নেওয়া যায়।

সাধারণ বাড়ির দেওয়ালের অস্বাভাবিক চাপ সহ্য করার ক্ষমতা থাকে না এবং হিরোশিমাতে দেখা গেছে দূরের বাড়ির দেওয়ালের কোনো ক্ষতি না হলেও ছাদগুলি প্রবল চাপে ভিতরে ঢুকে গেছে। এইরকম অবস্থা যাতে না হয় সেজন্য আশ্রয় কক্ষের অথবা বাড়ির একটি বিশেষ ঘরের অন্তত পনেরো ইঞ্চি পুরু রি-ইনফোর্সড কংক্রিটের দেওয়াল করা যেতে পারে। ছাদ ও মেঝেও বিশেষভাবে তৈরি হতে হবে যাতে প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে ৫ পাউণ্ড পর্যন্ত চাপ গ্রহণ করতে পারে।

কতদিনে ঘটনাস্থল বিপদ-মুক্ত হবে?

এটা নির্ণয় করার ভার ছেড়ে দিতে হবে সম্পূর্ণ রূপে প্রতিরক্ষা বিভাগ ও বিশেষজ্ঞদের উপর। কোনোরকম সরকারী ঘোষণা রেডিওতে না শোনা পর্যন্ত কিছুতেই নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করবেন না। তবে কোনো ক্ষেত্রেই অন্তত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খোলা জায়গায় না আসাই ভাল, কেননা বিস্ফোরণের পর একদিন বা দু'দিন বিকিরণের মাত্রা খুব বেশি থাকে। বিকিরণের মাত্রার কম-বেশি নির্ভর করবে বোমার প্রকৃতি ও কোথায় ফাটানো হয়েছে তার উপর: যেমন, মাটিতে বিস্ফোরণ হলে তেজস্ক্রিয় কণিকাগুলি ধুলোবালির মধ্যে ঢুকে পড়ে মাটিতে তীব্র তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি করবে। কিন্তু বিস্ফোরণ আকাশে হলে শুধু বড় বড় তেজস্ক্রিয় কণাগুলি মাটিতে পড়বে, সূক্ষ্মতর কণাগুলি ঊর্ধ্বাকাশে উঠে যাবে ও বহু বছর ধরে ক্রমে ক্ষয় পেতে থাকবে। জলের তলায় বিস্ফোরণ হলে জলে তেজস্ক্রিয়তা বাড়বে এবং যে বিরাট জলস্তম্ভ শূন্যে উঠবে তা নামবার

সময় যতটা জায়গা প্লাবিত করবে সবটাই বিপজ্জনকভাবে তেজস্ক্রিয় হয়ে উঠবে।

তেজস্ক্রিয়তা দূর করার কোনো উপায় আছে কি ?

যেসব দেশে পারমাণবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশ অগ্রসর, সেখানে নানারকম বিষয় নিয়ে চিন্তা করা হয় যা আমাদের কাছে হয়ত হাস্যকর মনে হতে পারে। সেগুলি হলো যেমনভাবে সংক্রামক ব্যাধি হলে শহর গ্রাম প্রভৃতি পরিশোধক দ্রব্য দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়, অনেকটা সেইভাবে তেজস্ক্রিয় স্থানের তেজস্ক্রিয়তা দূর করার ব্যবস্থা যাকে ইংরেজিতে বলা হয় ডি-কণ্টামিনেট করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিজগুণেই ক্ষয় পেতে থাকে এবং এই ক্ষয়কে দ্রুততর করার কোনো উপায় নেই। কারণ তেজস্ক্রিয়তা কোনো রাসায়নিক ধর্মের উপর নির্ভর করে না। তবে কিভাবে কোনো তেজস্ক্রিয় স্থানকে বিপদ-মুক্ত করা সম্ভব ?

তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে কি কি উপায়ে আত্মরক্ষা করা সম্ভব তার উপায়গুলি আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। এখন প্রশ্ন হলো যেহেতু কোনো শহরে (আমরা শহরের কথা বার বার বলছি কারণ পারমাণবিক বোমা গ্রামে পড়ার সম্ভাবনা কম এবং এইসব অস্ত্রের ছোঁড়ার পদ্ধতি এত নিখুঁত যে ভুল ক'রে অন্য কোথাও পড়ার আশঙ্কা প্রায় নেই) কতদিন দরজা জানলা বন্ধ ক'রে বা মাটির নিচে ঢুকে পড়ে কাজকর্ম চলতে পারে ? বোঝাই যাচ্ছে প্রতিরক্ষা দপ্তরের কর্তব্য হবে অবিলম্বে শহরকে বসবাসের উপযুক্ত ক'রে তোলা। তার মানে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ এতটা কমিয়ে ফেলা যাতে সেটা বিপজ্জনক বলে গণ্য না হতে পারে। তেজস্ক্রিয়তা যখন মাত্রা অতিক্রম করে তখনই সেটা ক্ষতিকর। না হলে নয়। কেননা পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে কেরালার সমুদ্রতীরে যেসব জেলেরা মোনাজাইট বালির মধ্যে বংশানুক্রমে বাস করছেন ঐ বালি থেকে বেরিয়ে আসা বিকিরণে তাঁদের কোনোই ক্ষতি হয়নি।

তাছাড়া পাহাড়ী জায়গায়, সমতল জমি থেকে খুব উঁচুতে কসমিক-রশ্মির বর্ষণ সহ্য ক'রেও মানুষ বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছে। সুতরাং অল্পসল্প তেজস্ক্রিয়তা থাকলে সেটা ভয়াবহ কিছু নয়, ভয়াবহ হয় তখনই যখন সেটা আমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

এখন আমাদের সেই কল্পিত শহরে ফিরে যাওয়া যাক যেখানে পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর নাগরিকরা বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য দিন গুনছেন। হাসপাতাল, বড় রাস্তা ইত্যাদি দরকারী জায়গাগুলি আগে তেজস্ক্রিয়তার বিপদ থেকে মুক্ত করা দরকার, কেননা সেখানেই আগে লোক-চলাচল হবে। জমি ও রাস্তার উপর অন্য জায়গা থেকে মাটি এনে ছড়িয়ে দেওয়া হলো তেজস্ক্রিয়তার স্পর্শ থেকে বাঁচবার একটা উপায়। পিচের রাস্তা থেকে তেজস্ক্রিয়তা দূর করার আরো একটি উপায় হলো জল দিয়ে ভাল ক'রে রাস্তা ধুয়ে দেওয়া। রাস্তা ধোওয়া গাড়ি বা হোস-পাইপ দিয়েও এই কাজ হতে পারে। অবশ্য শহরের সর্বত্রই তো আর পিচের রাস্তা নেই! যেসব জায়গার জমি নরম বা বালি-বালি সেখানে উপর থেকে মাটি চেঁচে তুলে ফেলা যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে এগুলি সবই খুব ব্যয়সাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তেজস্ক্রিয়তা পদার্থের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে, যেমন বাড়ির বাইরের দেওয়াল, দরজা-জানলা, আসবাবপত্র, গাছপালা, গাড়ি প্রভৃতি সে সমস্ত কিছু ভালভাবে তেজস্ক্রিয়তামুক্ত করা বেশ কঠিন কাজ। আমরা এ-বিষয়ে যা সংবাদ সংগ্রহ করা গেছে সেগুলি পরিবেশন করছি মাত্র। তবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ যখন আমাদের দেশে এসেই গেছে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের কেন্দ্র প্রায় সর্বত্রই গড়ে উঠবে তখন পারমাণবিক আবর্জনা বা রিঅ্যাকটরের জ্বালানির তেজস্ক্রিয় পরিত্যক্ত বস্তু কিভাবে রাখা হবে, ফেলা হবে বা বিনষ্ট করা হবে এগুলি আমাদের দেশেও সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে বাধ্য। আমাদের পারমাণবিক বিশেষজ্ঞরা এবং পরমাণু-শক্তি দপ্তর, বড় বড় শহরের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তা দূরীকরণের উপায় সম্বন্ধে অবহিত আছেন; এবং

প্রয়োজনমতো তাঁদের পরামর্শে জনসাধারণ উপকৃতও হবেন—কয়েক বছর আগে ধাপার মাঠে ভাঙা রেডিয়ম-নিড্‌ল-সংক্রান্ত ব্যাপার যেমন পরমাণু শক্তি দপ্তরই সমাধান করেছিলেন।

কিলোটন ও মেগাটন

হিরোশিমা-পরবর্তী যুগে পরমাণু বোমার উত্তরোত্তর উন্নতি হয়েছে। মেগাটন বোমার পরীক্ষামূলকভাবে বিস্ফোরণ হয়েছে বহুবার, ফলে পৃথিবীর আকাশে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ বেড়েছে। সম্প্রতি এক আমেরিকান বিজ্ঞানী ঐ সময়ে ইউরোপ-আমেরিকায় শিশু-মৃত্যুর হার অনেক বেড়েছিল — কারণ শিশুদের বিকিরণ সহ্য করার ক্ষমতা কম — এই মর্মে একটি সমীক্ষা প্রকাশ করেছেন। যদিও তাঁর পরীক্ষার ফলাফল ঠিক নয় বলে অনেকে প্রতিবাদও জানিয়েছেন তবু মেগাটন-বিস্ফোরণের ফলে এরকম ঘটনা ঘটা যে অসম্ভব কিছু নয় সেটা বোমার চরিত্র অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পরবর্তীকালে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়েছিল, তবে জাপানে বিস্ফোরণের ফলে কলকাতায় শিশুদের অসুস্থ হয়ে পড়ার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এখানেই কিলোটন ও মেগাটন বোমার আসল পার্থক্য। মেগাটনে বিস্ফোরণজনিত ধ্বংস করার ক্ষমতা বেশি তো বটেই—এর দীর্ঘস্থায়ী কুফলের পরিমাণ আরো ভয়ঙ্কর এবং সমস্ত বিশ্বব্যাপী। সেজন্য অনেক যুদ্ধবিদ্ অনুমান করেন ভবিষ্যতে যদি পারমাণবিক যুদ্ধ একান্তই বাধে তবে সে যুদ্ধে পরমাণু অস্ত্রের সীমিত ব্যবহার হবে — অর্থাৎ মেগাটনের বদলে কিলোটনের ব্যবহার। তাতে শত্রু যদি প্রতিবেশী রাজ্য হয় তবে তার পক্ষে নিজের নাক না কেটেও পরের যাত্রাভঙ্গ করা সম্ভব হবে। মেগাটনের অর্থ সমূহ বিনাশ এবং নিজেদেরও সর্বনাশ ডেকে আনা। হিরোশিমার ধ্বংসলীলার পর সেখানে বিশেষজ্ঞের দল গিয়ে বহুদিন ধরে পরীক্ষা ক'রে প্রায় সাড়ে চারশো পাতার একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন। আমেরিকার প্রতিরক্ষা দপ্তর ও পরমাণু-শক্তি কমিশন মিলিতভাবে

এই পুস্তিকা প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য ছিল যাতে কিলোটন বোমা-সম্বন্ধে সর্বসাধারণ জানতে পারেন এবং প্রয়োজন হোলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন, যদিও পারমাণবিক আক্রমণের জন্য সর্বাত্মক সতর্কতা নিতে পারেন একমাত্র সিভিল ডিফেন্স বিভাগ। ভারত সরকারের প্রকাশনা বিভাগ নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোসন্‌স নামে আর একটি প্রামাণ্য বই বার করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা যা আলোচনা করছি তা ঐ বই দুটির উপর ভিত্তি ক'রে। সতর্কতামূলক যে ক'টি ব্যবস্থার কথা আমরা এখানে আলোচনা করলাম, মনে রাখতে হবে, সেগুলি সবই কিলোটন বোমার প্রসঙ্গে।

পরিত্রাণ নেই

সায়েন্টিফিক আমেরিকান-নামক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দু'জন মার্কিন পরমাণু-বিশেষজ্ঞ, রিচার্ড গারউইন ও হান্‌স বেথে বিস্তারিত আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধের হাত থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অকল্পনীয় ব্যয়ে সারা দেশ জুড়ে রেডার ও মিসাইল-রোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেগুলি বিশ্লেষণ ক'রে বেথে ও গারউইন দেখিয়েছেন যে শত্রুরা তাদের অগ্রাহ্য ক'রে দূরপাল্লার অস্ত্র ছুঁড়ে পুরো মহাদেশটি বিনষ্ট করতে পারে। বলাই বাহুল্য এই যুদ্ধে কোনো পক্ষই নিশ্চেষ্ট থাকবে না এবং ধ্বংস হবে উভয় দিকেই এবং তার ফলে সমস্ত পৃথিবী।

সুতরাং আপাতত আমরা ছোটখাট কিলোটন বোমার হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায়গুলি বিবেচনা ক'রে দেখলাম। যে ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই সে বিষয়ে না ভাবাই ভাল।

পরমাণু ভরসা

যুদ্ধের জন্য না শান্তির জন্য ?

পরমাণুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের বিভীষিকা সহজে ভোলবার নয়। কিন্তু জেলে ও হাঁড়ি-ঢাকা দৈত্যের গল্পে যেমন এখানেও তেমনি নিউক্লিয়াসের ভিতরের রুদ্ধ শক্তিকে কি কাজে লাগান হবে তা নির্ভর করছে সম্পূর্ণরূপে মানুষের ইচ্ছে ও প্রয়োগ-কুশলতার উপর। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের পরে আর লোকক্ষয়ের উদ্দেশ্যে পরমাণু বোমা ফেলা হয়নি কিন্তু পরমাণু-শক্তির কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে, এমন কি আমাদের দেশেও পরমাণু-বিদ্যুৎ ঘরে ঘরে চালাচ্ছে পাখা, ইস্ত্রি, উনুন, আলো, ঘোরাচ্ছে কলকারখানার চাকা। পরমাণু-দৈত্যকে বশ করিয়ে যদিও চাকরের মতো খাটানো হচ্ছে তবু হয়ত অনেকে অতীতের সেই ভয়াবহ ঘটনার কথা স্মরণ ক'রে ভাববেন খামকা পরমাণুকে নিয়ে এত টানাটানি কেন ?

শক্তির জন্য পরমাণু

পরমাণুতে যাঁদের আস্থা নেই সেই অবিশ্বাসীর দল হয়ত প্রশ্ন তুলবেন শক্তিরই বা এত দরকার কি! আজকের সভ্য দেশগুলিতে শক্তির কি কোনো অভাব আছে ? সুইচ টিপলেই তো হলো। চক্ষের নিমেষে চলতে থাকবে ট্রেন, কারখানা, রেডিও, পাখা, এয়ার-কণ্ডিশনার এবং আরো কত কি। খামোকা আরো শক্তি চাই শক্তি চাই বলে পরমাণু থেকে শক্তি উৎপাদন করার কি এতই দরকার ? দরকার কথাটার মানে যদি আমরা একটু তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি তবেই দেখবো দরকার বলতে আগে যা মনে করা হতো সব সময়ই যে তা মনে করা হবে এমন কোনো কথা নেই। সেকালে যখন প্রথম

ইলেকট্রিসিটির চল হলো তখন অনেক গোঁড়া লোক ভেবেছিলেন এই সবের দরকার কী! বেশ তো ছিল হারিকেন লণ্ঠন আর কেরোসিনের কুপি। এমন কি এখনও আমাদের দেশের বহু গ্রামে বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবহার ছাড়াই লোকে দিব্যি জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থায় চিরকাল কাটানোই কি খুব কাম্য? তাহলে সময়ের চাকা উল্টোদিকে চালিয়ে দিতে হয়।

একটু আগেই আরো শক্তির চাহিদার কথা হচ্ছিল। এটা শুধু সভ্যতার ক্রমবিকাশের জন্য নয়, মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষেও একান্ত প্রয়োজনীয়। অনেক সময় আমরা মনে করি শক্তি মানে কেবল আলো জ্বালাবার, কল ঘোরাবার বা গাড়ি চালাবার শক্তি। কথাটা একেবারেই ভুল। চতুর্থ অধ্যায়ে এই নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। গাছপালার বেড়ে ওঠা থেকে আরম্ভ ক'রে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়। শক্তির জন্য চাই জ্বালানি। উনুনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় কাঠ বা কয়লা। আমাদের শরীরে শক্তি জোগাতে জ্বালানির কাজ করে খাদ্য। মিষ্টি বা চিনিতে আছে বেশি ক্যালরি, শাকসব্জিতে সেই পরিমাণে কম। ক্যালরি হলো খাদ্য থেকে রূপান্তরিত শক্তির মাপ। এখন সারা পৃথিবীতে লোকে একদিনে যা খায় তার থেকে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ ২২০ কিলো-ক্যালরি। তবে এই ক্যালরি-শক্তির বণ্টন সব জায়গায় সমান নয়। গরীব দেশগুলিতে মাথা-পিছু ক্যালরির পরিমাণ উন্নত দেশগুলির চেয়ে অনেক কম।

কিন্তু শুধু খেয়েদেয়ে গায়ে জোর ক'রে সব কাজই যদি করা চলত তাহলে আর ভাবনা ছিল কি? ক্রমেই কেবলমাত্র দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করার নানা অসুবিধা বুঝতে পারল লোকে। প্রাচীনকালে স্পার্টায় নবজাত শিশুকে পাহাড় থেকে গড়িয়ে ফেলা হতো। যারা বেঁচে যেত প্রমাণ হতো তারাই সুস্থ ও বলিষ্ঠ দেহ ধারণ ক'রে বেঁচে থাকার যোগ্য। দৈহিক শক্তি যাদের নেই তাদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকারই নেই—এইরকম ধারণা প্রচলিত ছিল।

কিন্তু শুধু দৈহিক শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে কোনো লোক বা জাতিকে বিচার করা হয় না আজকাল। দৈহিক শক্তির চেয়ে যন্ত্র দিয়ে অনেক বেশি কাজ করা সম্ভব এটা বুঝেই সম্ভবত প্রাচীন ব্যাবিলন, চীন ও রোম সাম্রাজ্যে আরম্ভ হয়েছিল জলশক্তি আর বায়ুশক্তির ব্যবহার। এ ছাড়া পশুশক্তি আর ক্রীতদাস দিয়ে কাজ করানো তো ছিলই। হিসেব ক'রে দেখা গেছে একটা ঘোড়া মানুষের দশগুণ কাজ করতে পারে। যদিও এমন দিনও ছিল যখন সারি সারি ক্রীতদাসদের দিয়ে দাঁড় বাইয়ে চালানো হতো বিরাট আকারের নৌকো। কিন্তু রানী ক্লিওপেট্রার আমলে জীবন খুব সুখের ছিল মনে করলে ভুল হবে। রাজাদের না হয় হাজার হাজার কেনা গোলাম থাকত কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে তো আর সেটা সম্ভব ছিল না। যন্ত্র সেই অসুবিধা দূর করল। ক্রমে ক্রমে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়তে লাগল। বলাই বাহুল্য এইসব যন্ত্র দৈহিক শক্তির বদলে অন্য শক্তি দ্বারা চালিত হতো। সভ্যতার ইতিহাসে কবে কি রকম শক্তি ব্যবহার করা হয়েছে তার একটা খসড়া নিচে দেওয়া হলো।

প্রাগৈতিহাসিক	— কাঠের আগুন।
প্রাচীন যুগ	— কাঠের আগুন, বায়ুশক্তি।
ত্রয়োদশ শতাব্দী	— কয়লা, কাঠ, জলশক্তি, বায়ুশক্তি।
১৭১০ খ্রীস্টাব্দ	— কয়লা, স্টীম, বায়ুশক্তি।
১৮৯০ খ্রীস্টাব্দ	— কয়লা, স্টীম, ইলেকট্রিসিটি।
১৯০০ খ্রীস্টাব্দ	— কয়লা, স্টীম, ইলেকট্রিসিটি, পেট্রোল।
১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দ	— কয়লা, স্টীম, ইলেকট্রিসিটি, পেট্রোল, পারমাণবিক শক্তি।

এখন পৃথিবীর সব দেশে যে-হারে শক্তি উৎপাদিত হচ্ছে তার মধ্যে একটা বিরাট অসামঞ্জস্য রয়ে গেছে। আমাদের দেশে এখনো প্রচুর শক্তি সংগ্রহ করা হয় শুকনো ঘুঁটে পুড়িয়ে। কিন্তু ক্রমশ অন্য দেশের সঙ্গে সমান হবার জন্য আমাদের দেশেও চলেছে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন, ফলে আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তির চাহিদাও দিন দিন

বাড়ছে। এখন আমাদের দেশে কয়লার উৎপাদন মাথা-পিছু এক টনের এক দশমাংশ অথচ আমেরিকায় কয়লার উৎপাদন মাথা-পিছু তিন টন।

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ অজস্র, এইরকম একটা ধারণা অনেকের আছে। কিন্তু শক্তি সম্পদের হিসেব নিতে গেলে অনেকের চক্ষুস্থির হবার উপক্রম হবে — কত বেশি আছে বলে নয়, বরং ঠিক তার উল্টো—দরকারের তুলনায় কত কম এই দেখে। আমাদের জীবনযাত্রার মান যদি রাতারাতি আমেরিকার মতো হয়ে যায় তাহলে আমাদের শক্তির উৎস শেষ হতে লাগবে মাত্র একশ বছর। এই একশ বছরেই সব পেট্রোল ও কয়লা হবে শেষ।

আর মাত্র একশো কিউ

আমরা যখন বাড়ির ইলেকট্রিক বিল দিই তখন কিলোওয়াট-ঘণ্টা এককে কাজ চলে। একটা বড় কারখানার বেলায় সেটা মেগাওয়াট-ঘণ্টা এককে পৌঁছয়। কিন্তু সারা পৃথিবীর শক্তি খরচের হিসেব করতে গেলে আরও বড় একক প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শক্তি খরচের হিসেব নিকেশ করতে তাই যে এককটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার নাম Q – ইংরেজি বর্ণমালার অক্ষর কিউ।

১ Q = $১০^{১৮}$ বি টি ইউ (ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট)

= ২·৯৩ × $১০^{১৮}$ কি-ও-ঘ

এক মেট্রিক টন কয়লা ৫·৮১৩ × $১০^{৩}$ কি-ও-ঘ শক্তির তুল্য ধরলে দেখা যাবে ১ কিউ পাঁচহাজার কোটি মেট্রিক টন কয়লার শক্তির সমান। দেখ যাক সারা পৃথিবীতে মানুষের কত শক্তি খরচ হয়। অনুমান করা হয় খ্রীস্টের জন্ম থেকে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীতে মোট শক্তি খরচ হয়েছে ৯ কিউ। ১৮৫০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ১ কিউ। ১৯৫০ এর পর থেকে প্রতি দশ বছরে এক কিউ। যত দিন যাচ্ছে শক্তির চাহিদা বেড়েই চলেছে এবং আশঙ্কা করা হয় ২০০০ খ্রীস্টাব্দে পৌঁছবার আগেই শক্তির চাহিদা বছরে আধ কিউ হবে।

অর্থাৎ কয়লার হিসেবে বছরে ২৫০০ কোটি মেট্রিক টন কয়লা খরচ হবে। এত শক্তি আমরা পাব কোথা থেকে ? মানুষের জানা যত ফসিল জ্বালানি আছে তার থেকে মোট ১০০ কিউ পাওয়া যেতে পারে।

এখন কয়লা যে হারে পুড়ছে সেভাবে চলতে থাকলে পৃথিবীতে সঞ্চিত কয়লার ভাঁড়ার ফুরোতে কতদিন লাগবে ? কয়লা, গ্যাস ও পেট্রোলিয়মের খনি তো অফুরন্ত নয় ! ইংলণ্ডের কয়লা ফুরোতে আর বড় জোর বছর কুড়ি। ভারতবর্ষের মাটিতে এখনো না তোলা কয়লা আছে প্রায় দশ হাজার কোটি টন। আশানুরূপভাবে আমাদের দেশে শিল্পোন্নয়ন হলে এমন দিন অদূর ভবিষ্যতে আসবেই যখন আর কয়লা অবশিষ্ট থাকবে না। তখন কী হবে ? এমন কি উপায় আছে যার দ্বারা সহজে ও সুলভে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক'রে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যায় ? অনেকে বিচার-বিবেচনা, পরীক্ষা কাণ্ডের পর একটিই উত্তরে পৌঁছনো গেছে। পরমাণু হলো আমাদের ভবিষ্যৎ যুগের কয়লা। যতদিন পর্যন্ত অন্য কোনো শক্তির উৎস আবিষ্কার না হচ্ছে ততদিন পরমাণু-শক্তি ছাড়া আমাদের বংশধরদের আর গতি নেই। গ্যাস, কয়লা ও পেট্রোলিয়ম আমরা শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহার ক'রে আসছি বটে কিন্তু কাজটা খুব বুদ্ধিমানের মতো হয় নি এমন যুক্তিও অনেকে দিয়ে থাকেন। নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য, রং, প্লাস্টিক, কৃত্রিম সুতো, ওষুধ ও বহু জিনিস তৈরি হয় কয়লা ও পেট্রোলিয়ম থেকে। এগুলি সব পুড়িয়ে খরচ ক'রে ফেললে প্লাস্টিক শিল্প ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি উৎপাদন একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। সবদিক ভেবেচিন্তে পরমাণু-শক্তি ব্যবহারই মনে হবে যুক্তিসংগত।

এছাড়া পরমাণু শক্তির সুবিধে কত ! ধরা যাক দেশের মাটির নিচে প্রচুর কয়লা মজুত আছে। কিন্তু সর্বত্র খনি খুঁড়ে কয়লা বার করা কি মুখের কথা ? তাছাড়া ভারতের সব কয়লাই পুবদিকে। দক্ষিণ ভারতে কয়লা খুব বেশি নেই। ট্রেনে ওয়াগন বোঝাই ক'রে এই বিরাট দূরত্ব অতিক্রম ক'রে উত্তর থেকে দক্ষিণে কয়লা পাঠানো

খুব সহজ ব্যাপার নয়। এখন তারাপুরে যে ৪০০ মেগাওয়াট শক্তি-সম্পন্ন পরমাণুশক্তি-কেন্দ্রটি রয়েছে কয়লায় চালাতে হলে সেখানে রোজ তিন মালগাড়ি ভর্তি কয়লা পাঠাতে হতো। পরমাণু-শক্তির সুবিধে হলো এটি কয়লার মতো বিরাট জায়গা-জোড়া বোঝা নয়। দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে একে পাঠাতে বিশেষ ঝামেলা নেই, খরচও অতি সামান্য। আর, একবার ব্যবহার চালু হয়ে গেলে এটার জন্য আমাদের অতিরিক্ত দাম দিতেও হবে না—এখন ইলেক্ট্রিসিটির জন্য যা দাম দিতে হয় তার চেয়ে খুব বেশি কিছু দিতে হবে না। পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহারের একটা বিশেষ সুবিধা হলো অল্প উপাদান থেকে অনেক বেশি পরিমাণে শক্তি পাওয়া যাবে। একই আয়তনের জ্বালানি কয়লার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশি শক্তি দেবে।

মাত্র তিরিশ বছর আগেও কিন্তু এই শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হারে চক্রবৃদ্ধি-বিক্রিয়ার কৌশল আবিষ্কৃত হবার পর এটা আর অসম্ভব রইল না। এখন কৃত্রিম উপায়ে রিঅ্যাকটরের মধ্যে এই বিক্রিয়াজনিত শক্তি রূপান্তরিত হচ্ছে তাপে, তারপর স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তাপ প্রয়োগে ঘোরানো হচ্ছে টারবাইনের চাকা।

রিঅ্যাকটরের কাজ কী ?

যে-যন্ত্রে এই অঘটন ঘটানো হচ্ছে সেটাই হলো রিঅ্যাকটর যাকে বাংলায় পরমাণু-চুল্লী বলা হয়েছে। রিঅ্যাকটরে কাজ একটি নয়, অনেকগুলি। এদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল তাপ-উৎপাদন। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে বিভাজন ঘটিয়ে যে শক্তি বার হয় তা থেকে পাওয়া যায় প্রচণ্ড তাপ। একটি ^{২৩৫}U-এর পরমাণু বিভাজনে বার হয় ২০০ এম-ই-ভি শক্তি। রিঅ্যাকটর দিয়ে কত বেশি তাপ উৎপন্ন করা যেতে পারে সেটা কিন্তু প্রধান বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তাপ যে কত পাওয়া যেতে পারে তার প্রমাণ হিসেবে তো পরমাণু

বোমাই আছে। রিঅ্যাকটরের প্রধান কাজ হলো তাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ ক'রে কাজের উপযোগী ক'রে রাখা।

এছাড়া রিঅ্যাকটরের আছে আরো কাজ, যেমন প্লুটোনিয়ম তৈরি করা। প্লুটোনিয়ম হলো কৃত্রিম উপায়ে তৈরি এমন একটি মৌল যাতে বিভাজন সম্ভব। ${}^{২৩৮}_{৯২}U$-এ একটি নিউট্রন ঢুকে তৈরি করে ${}^{২৩৯}_{৯২}U$। এটি একটি বিটা-কণা বিকিরণ ক'রে আর একটি অস্থায়ী নিউক্লিয়াস নেপচুনিয়মে রূপান্তরিত হয়। নেপচুনিয়ম আবার পরিণত হয় ${}^{২৩৯}_{৯৪}Pu$ বা প্লুটোনিয়মে, একটি বিটা-কণা বার ক'রে। প্লুটোনিয়মের অর্ধায়ু কয়েক শত বছর। এটি চক্রবৃদ্ধি হারে বিভাজন সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং সেজন্যই রিঅ্যাকটর বা পরমাণু-চুল্লীর জ্বালানি হিসাবে অতি উত্তম।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরির কারখানাও হলো ঐ রিঅ্যাকটর। আইসোটোপ কী সে কথা আগে বোঝানো হয়েছে। এগুলো কী কাজে লাগে সে কথায় আমরা একটু পরেই আসছি। আপাতত এইটুকু জেনে রাখা ভাল যে শিল্প, কৃষি, খাদ্য সংরক্ষণ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা ব্যাপারে আইসোটোপের ভূমিকা ক্রমেই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকানরা একটি উপগ্রহ আকাশে তুলে-ছিলেন সংবাদ পাঠানোর উদ্দেশ্যে। এর মধ্যে ছিল ৫০০ ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদনকারী একটি ছোট আকারের রিঅ্যাকটর। যে-সব দেশে কোটি কোটি টাকার পরিকল্পনায় হাত দেবার সামর্থ্য নেই অথচ শক্তির চাহিদা আছে তাদের কাছে এই উপগ্রহ রিঅ্যাকটরের ব্যাপারটা খুবই আশাজনক। আমাদের দেশে আপাতত মহাকাশের চেয়ে মাটিতেই শক্তির প্রয়োজন বেশি। ছোট আকারের রিঅ্যাকটর দিয়ে অল্প ব্যয়ে নানারকম কাজ করানো যেতে পারে।

নটিলাস

আপাতত পরমাণু থেকে বার করা শক্তির সবচেয়ে সাফল্যজনক

ব্যবহার হয়েছে জাহাজ ও ডুবোজাহাজ চালাবার কাজে। পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রধান সুবিধে হলো জাহাজকে বারবার জ্বালানি ভর্তি করার জন্য বন্দরে ভিড়তে হয় না। এইরকম একটি ডুবো-জাহাজের কল্পনা করেছিলেন জুল ভার্ন তাঁর নটিলাসের গল্পে। তাঁর দেওয়া এই নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক'রে আমেরিকা প্রথম পারমাণবিক সাবমেরিনের নাম দেয় নটিলাস। একবারও উপরে না উঠে এই ডুবোজাহাজ বরফের তলা দিয়ে উত্তরমেরু পার হয়ে আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিল। পরমাণু-শক্তির প্রয়োগ কুশলতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে। পরমাণু শক্তি চালিত জাহাজের গতি সাধারণ জাহাজের চেয়ে বেশি। নটিলাসের বেলায় এটা ত্রিশ সামুদ্রিক মাইল পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। এখন চেষ্টা চলেছে এই শক্তি দিয়ে প্লেন চালানো যেতে পারে কি না সেটা পরীক্ষা করে দেখা। এটা অসম্ভব কিছু নয়। তবে এক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক পাকা হওয়া দরকার যাতে প্লেনের চালক ও যাত্রীদের তেজস্ক্রিয়তা লাগার ভয় না থাকে। এছাড়া এক-একটা প্লেন তৈরি করতে খরচ পড়ে যাবে অসম্ভব রকম বেশি, প্রায় ২০০ কোটি টাকা। স্বাভাবিক কারণে মোটর গাড়ি চালাতে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের কথা কেউ চিন্তা করে না কেননা শক্তির উৎস ফুরোবার আগে গাড়ির আয়ুই হবে শেষ। তাছাড়া দামের দিকটাও আছে। তবে পারমাণবিক শক্তি-প্রয়োগের কলা-কৌশল খুবই তাড়াতাড়ি উন্নতিলাভ করছে। ভবিষ্যতে কি কি নতুন উপায়ে একে ব্যবহার করা হবে তা এখন থেকে বলা সম্ভব নয়।

পরমাণুর অন্য কাজ

পরমাণুকে বিজ্ঞানীর লেবরেটরি থেকে বার ক'রে যে কত বিচিত্র ভূমিকা গ্রহণ করাতে বাধ্য করা হয়েছে এবারে সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। গাছপালা সূর্যের আলোর সাহায্যে যে জল থেকে খাদ্য গ্রহণ

করে একথা সকলেই জানে। ঠিক কি প্রক্রিয়াতে এই আশ্চর্য রূপান্তর সম্ভব সেটা জানতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলে বিশেষজ্ঞরা এ-সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করেছিলেন, তবে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করায় এই ব্যাপারটির আগাগোড়া একেবারে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে।

গাছপালার দেহে কার্বনের পরিমাণ শতকরা তিরিশ থেকে চল্লিশ ভাগ। কয়েকটি তেজস্ক্রিয় কার্বন-কণিকা গাছের দেহে প্রবেশ করিয়ে উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌রা এই কণিকার গতিপথ লক্ষ ক'রে আশ্চর্য সব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন কিভাবে বিশেষ বিশেষ পাতা কার্বন-ডাইঅক্সাইড তৈরি করার কাজে নিযুক্ত, একবার তৈরি হয়ে গেলে কণিকাগুলি নেমে আসে মূল পর্যন্ত।

জনহিতে তেজস্ক্রিয়তা

তেজস্ক্রিয়তা অল্প পরিমাণে প্রয়োগ ক'রে ক্ষতিকর পোকামাকড় ইত্যাদি বিনষ্ট করা হয়। এছাড়া আলু এবং অন্য নানারকম সংরক্ষিত খাদ্যে এই রশ্মি প্রয়োগ ক'রে পচন নিবারণ করা হয়। তেজস্ক্রিয় রশ্মি দিলেই যে খাবারও তেজস্ক্রিয় হয়ে যাবে এ ধারণা কিন্তু ভুল। এইসব জনহিতকর কাজে তেজস্ক্রিয়তা ব্যবহার ক'রে দেখা যাচ্ছে বুদ্ধির বলে মানুষ দুষ্ট দৈত্যকেও বশ ক'রে কাজে লাগাতে সক্ষম।

চাষ-আবাদের কাজে তেজস্ক্রিয় ফসফরাসের ব্যবহার হলো এর আর একটি উদাহরণ। সাধারণ ফসফেট সার হিসেবে ব্যবহার করতে গেলে বহু পরিশ্রম করা দরকার। বার কয়েক চাষ ক'রে বেশ ভালোভাবে মাটির ভিতর ঢুকিয়ে দিতে হয় একে। এই কাজ যেমন শ্রমসাপেক্ষ তেমনি সময়সাপেক্ষ। কিন্তু তেজস্ক্রিয় ফসফরাস এই সারের সঙ্গে মিশিয়ে যদি জলের সঙ্গে গাছের গোড়ার ছিটিয়ে দেওয়া যায় তাহলে গাছ অতি সহজেই এই সার গ্রহণ করতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ ক'রে এই পদ্ধতিতে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে।

কোনো কোনো দেশে শস্যের বীজে অল্প পরিমাণে তেজরশ্মি প্রয়োগ ক'রে উন্নত ধরনের ফসল-উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এই নতুন উপায়ে বার্লি, গম, বীনস প্রভৃতির ভালো চাষ হয়েছে সুইডেন ও আমেরিকায়। শস্য-উৎপাদনের কাজে তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও আইসোটোপের প্রয়োগের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। ভবিষ্যতে নিশ্চয় এগুলি আরো নানা কাজে লাগাবার চেষ্টা হবে।

ট্রেসার

ইংরেজিতে ট্রেস করা মানে খোঁজা। সেইজন্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপকে সন্ধানের কাজে লাগান হলে তাকে বলা হয় ট্রেসার পদ্ধতি। কৃষি, উন্নত শস্য-উৎপাদন ও খাদ্য-সংরক্ষণ ছাড়াও এই পদ্ধতি শিল্প ও দ্রব্য উৎপাদনে নানারকমভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। মোটর গাড়ির পিস্টন, বেয়ারিং চলতে চলতে ক্ষয়ে যায় — কিন্তু ঠিক কত খানি গেলে কতটা ক্ষয়ে যায় তার মাপ নিরূপণ করা বেশ কঠিন। এই মাপার কাজে লাগান হলো তেজস্ক্রিয় আইসোটোপকে। প্রথমে পিস্টন রিং ও বেয়ারিংগুলি করা হলো তেজস্ক্রিয়। তারপর বিভিন্ন ধরনের লুব্রিকেটিং তেল নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা হলো কোন্ তেলে কতগুলি তেজস্ক্রিয় কণা পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং যন্ত্রের পক্ষে কোন্ তেল ভাল সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। গাড়ির টায়ারের রবার ক্ষয়ে যাওয়ার হারও এইভাবে সহজে পাওয়া যায়। তার জন্য গাড়িকে বারো হাজার মাইল দৌড় করাতে হয় না।

ধরা যাক মাইল খানেক লম্বা একটি জলের মেনপাইপে কোথাও লিক হয়েছে। এই লিক খুঁজে বার করা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার। জলের মধ্যে ছাড়া হলো কিছু তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট (কেননা কোবাল্ট জলকে তেজস্ক্রিয় করে না, অন্য কোনো তেজস্ক্রিয় ধাতুর জলে দ্রবীভূত হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে), তারপর তেজস্ক্রিয়তা মাপার যন্ত্র নিয়ে দেখতে হবে কোথাকার মাটি তেজস্ক্রিয় হয়েছে। যেখানে ফুটো থাকবে সেখান দিয়ে ঐ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সমেত জল বেরিয়ে আসবে।

তাছাড়া আরো আছে। ইস্পাতের পাত, যন্ত্রপাতি, নতুন তৈরি বাড়ি ইত্যাদিতে জোড়ের মুখে কোথাও ফাঁক থেকে গেল কিনা তাও ধরে দিতে সাহায্য করে আইসোটোপ। সাধারণ চোখে বা অন্য কোনো উপায়ে যা ধরা পড়া সম্ভব নয় সেইসব ক্ষেত্রে নির্ভুল সন্ধানীর মতো কাজ করতে পারে একমাত্র তেজস্ক্রিয় আইসোটোপই।

পরমাণুর গোয়েন্দাগিরি

কিছু কিছু রহস্যজনক মৃত্যুর ব্যাপারে পরমাণু-বিজ্ঞানের প্রয়োগ ক'রে অনেক আশ্চর্য সব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সাহিত্যের জগতে যেমন হ্যামলেটের বাবার মৃত্যু তেমনি ইতিহাসে অনেক রাজা-মহারাজা আছেন যাঁদের মৃত্যু গভীর রহস্যজালে জড়িত। রাজা-রাজড়াদের খাতির ক'রে মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া আধুনিক বিজ্ঞানের স্বভাব নয়। কিছুদিন আগে প্রশ্ন উঠেছিল ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যু নিয়ে। ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এতদিন পরে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করছেন যে হয়তো তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় চার্লসের কিমিয়া-বিদ্যায় অনুরাগ ছিল। মৃত্যুর পূর্বে কাটা তাঁর একগুচ্ছ চুল নিয়ে সম্প্রতি এক ইংরেজ বিজ্ঞানী তেজস্ক্রিয়-বিশ্লেষণ ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখেছেন সাধারণ লোকের চেয়ে তাঁর চুলে পারার পরিমাণ দশ গুণ বেশি, তবে পারার বিষে মৃত দুটি লোকের চুলের বিশ্লেষণ করে জানা যায় তার চেয়ে পারার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।

সাধারণ চোখে, অণুবীক্ষণ বা মাইক্রোকেমিস্ট্রিতে যেসব অপবস্তুর অস্তিত্ব ধরা পড়ে না পারমাণবিক রিঅ্যাকটরের নিউট্রন-রশ্মি দিয়ে তেজস্ক্রিয় করলে তার মধ্যে তিল পরিমাণের কোটি ভাগেরও একভাগ অপবস্তুর উপস্থিতি ধরা পড়তে বাধ্য।

কিছুদিন আগে, হুগলি নদীর গর্ভে পলিমাটি কেমনভাবে চলাচল করে, সেই সম্বন্ধে গবেষণা করা হচ্ছিল। বলা বাহুল্য এই সন্ধান-কার্যে প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় সোনার একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপকেই।

নোনাজলকে মিঠে করা

পরমাণু-শক্তিকে আর একটি চমকপ্রদ ভূমিকায় নামাবার কথা কিছুদিন থেকে শোনা যাচ্ছে। মেক্সিকো, ইজরায়েল, টিউনিসিয়া প্রভৃতি যে সমস্ত জায়গায় প্রচণ্ড জলাভাব সেখানে পারমাণবিক রিঅ্যাকটরের সাহায্যে সমুদ্রের নোনা জল পানীয় জলে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চলেছে। আমেরিকা ও রাশিয়ায় এই সম্পর্কে গবেষণাও হচ্ছে। নোনা জল মিষ্টি করবার উপায় দু' রকম। হয় ঠাণ্ডা ক'রে জল জমিয়ে নুন সরানো, নয় জল ফুটিয়ে পাতন করা। দু' ক্ষেত্রেই প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ-শক্তি এবং তা অতি অল্প মূল্যে পেতে হবে। গত দু' তিন বছরে রিঅ্যাকটর টেকনলজিতে অনেক নতুন সাফল্য এসেছে যার ফলে ইউরেনিয়মের দাম পড়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে নতুন ডিজাইনের ১০০০/২০০০ মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদনকারী পরমাণু-শক্তিকেন্দ্র থেকে অনেক সুলভে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। তখন ঐ সস্তার বিদ্যুৎ দিয়ে নোনা জল মিঠে করা যাবে এবং মিঠে জলের দাম মহার্ঘ হবে না। অদূর ভবিষ্যতে এমন সব প্ল্যাণ্ট তৈরি করার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে যেগুলি প্রত্যহ ৬০০ থেকে ১২০০ মেগাওয়াট বৈদ্যুতিক-ক্ষমতা উৎপন্ন করবে ও ৬০ থেকে ১৬০ মিলিয়ন গ্যালন (৩০০ থেকে ৮০০ মিলিয়ন লিটার) জল পাতিত করবে। এটা সম্ভব হলে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলি যে খুবই উপকৃত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

ভূকম্পবিদ্যা ও পারমাণবিক বিস্ফোরণ

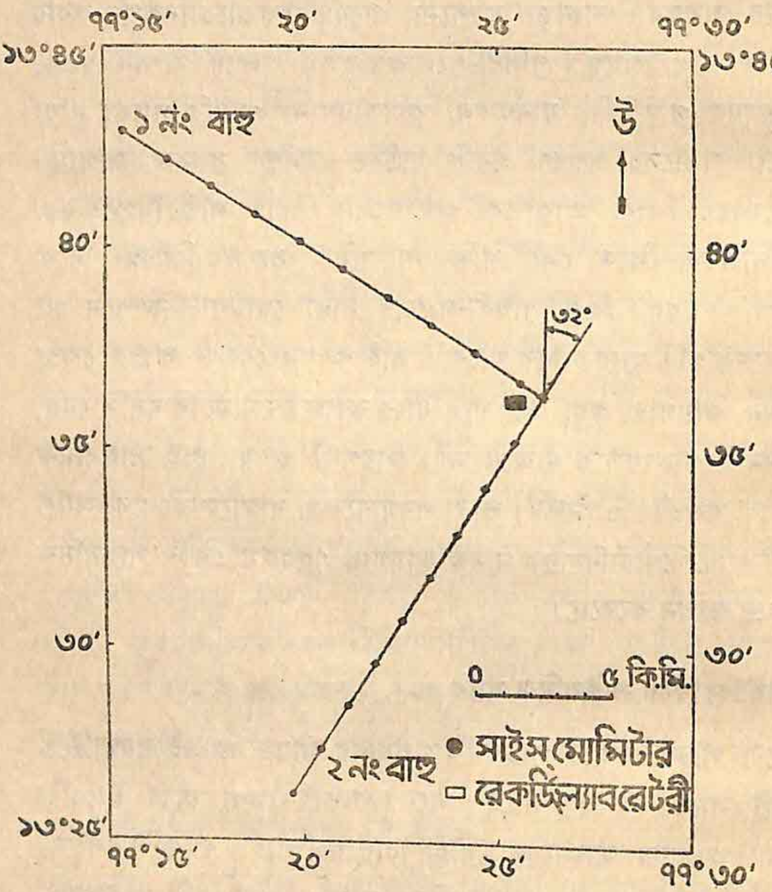
ভূমিকম্প ও পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অন্যান্য আলোড়ন সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান তার নাম সাইসমোলজি। পারমাণবিক যুগে হঠাৎ সাইস-মোলজির গুরুত্ব খুব বেড়ে গেছে। কারণ আর কিছু নয়—মাটির নিচে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে যে কম্পন সাইসমোগ্রাফে ধরা পড়ে তার সঙ্গে ভূকম্পজনিত কাঁপার আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য। এটা প্রথম ধরা পরে ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে আমেরিকার নিউ

মেক্সিকোতে যখন পরীক্ষামূলকভাবে অ্যাটম বোমার বিদারণ হল। অন্য কোনো দেশে মাটির তলায় গোপনে বোমা ফাটানো হলে তা ধরার একমাত্র উপায় এই সাইসমোগ্রাফ। অবশ্য সাধারণ সাইসমো-গ্রাফে দশ হাজার কিলোমিটার দূরের কেন্দ্র থেকে আসা সাইসমিক তরঙ্গের ঢেউ আসে খুবই ক্ষীণভাবে এবং এলেও তার বৈশিষ্ট্য বোঝা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া কম্পনের প্রকৃতি ঠিকভাবে নিরূপণ করার আরো বাধা আছে। পৃথিবী-পৃষ্ঠে কত রকম কারণে কম্পন হচ্ছে, মানুষের গতিবিধি, যানবাহন, কলকারখানা এমনকি গাছের মধ্যে দিয়ে বাতাসের সঞ্চরণ অবধি মাটিতে অদৃশ্য কম্পন জাগায়। বিস্ফোরণ কিংবা প্রাকৃতিক আলোড়নে বিরাট শক্তি নিঃসৃত হয়, উৎপত্তিস্থল থেকে সেই শক্তি সাইসমিক তরঙ্গে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু পৃথিবী-গাত্রের নানা ছোটখাট কম্পনে এই তরঙ্গের গতি ব্যাহত হয়ে থাকে। তাই কম্পন রেকর্ড করার কেন্দ্র এমন জায়গায় করা হয় যার ধারে কাছে জনমানবের বসতি নেই, এমনকি গাছপালাও থাকবে না। জায়গাটি হওয়া চাই 'সাইসমিক ভাবে' শব্দহীন ও নির্জন। ভাবা পরমাণুকেন্দ্র বাঙ্গালোর থেকে আশি মাইল দূরে গৌরীবিদানুর নামক জায়গায় এইরকম একটি সাইসমিক কেন্দ্র স্থাপন করেছে।

গৌরীবিদানুরে সাইসমিক সারি

দৈর্ঘ্যে পঁচিশ ও প্রস্থে পঁচিশ কিলোমিটার আয়তনের এইজায়গাটিতে ২০টি সেনসর যন্ত্র চালু আছে। পরের পাতায় দেখা যাবে ইংরেজি 'এল' অক্ষরের আকারের গৌরীবিদানুরের গ্রাহক যন্ত্রগুলি বসানো আছে। একে বলা হয় সাইসমিক সারি। প্রত্যেকটি সাইসমো-মিটার স্টিলের পাত্রে মাটির তলায় পাথরের মধ্যে এঁটে বসানো আছে। একটি বৈদ্যুতিক প্রেরক ইউনিট সাইসমোমিটারের আউটপুট বহুগুণে বর্ধিত ক'রে তাকে তারের মধ্যে দিয়ে একটি রেকর্ডিং ল্যাবরেটরিতে পাঠায়। ঐ রেকর্ডিং ল্যাবরেটরিতে সংকেত-

গুলি আলাদা ক'রে চৌম্বক-ফিতায় রেকর্ড করা হয়। যাতে পরে ঐগুলি ইচ্ছামতো বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যেতে পারে। সাইসমিক চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে সময়েরও হিসাব রাখা হয় কেননা সময়ের মানদণ্ড ছাড়া এইসব রেকর্ড অর্থহীন।



সাইসমিক সারির প্রত্যেকটি বাহুতে দশটি ক'রে সাইসমোমিটার বসানো আছে। প্রত্যেকটির দূরত্ব পাশেরটির থেকে আড়াই কিলোমিটার। প্রত্যেকটি সাইসমোমিটার সিগন্যাল একত্রে যোগ ক'রে যে সংকেত পাওয়া যাবে তা হবে যে কোনো একটি সাইসমোমিটারের

চেয়ে দশগুণ বেশি শক্তিশালী। সুতরাং কি উৎস থেকে ঐ তরঙ্গের উৎপত্তি সেটাও নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

ভূমিকম্প ও বিস্ফোরণ দু'এর ফলেই যে আলোড়ন ওঠে তা সাইসমোগ্রাফে ধরা পড়ে। কিন্তু এই ধরনের কম্পনে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও অনেক প্রকৃতিগত পার্থক্যও আছে। ভূমিকম্পের ফলে যে শক্তি নির্গত হয় তার ফলে আলোড়ন একটা বিশেষ দিকে অগ্রসর হয় কিন্তু বিস্ফোরণজাত শক্তি চারিদিকে এলোমেলোভাবে ছিটিয়ে যায়। তাছাড়া ভূমিকম্পের প্রথম ধাক্কার পরে পর-পর আরো কয়েকটি ধাক্কা আসে যাকে বলা হয় আফটার-শক। কিন্তু বোমা ফাটবার পর ধাক্কা একবারই হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, পরে আর কোনো ধাক্কা আসে না। পৃথিবী-গর্ভের আলোড়ন পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে ভূমিকম্পের ফলে উদ্ভূত আলোড়নের প্রকৃতি অনেক বিচিত্র ও জটিল। বোমার আলোড়ন সে তুলনায় সহজবোধ্য।

গৌরীবিদানুরের এই সাইসমিক কেন্দ্র এখনই তিন হাজার কিলোমিটার দূরবর্তী কেন্দ্রের কম্পন নিখুঁতভাবে ধরতে পারে। এই ব্যবস্থা আরো নিখুঁত করার চেষ্টা হচ্ছে। এখানে যেসব বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে তা ভূমিকম্পের কারণ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে জানবারও বিশিষ্ট উপায় এটি। সবচেয়ে দরকারী কথা, এর দ্বারা বহু দূর দূরে কোথায় মাটির তলায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ হচ্ছে তাও নির্ভুলভাবে বলা যাবে। বর্তমানে এই সব সংবাদের গুরুত্ব যে খুবই বেশি সে কথা বলাই বাহুল্য।

একাদশ অধ্যায়

পরমাণু ও আমরা

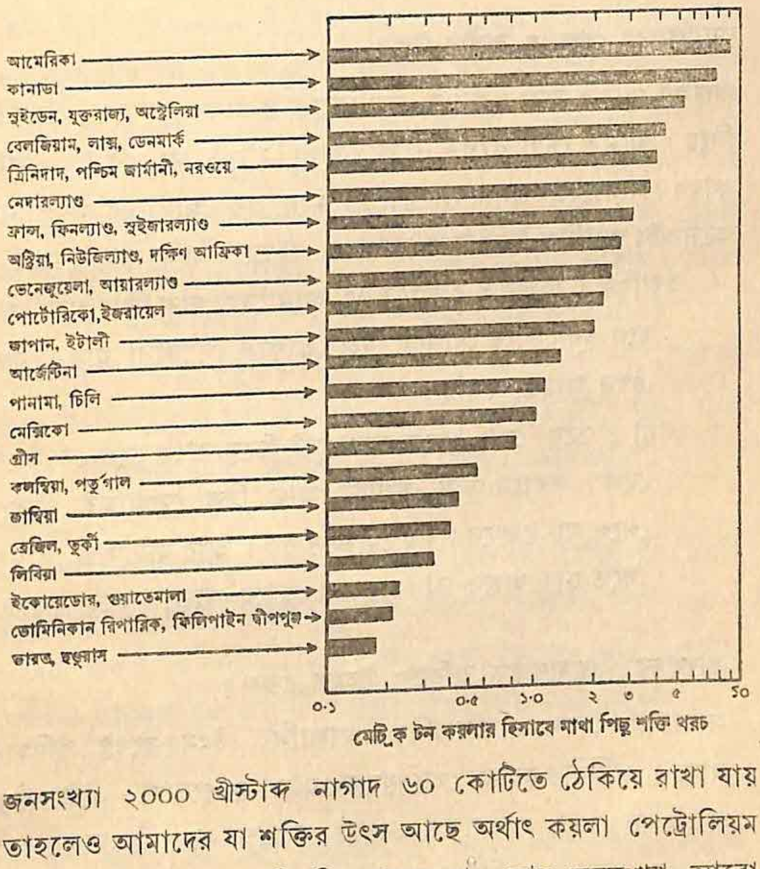
একমাত্র পথ

১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম জেনিভাতে শান্তির জন্য পরমাণু নামে যে আন্তর্জাতিক বৈঠক বসে ভারতের হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা তাতে সভাপতি হিসেবে পরমাণুর অন্য অনেকগুলি সম্ভাবনার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। এ বিষয়ে ভারত যে ভেবেছিল সেটা নেহাত নিঃস্বার্থ-ভাবে নয়। পরমাণুর সঙ্গে আমাদের স্বার্থ কোনখানে জড়িত? আজকের ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বলবেন পরমাণু-শক্তিই হলো আমাদের বাঁচার একমাত্র পথ। কথাটা খুব জোরের সঙ্গেই তাঁরা বলেন। পরমাণু-বোমাকে ঠিক বেঁচে থাকার পথ বলা যায় না। যদিও অনেকে মনে করেন রাজনীতিক্ষেত্রে টিকে থাকার হাতিয়ার হিসেবে পরমাণু-বোমা অপরিহার্য। কিন্তু এখন আমরা অপরকে ভয় দেখিয়ে বেঁচে থাকার মতো পরোক্ষ প্রয়োগের কথা বলছি না। সুখে-স্বচ্ছন্দে এবং শান্তিতে বেঁচে থাকার জন্য পরমাণুর কি প্রত্যক্ষ ভূমিকা, বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে?

বোমা না বিদ্যুৎ

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ কতটা? অন্যদের তুলনায় বেশি না কম? উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট কাঁচা মাল কি আমাদের আছে? না থাকলে আবার আমদানি করার ব্যবস্থা করতে হবে — সে তো বড় খরচের ব্যাপার। পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ হোমি সেথনা ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে জগদীশ-বোস-স্মৃতি-বক্তৃতা দেবার সময় কলকাতায় বলেছিলেন প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়েও দরকারী জিনিস হলো হাতের কাছে সুলভে শক্তি পাওয়া যাচ্ছে কিনা সেইটা দেখা।

এদিক দিয়ে হিসেব করলে ভারতের অবস্থা কি? দেখা গেছে মাথা-পিছু ইউরোপে যতটা ক'রে কয়লা খরচ হচ্ছে — ভারত এবং সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে খরচ হচ্ছে তার এক-দশমাংশ। অঙ্কে না বলে সহজ বাংলাতে বলতে গেলে এর অর্থ আমাদের জীবনযাত্রার ধরন অনুন্নত। সেজন্যই শক্তি খরচ কম। কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে শক্তি খরচের হার কম বলেই জীবন-ধারার মানের এই অবস্থা। শুধু এইটুকু বললেই সব বলা হয়ে যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা রিপোর্ট করেছেন যে যদি কোনো কৌশলে ভারতের



জনসংখ্যা ২000 খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ৬0 কোটিতে ঠেকিয়ে রাখা যায় তাহলেও আমাদের যা শক্তির উৎস আছে অর্থাৎ কয়লা পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি ফুরিয়ে যেতে বেশি দিন লাগবে না। আর জনসংখ্যা আরো বাড়লে (সেটারই সম্ভাবনা বেশি) তো আর কথাই সেই। সুতরাং

দেখা যাচ্ছে কি ? আমাদের শক্তি খরচের পরিমাণ যে শুধু কম তাই নয়, চাইলেও আমাদের পক্ষে বেশি শক্তি খরচের উপায় নেই। কেননা বিদ্যুৎ তৈরি হবে যা থেকে সেই কাঁচামালেরই টানাটানি। কথাটা আরো স্পষ্ট হবে যদি জানা যায় কত শক্তি আমরা এখন খরচ করি এবং অন্যান্য দেশেই বা কত শক্তি খরচ হয়। আগের ছবি থেকে তার আন্দাজ পাওয়া যাবে। বিভিন্ন দেশে মাথা-পিছু কত মেট্রিক টন কয়লা বছরে পোড়ানো হয় তার একটা মোটামুটি হিসেব দেওয়া আছে পূর্ব পৃষ্ঠার ছবিতে।

অ্যালিসের প্রশ্ন ও রানীর উত্তর

অন্যসব দেশের সঙ্গে তুলনায় দেখা যাচ্ছে ভারতের অবস্থা অনেকটা নিচে। অনেক চেষ্টা করেও একে তোলা যাচ্ছে না কেন ? একটা কারণ আমাদের জনসংখ্যা-স্ফীতি। মনে হয় আমাদের অবস্থাটাই অনেকটা অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

অ্যালিস (হাঁপাতে হাঁপাতে) : আমাদের দেশে কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে খুব জোরে দৌড়লে অন্য কোথাও পৌঁছনো যায়, যেমন এখন আমরা করছি।

রানী : তবে তো বলতে হবে খুবই ঢিমে তালে চলে তোমাদের দেশ। এখানে তুমি যেখানে আছ ঠিক সেখানেই থাকতে গেলে যত জোরে সম্ভব দৌড়তে হয়। আর যদি অন্য কোথাও যেতে চাও অন্তত তারও দু'গুণ জোরে দৌড়তে হবে, বুঝলে ?

ভারতের পারমাণবিক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কেন ?

আমাদের দেশে পারমাণবিক জ্বালানির উৎস যথেষ্ট পরিমাণে আছে। পৃথিবীর বৃহত্তম থোরিয়ম সঞ্চয় আছে এদেশে — ইউরেনিয়ম যা আছে তার পরিমাণও নেহাত সামান্য নয়। ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে অল্পদিনের মধ্যেই আমরা শক্তি উৎপাদনের দিক দিয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব।

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্র উপকূলে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে মোনা-জাইট আবিষ্কৃত হয়। এখানে বালির সঙ্গে মেশানো আছে মোনা-জাইট। এই বালির রং কালো। বালির মধ্যে মোনাজাইট ছাড়াও আছে ইলমেনাইট, সিলিমানাইট, জারকন প্রভৃতি। এই জায়গাটা এখন কেরালার মধ্যে পড়ে। মাদ্রাজেও এইরকম একটি উৎসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু কেরালার মোনাজাইট ক্ষেত্রটিই বড় এবং বড় বললেই সব বলা হলো না, এটি পৃথিবীর বৃহত্তম মোনাজাইট ক্ষেত্র। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে অবশ্য পারমাণবিক-বিভাজন ব্যাপারটি জানা ছিল না। তবে ইলমেনাইটের নানারকম ব্যবহার আছে, বিশেষ ক'রে রঙ ও প্লাস্টিক শিল্পে। কয়েকটি বিলিতি কোম্পানি এই বালি বিদেশে রপ্তানি ক'রে বেশ লাভের ব্যবসা চালাচ্ছিলেন। মোনাজাইটের মধ্যে আছে শতকরা ৩ ভাগ ইউরেনিয়ম ও ৭ ভাগ থোরিয়ম। কিন্তু ইউরেনিয়মের গুরুত্ব তখন জানা না থাকায় দেশ থেকে এত মোনা-জাইট বাইরে চালান যাওয়া নিয়ে কোনো কথাই ওঠেনি। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে ৫ হাজার টন মোনাজাইট বাইরে রপ্তানি হয়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে যখন পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কাজে থোরিয়ম ও ইউরেনিয়মের গুরুত্ব জানা গেল তখন থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। মোনাজাইট রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেল অবিলম্বে।

তারপর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অ্যাটমিক মিনারেলস ডিভিসান বলে পরমাণু শক্তি দপ্তরের একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হলো। এঁদের একটি খনি-বিভাগও আছে। এঁরা দেশের আর কোথায় কোথায় পারমাণবিক জ্বালানির সঞ্চয় আছে তার সন্ধান করলেন।

জল-বিদ্যুৎ থেকে লাভ নেই কেন?

যে দেশে অসংখ্য নদী এবং প্রবহমান জল মানেই শক্তির উৎস সেদেশে আমরা মিছে বিদ্যুতের কাঁচামাল নিয়ে ভেবে মরি কেন—এমনও মনে হতে পারে। মনে হওয়াটা কিছু অযৌক্তিক নয়। হিমালয় থেকে

যত নদী নেমেছে বা পূর্বঘাট অঞ্চলে যত নদী প্রবাহিত তার কত পরিমাণ আটকে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে? এখন ভারতে যত শক্তি উৎপাদন হচ্ছে তার ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ আসে জলশক্তি থেকে। কিন্তু যেসব নদী বর্ষার জলের উপর নির্ভরশীল সেসব জায়গায় অনাবৃষ্টির বছরে সমূহ বিপদ দেখা দিয়েছে। মৌসুমী বায়ুর স্বভাব বড় চপল, তার দাক্ষিণ্যেরও কোনো স্থিরতা নেই। ফলে ১৯৬১-৬৬-র মধ্যে কেরল রাজ্যেই অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে শক্তি উৎপাদনে যথেষ্ট অসুবিধা ও তার জন্য বহু টাকার লোকসান হয়েছে—কেননা কেরল শক্তির জন্য বহুলাংশে জল-বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রকৃতির খামখেয়ালের উপর ভরসা ক'রে পরিকল্পনা করলে তার কি ফল তা সহজেই দেখা যাচ্ছে। শুধু কেরল নয় দিল্লি, পাঞ্জাব ও রাজস্থানেও একই সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

জল-বিদ্যুতের অন্যতম সুবিধা হলো এর খরচ কম। ভারতের অন্যত্র শক্তি-উৎপাদন-মূল্য প্রতি কিলোওয়াট-ঘণ্টা ৫ পয়সা বা তার চেয়ে বেশি। কেবলমাত্র যেসব জায়গায় জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সেখানে উৎপাদনের খরচ এর থেকে কম। কিন্তু তা হলে কি হবে, এই বিদ্যুৎ বেশি দূরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই এর দ্বারা স্থানীয় উপকারের বেশি আর কিছু হতে পারে না।

কত শক্তি চাই?

জল-বিদ্যুৎ, কয়লা না পরমাণু, শক্তি কোথা থেকে আসবে সে আলোচনা সুরু করার আগে আমাদের দেশে শক্তি কি পরিমাণে খরচ করা হচ্ছে তার একটা ধারণা করা যাক। নিচের তালিকায় গত ২৫ বছরে দেশের বিদ্যুৎ-উৎপাদন ক্ষমতা ও বিদ্যুৎ শক্তি খরচের হার দেখান হলো :

	স্থাপিত বিদ্যুৎ-ক্ষমতা কোটি কিলোওয়াট	উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তি কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা
১৯৫০	০·২২	
১৯৫৬	০·৩৪	
১৯৬০-৬১	০·৫৭	১৬৯৩·০
১৯৬৫-৬৬	১·০২	৩২৯৯·০
১৯৬৯-৭০	১·৫৫	৫১৪৪·১
১৯৭০-৭১	১·৬৫	৫৫৭৭·২
১৯৭৫	২·৪	
১৯৭৯	৪·২ (অনুমান)	

১৯৭১ সালে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি হয়েছিল

কয়লা ও স্টীম থেকে	২৮৫৭·৯	কোটি কি-ও-ঘ
পেট্রোল ডিজেল ও গ্যাস থেকে	২৯·৬	”
জলবিদ্যুৎ থেকে	২৪৪৭·৬	”
পরমাণু শক্তি থেকে	২৪২·১	”
মোট	৫৫৭৭·২	”

স্থাপিত বিদ্যুৎক্ষমতা বলতে বোঝায় শক্তি কেন্দ্রে মোট ক্ষমতা কত। যেমন ব্যাণ্ডেলে যে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি আছে বর্তমানে তার ক্ষমতা ৪০০ মেগাওয়াট। পুরো ক্ষমতায় চালালে সেটি প্রতি ঘণ্টায় ৪০০ মেগাওয়াট-ঘণ্টা শক্তি সরবরাহ করবে। কিন্তু কোনো কেন্দ্রই পুরো ক্ষমতায় চলতে পারে না। ৬০ শতাংশ ক্ষমতায় চললেই যথেষ্ট মনে করা হয়। ১৯৭৯ সালে মনে করা হয় ৪·২ কোটি কিলোওয়াট স্থাপিত বিদ্যুৎক্ষমতা দরকার হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও জ্বালানির অন্যান্য অনেক প্রয়োজন, বিশেষ করে কয়লা, পেট্রোল ও ডিজেলের। তার চাহিদা এখন কত ও পরে কত হতে পারে পরের পাতার তালিকায় দেওয়া হল :

প্রয়োজনীয় জ্বালানি ও শক্তির চাহিদা
(সমতুল্য কয়লার কোটি টন অনুপাতে)

বছর	কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদন বাদে	পেট্রোল/ডিজেল বিদ্যুৎ উৎপাদন বাদে	বিদ্যুৎশক্তি	মোট
১৯৭০-৭১	৫·১৩৫	৯·৭১৯	৪·৮৬৫	১৯·৭২
১৯৭৮-৭৯	৯·৫৭৫	১৭·৮৫৮	৯·৭১৯	৩৭·৩০
১৯৮৩-৮৪	১০·০৬৮	২৫·১০৭	১৪·৫৭৩	৫৩·৭৩৯
১৯৯০-৯১	২০·০২৯	২৪·২৪৬	৮৬·৮২০	৮৭·১৯০

এসব হিসেব যখন হয় তখন পেট্রোল সমস্যা দেখা দেয় নি। আমাদের দেশের খনিজ তেল সঞ্চয় খুব সামান্য। প্রায় সবটাই বিদেশী মুদ্রায় কিনতে হয়। তাই পেট্রোলের দাম হঠাৎ অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাওয়াতে আমাদের দেশে এবং অন্য উন্নতিকামী দেশে বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। যদি বম্বে হাই এবং কলিকাতা হাই থেকে প্রয়োজন মত পেট্রোলিয়ম না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের সেই ভাবে প্রস্তুত হতে হবে। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ছাড়াও কয়লা ও পেট্রোলের এত প্রয়োজন যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে সেগুলি যত কম ব্যবহার করা যায় ততই মঙ্গল। দেখা যাক সেটা সম্ভব কিনা।

জল-বিদ্যুৎ কতটা পাওয়া যাবে ?

আমাদের দেশের মোট সম্ভাব্য জল-বিদ্যুতের স্থাপিত-ক্ষমতার পরিমাণ ৪·১ কোটি কি-ও। যেসব উৎস এখনো কাজে লাগানো হয় নি তাদের অবস্থান এইরকম :

আসামে— ১·৩৩ কোটি কি-ও
নেপালের কাছাকাছি—০·৭৫ কোটি কি-ও
অন্যত্র— ১·৮ কোটি কি-ও

আসামে বা নেপালের কাছে যে শক্তির উৎস আছে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সমীচীন নয়।

তাই আমাদের হাতে থাকে ১·৮ কোটি কি-ও স্থাপিত-ক্ষমতার জলশক্তি।

কয়লার অবস্থা কি ?

আমাদের দেশে কয়লার সঞ্চয় ১০,৬০০ কোটি টন। এখন প্রতি বছর তোলা সম্ভব হয় ৭·০ কোটি টন। এর মধ্যে ২৩ শতাংশ অর্থাৎ ১·৬ কোটি টন যায় শক্তি-উৎপাদনে। আশা করা হচ্ছে ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে ১০-১২ কোটি টন তোলা হবে এবং তার মধ্যে ৩·০ কোটি টন শক্তি উৎপাদনে খরচ করা হলে পাওয়া যাবে অনুমান ১·২ কোটি কিলো-ওয়াট তুল্য বিদ্যুৎক্ষমতা। সুতরাং জলশক্তি ও কয়লা মিলে হ'ল ৩·০ কোটি কি-ও। তাই ১৯৮০ নাগাদ ৪·২-৩·০ অর্থাৎ ১·২ কোটি কি-ও স্থাপিত বিদ্যুৎ ক্ষমতার জন্য পরমাণুশক্তি বা অন্য কোনো বিকল্পের দ্বারস্থ হতেই হবে। এছাড়া উপায় নেই। তারাপুর শক্তিকেন্দ্র তৈরি করার খরচের প্রশ্ন তুলে যখন অনেকে আপত্তি করেছিলেন তখন ডক্টর ভাবা বলতেন: 'শক্তির অভাবই হ'ল সবচেয়ে বেশি খরচের ব্যাপার'।

পরমাণুই ভরসা

১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে প্রথম ঠিক হলো পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র দেশে তৈরি হোক। ঠিক হবার দশ বছরের মধ্যে চালু হলো তারাপুর। তারাপুর কেন বেছে নেওয়া হলো তার কতকগুলি যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। যেহেতু আমরা রানীগঞ্জ ঝরিয়া ইত্যাদি কয়লাখনি অঞ্চলের কাছাকাছি আছি একথা ভুলে যাই যে ভারতের মতো বিরাট দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার খনি অঞ্চল খুব নিকট নয়। এই অঞ্চল ছাড়া উল্লেখযোগ্য সঞ্চয় আছে মধ্য ভারতে। এ ছাড়া পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে বিশেষ কোনো কয়লার সঞ্চয় নেই। ট্রেনে ক'রে কয়লা বয়ে নিয়ে যেতে হয় ৮০০ থেকে ২০০০ কিলো-মিটার পর্যন্ত। এই পরিবহণ-সমস্যা যে ভারতের মতো বিরাট দেশে

কি বিরাট আকার নিতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। অনেকের মতে সমস্ত পথ ট্রেনে না নিয়ে গিয়ে যদি জলপথে কয়লা স্থানান্তর করা হয় এবং সমস্ত উপকূল জুড়ে রেললাইন পেতে জাহাজ থেকে উৎপাদন-কেন্দ্রে কয়লা নিয়ে নেওয়া যায় তাহলে হয়ত খরচ কিছুটা কমে। কিন্তু কিছু কমলেও খরচ সেই বেশিই থেকে যাচ্ছে। কাজেই পরমাণু-শক্তির স্বপক্ষে এটাও আর একটা যুক্তি।

তারাপুর কেন ?

প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ-কেন্দ্র কোথায় করা হবে এই নিয়ে কাঠ-খড় পোড়ানো বড় কম হয়নি। বোম্বাই থেকে বরোদার মধ্যে কুড়িটি জায়গার মধ্যে বেছে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ধার্য হলো তারাপুর। এই সমস্ত অঞ্চলে শক্তির চাহিদা বেশি এবং কয়লাখনি থেকে দূরত্বও বেশি। জায়গা এমন হওয়া চাই যেখানে কাছাকাছি জলের সরবরাহ প্রচুর — দিনে ৫৩ কোটি গ্যালন এবং সে জলে পলিমাটির পরিমাণ হওয়া চাই খুব কম। এছাড়া চাই শক্ত জমি, উপযুক্ত আবহাওয়া, এবং ধারে-কাছে বিদ্যুৎ-পরিবহণের উপযোগী ব্যবস্থা। এইসব অনুকূল পরিবেশ পাওয়া গেল তারাপুরে।

দশ বছর অপেক্ষার কারণ কি ?

পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ বার করা যে যার-তার কর্ম নয় সেকথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। সাধারণ বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রের সঙ্গে এর এখানেই তফাৎ। বাইরে থেকে পারমাণবিক জ্বালানি আমদানি ক'রে বিদেশী কলা-কুশলীদের সাহায্যে পাওয়ার-রিঅ্যাকটর বসিয়ে দিলেই কাজ শেষ হচ্ছে না — যতক্ষণ পর্যন্ত পারমাণবিক বিজ্ঞান ও কলা-কৌশলকে আয়ত্তে আনা না হচ্ছে ততক্ষণ এরকম কোনো শক্তিকেন্দ্রে হাত দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। কাজেই এরকম একটা পরিকল্পনা করা হলো যাতে তারাপুর চালু হতে হতে ইতিমধ্যে

দেশেই পারমাণবিক বিজ্ঞানের ভিত্তি বেশ শক্ত গাঁথুনির উপর তৈরি হয়ে যায়। গবেষণা ও শিল্পের জন্য ট্রম্বেতে কাজ আরম্ভ হলো। অবশ্য তার বহু আগেই কলকাতায় নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের চর্চা আরম্ভ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দু-একটি ঐতিহাসিক তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। যতদূর জানা আছে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে প্রথম ভারতীয় গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয় এলাহাবাদ থেকে ১৯৩৪ সনে মেঘনাদ সাহা ও ডি এস কোঠারি কর্তৃক — বিটা-কণা ক্ষয় সম্বন্ধে। কসমিক-রশ্মি নিয়ে গবেষণা-পত্র বেরোয় বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের দার্জিলিং-গবেষণাগার থেকে ১৯৩৬ সনে — অধ্যাপক ডি এম বসুর অধীনে তাঁর সহকর্মী রাধেশচন্দ্র ঘোষের। তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে প্রথম ভারতীয় গবেষণা-পত্র ছিল পরেশ সেন-চৌধুরীর (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) — রুবিডিয়মে বিটা-তেজস্ক্রিয়তা, ১৯৪২ সনে। ভারতীয় খনিজে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা প্রথম নিরূপণ করেন বি ডি নাগচৌধুরী, সুধাংশু দাস ও অরুণ দাশগুপ্ত ১৯৪৩ সনে। কিন্তু এ সবই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরমাণু-শক্তিকে বৃহত্তর ভূমিকায় নামাবার জন্য যে রাজসূয় যজ্ঞের প্রয়োজন তার প্রস্তুতি শুরু হলো ট্রম্বেতে — ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে পরমাণু-শক্তি-দপ্তর স্থাপনের পর। তার দশ বছর পরে ১৯৬৪-তে তারাপুরে রিঅ্যাকটরের কাজ শুরু হয়। ১৯৬৯-এর শেষে তারাপুর চালু হয়।

আমাদের শুধু যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ দরকার তাই নয়, খুব তাড়াতাড়ি চাই — যার জন্য তারাপুর শুধু সূচনা মাত্র, এর পরে ক্রমে রানাপ্রতাপ সাগর, কলপক্কম ও পরে নারোরা। আরো অনেক শক্তি-কেন্দ্র খুলতে হবে। ভাবার পরিকল্পনা ছিল বছরে একটি। তারাপুরে সময় সংক্ষেপ করার জন্য পৃথিবী জুড়ে টেণ্ডার ডাকা হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এল দুটি, দুটি যুক্তরাজ্য ও একটি ফ্রান্স থেকে। এর মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত বয়লিং ওয়াটার চুল্লি, কারণ প্রধানত এতে খরচ কম পড়ল। তবে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ ক্রমে কমিয়ে তৃতীয় শক্তিকেন্দ্র কলপক্কমে একে-

বারে সম্পূর্ণরূপে দেশে তৈরি হবে—এমনই ঠিক হয়েছে। অবশ্য তারাপুরের কেন্দ্র তাড়াতাড়ি চালু করার জন্য বেশ মোটা রকম দাম দিতে হয়েছে—কিন্তু হাতে-কলমে কাজ শেখার ব্যবস্থা ও তার সঙ্গে আমাদের প্রয়োজন মেটানো—এই এক ঢিলে দুই পাখি মারার ব্যবস্থা এইভাবেই করা হয়। বিদেশ থেকে সব কিনে কাজ চালানোর প্রবণতা যেমন দেশের অর্থনীতির দিক দিয়ে ক্ষতিকর—তেমনই কেউ যদি উৎকট দেশপ্রেমের বশবর্তী হয়ে বলে বসেন যে-কোনো বিদেশী বস্তুই পরিত্যাজ্য—সুতরাং যতদিনে আমাদের টেকনোলজি ও দেশী শিল্প প্রত্যেকটি নাটবোল্ট থেকে শুরু ক'রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলকব্জা সমেত রিঅ্যাকটর তৈরির যোগ্য না হবে ততদিন আমাদের পক্ষে দেরি করাই উচিত ছিল—না হয় তার জন্য আরো বছর দশেক দেরি হতো—সেটাও আমাদের স্বার্থের পক্ষে খুব অনুকূল হতো না। একে তো মহারাষ্ট্র-গুজরাটে ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ সংকট শুরু হয়ে গিয়েছিল—তারাপুর কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাবার আগে ওখানকার কলকারখানা এমন কি বাড়ি বাড়িতেও বিদ্যুতের রেশনিং ব্যবস্থা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। আবার অন্যদিকে কারিগরি কলা-কৌশলের কাজে একে অপরকে সাহায্য না ক'রে আজকের পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই অসম্ভব। সুতরাং বিদেশী সহযোগিতা মানেই অন্যায় কিছু নয়। অনেক ক্ষেত্রে সেটা আপাতদৃষ্টিতে খরচসাপেক্ষ হলেও যে সময় বাঁচিয়ে দিচ্ছে তার মূল্যও কিছু কম নয়।

পরমাণু-বিদ্যুতের বৈশিষ্ট্য কি?

শক্তি-উৎপাদনের মূল কৌশল হলো যেনতেনপ্রকারেণ একটি টারবাইন ঘোরানো। এই টারবাইন হাওয়ার বেগেই চলুক বা পড়ন্ত জলস্রোতের চাপেই ঘুরুক এর আসল কাজ জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। টারবাইন চালাবার শক্তির উৎস আছে মোটামুটি তিনরকম—জলশক্তি, রাসায়নিক শক্তি ও পারমাণবিক শক্তি। জলশক্তি হতে পারে স্বাভাবিক, যেমন জলপ্রপাত থেকে

কিংবা মানুষের হাতে তৈরি বাঁধ ও জলাধার থেকে ছাড়া জল দিয়ে। রাসায়নিক শক্তি আছে কয়লা, পেট্রোলিয়ম থেকে আর পারমাণবিক শক্তি আসছে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে বিভাজন ঘটিয়ে। এখন জ্বালানি হিসেবে পরমাণু তুলনাহীন, তার কারণ — রাসায়নিক জ্বালানির তুলনায় বহু গুণ কম পরিমাণে পারমাণবিক জ্বালানি দিয়ে শক্তি উৎপন্ন করা যায়। আমাদের যে কোনো কয়লা-চালিত শক্তিকেন্দ্রে প্রতি কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য লাগে ১·১৬ পাউণ্ড কয়লা। আর তারাপুরে ১·১৬ পাউণ্ড পারমাণবিক জ্বালানি থেকে হবে ৮৩,০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন।

রান্নাঘরে রিঅ্যাকটর ?

রিঅ্যাকটর যাকে বাংলা খবরের কাগজের ভাষায় বলে চুল্লি শুনলেই মনে একটা অন্যরকম ছবি জাগে। মনে হয় পরমাণুর আগুনে যে চুল্লি জ্বলছে তাতে কিছু রান্না চড়িয়ে দিলেই হলো। জেনিভাতে যে বছর 'শান্তির জন্য পরমাণু' বৈঠক বসেছিল একজন সুইস ভদ্র-মহিলা খবরের কাগজে পরমাণু চুল্লি বৃত্তান্ত পড়ে জানতে চাইলেন কোথায় একটু ইউরেনিয়ম পাওয়া যাবে, তাঁর খুবই প্রয়োজন। 'আপনি ইউরেনিয়ম নিয়ে কি করবেন' — পরমাণু বিশেষজ্ঞরা জানতে চাইলেন। 'কেন, শোনা যাচ্ছে আজকাল কয়লার বদলে ইউরেনিয়ম জ্বালিয়ে রান্না করা হচ্ছে।' 'সেকি — ইউরেনিয়মের জন্য তো রিঅ্যাকটর চাই'। 'বেশ তাহলে আমাকে একটা রিঅ্যাকটরই দিন'। 'কিন্তু তার যে অনেক দাম'। 'দামের কথা বললেন, আমার মাসে কয়লার খরচ কত তা যদি জানতেন।'

রিঅ্যাকটরে কি থাকে ?

পারমাণবিক বিভাজন করার জন্য যে বিশেষ যন্ত্র চাই তাকেই বলা হয় রিঅ্যাকটর। এর মধ্যে আছে (১) জ্বালানি বা কোর, (২) মডারেটর, (৩) ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা ও (৪) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

(১) জ্বালানি যে সব ক্ষেত্রে ইউরেনিয়ম হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তারাপুরে, আগেই বলা হয়েছে, বাইরে থেকে ইউরেনিয়ম আমদানি করতে হচ্ছে। এই ইউরেনিয়মে থাকে বিভাজনক্ষম ^{235}U যা স্বাভাবিক অবস্থায় খুব একটা পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে থোরিয়ম ও ইউরেনিয়মের যে সঞ্চয় আছে রিঅ্যাকটরগুলিতে তাদের জ্বালানি হিসেবে চালাবার চেষ্টা চলছে। ইউরেনিয়ম-চালিত রিঅ্যাকটরে প্লুটোনিয়ম তৈরি করা সম্ভব। এই প্লুটোনিয়ম উন্নত ধরনের রিঅ্যাকটরে তখন জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। সংক্ষেপে এই হলো আমাদের পারমাণবিক পরিকল্পনা।

(২) বিভাজন হলে কিছু সংখ্যক নিউট্রন ছিটকে বেরোয়— প্রচণ্ড সেই ছিটকে বেরিয়ে আসার বেগ। অবশ্য আশেপাশের জিনিসে ধাক্কা লেগে সেই বেগ কমে আসে। কমানোটা আবার আরো বিভাজনের খাতিরে দরকার কেন না বিভাজন শুধু একটা হলেই তো হচ্ছে না, একের পর এক বিভাজন হয়ে যেতে হবে। নিউট্রনদের তাই অতিরিক্ত বেগ বা অতি ধীরে যেমন-তেমনভাবে এলে চলবে না—বিভাজনের জন্য যেমনটি চাই ঠিক তেমনভাবে আসতে হবে। নিউট্রনদের আচারব্যবহার সংযত করার জন্য নানা রকম প্রক্রিয়া আছে। কিছু-কিছু জিনিস নিউট্রনের বেগ কমিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে, অথচ নিউট্রন গ্রাস ক'রে নেয় না। এদের বলা হয় মডারেটর। গ্রাফাইট ও জল এই কাজে খুব উপযোগী। তারাপুরে মডারেটর হিসেবে জল ব্যবহার করা হচ্ছে।

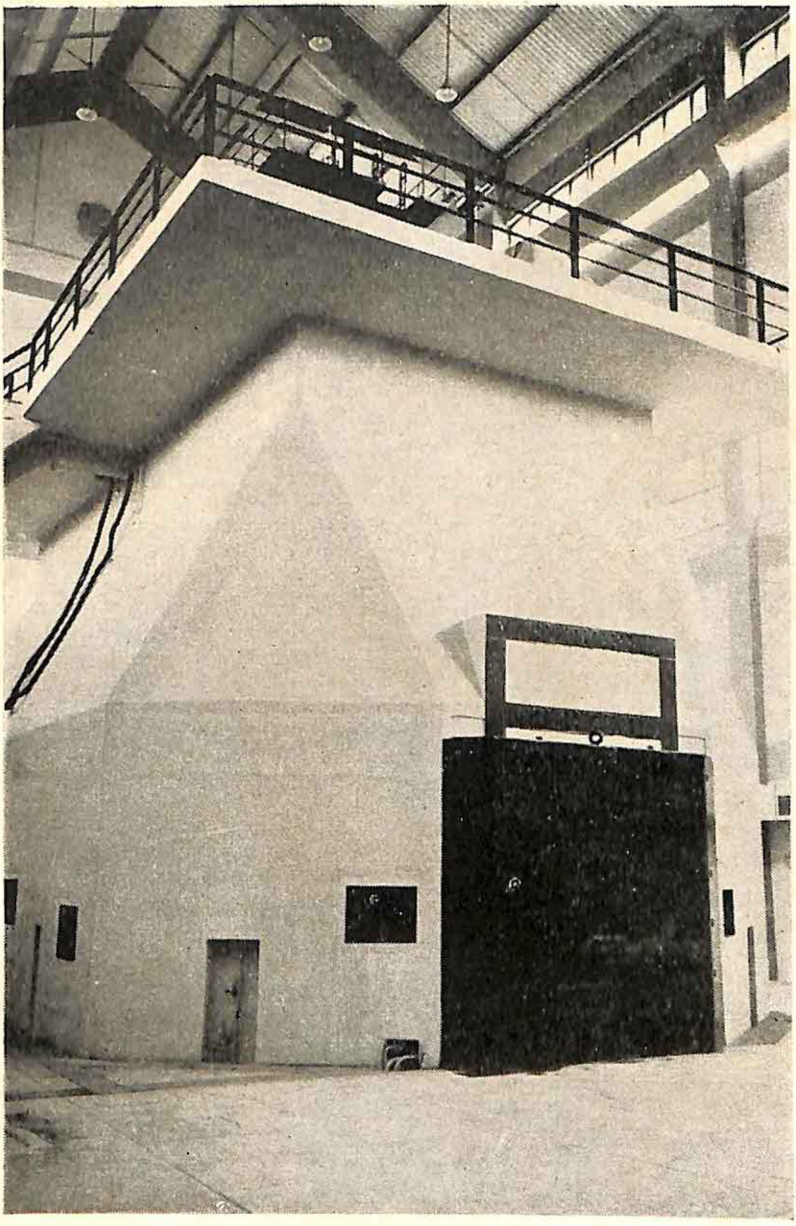
(৩) ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা—দুটি কারণে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রথম কারণ বিভাজনের হার হিসেবের মধ্যে ধরে রাখা অর্থাৎ তাপ উৎপাদনের হারকে আয়ত্তের মধ্যে রাখা, আর দ্বিতীয় কারণ রিঅ্যাকটর থেকে তাপকে স্টীম-উৎপাদক ব্যবস্থার মধ্যে চালিত করা। সাধারণ জল দিয়ে এই কাজ চালানো তো হয়ই যেমন হচ্ছে তারাপুরে। এছাড়া তরল সোডিয়ম, হিলিয়ম প্রভৃতি দিয়েও চুল্লিকে ঠাণ্ডা রাখা হয়।

(৪) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা — এনরিকো ফার্মি যখন প্রথম পরমাণু থেকে নিয়ন্ত্রিত হারে শক্তি বার করার জন্য তাঁর সেই বিখ্যাত 'শিকাগো পাইল' তৈরি করেন তাতে ছিল সবশুদ্ধ ছ' টন ধাতু। ইউরেনিয়ম, গ্রাফাইট ও ক্যাডমিয়ম নামে আর একরকম ধাতু পরপর সাজানো হয়েছিল। ইউরেনিয়ম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে কি ক'রে বিভাজন হয় সেটা জানাই ছিল, কিন্তু কি ক'রে সেই বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা বন্ধ ক'রে তাকে কাজে লাগাবার মতো আকারে প্রকাশ করা যায় সেটাই ছিল সমস্যা। গ্রাফাইট ব্যবহারের বুদ্ধি এল ফার্মির মাথায়। যেমন তত্ত্বীয় গবেষণায় তেমন হাতেনাতে কাজ করার ব্যাপারেও ফার্মির ছিল বিস্ময়কর প্রতিভা। তিনি দেখালেন একবার বিভাজনের পর যে নিউট্রন বেরোবে সেগুলি তীরবেগে ছুটে চলে গেলে পরবর্তী নিউক্লিয়াসে ধাক্কা মারার সম্ভাবনা খুবই কম, হয়ত পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। তাই আনা হলো গ্রাফাইট। গ্রাফাইটের ক্ষমতা আছে ছুটন্ত নিউট্রনের বেগ কমাবার। তারপর আসছে ক্যাডমিয়ম। একে কী জন্য দরকার? ফার্মি দেখালেন যতগুলো নিউট্রন বিভাজনের ফলে উৎপন্ন হচ্ছে সবগুলোর দরকার নেই—আরো বিভাজন করার জন্য যে ক'টি দরকার সেগুলো ছাড়া অন্যগুলোর কি ব্যবস্থা হবে? এল ক্যাডমিয়ম নামে আর একরকম ধাতু। এর ক্ষমতা আছে নিউট্রন গ্রাস ক'রে নেবার। সুতরাং সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলো। একবার বিভাজন হলো, ছিটকে বেরল ধরা যাক বারোটি নিউট্রন, তার দশটিকে গ্রাস ক'রে নেবার ব্যবস্থা হলো—বাকি দু'টি দিয়ে হলো আরো দু'টি বিভাজন। বেরল বারো আর বারো চব্বিশটি নিউট্রন। অত দরকার কি? চারটি হলেই বিভাজন চলবে। সুতরাং বাকিদের গ্রাস করা হলো। এইভাবে প্রক্রিয়া চলল, অনেকটা দাবানলের মতো —এক গাছ থেকে আর এক গাছে আগুন লাগার ধরনে। তবে দাবানল তো আর সুইচ টিপে নেভানো যায় না, কিন্তু পারমাণবিক চুল্লি হঠাৎ তেমন দরকার হলে একবারে বন্ধও ক'রে দেওয়া যায়। তাছাড়া ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করা যে যায় সেকথা বলাই বাহুল্য।

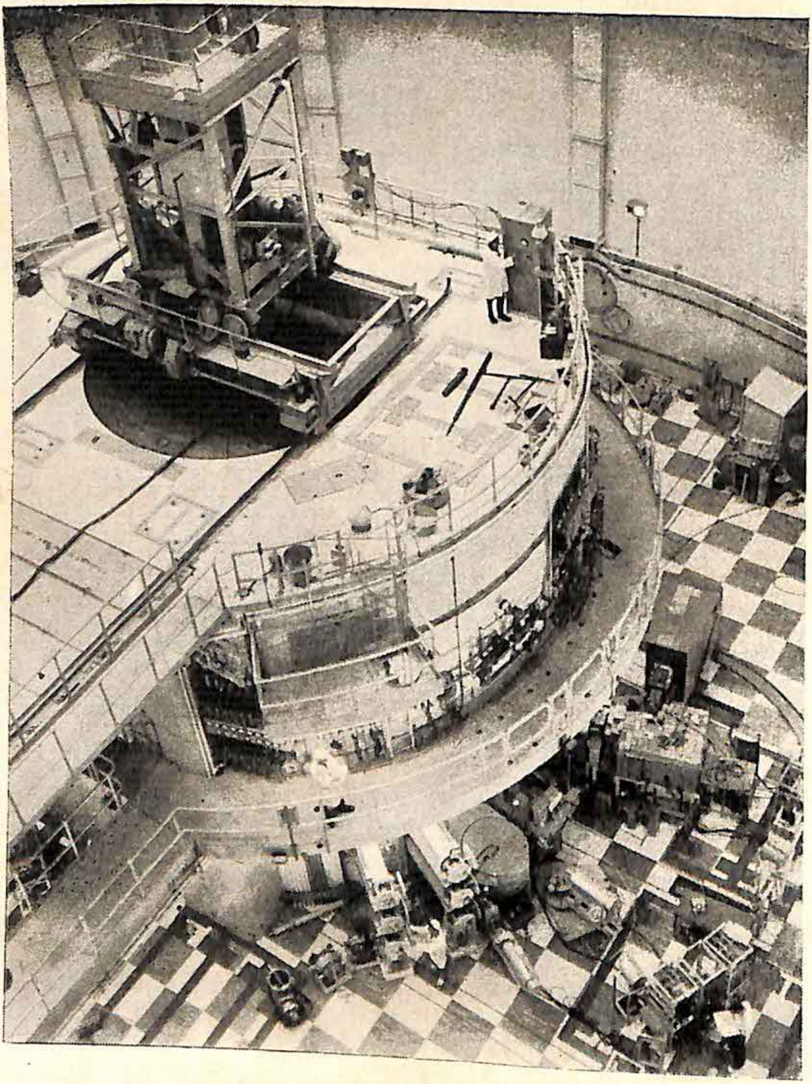
নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিউট্রণ-শোষক বস্তুর কতকগুলো রড থাকে। এগুলি ইচ্ছামতো ভিতরে ঢোকানো বা বার করা যায়। এদের বলে কনট্রোল-রড। চুল্লিতে জ্বালানি ভরার সময় এগুলি সম্পূর্ণই ভিতরে থাকে, বিভাজন শুরু করার সময় এদের আস্তে আস্তে টেনে বার ক'রে নেওয়া হয়। যখন চেন-রিঅ্যাকশন আরম্ভ হয়, সেই অবস্থায় বলা হয় রিঅ্যাকটর ক্রিটিকাল হয়েছে। তখন আর বেশি রড টেনে বার করার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তবে যদি শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াবার দরকার হয় তবে রড আরো কিছু বার ক'রে নিতে হয়। রিঅ্যাকটরে শক্তি তৈরির কাজ একেবারে বন্ধ ক'রে দিতে হলে সবগুলি রডকে আবার ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এই সমস্ত প্রক্রিয়াই কণ্ট্রোল রুম থেকে স্যুইচ টিপে সম্পন্ন হয়।

অপ্সরা, আমাদের প্রথম রিঅ্যাকটর

রিঅ্যাকটর আছে দু'রকমের, রিসার্চ রিঅ্যাকটর ও পাওয়ার রিঅ্যাকটর। পাওয়ার রিঅ্যাকটর নাম শুনলেই বোঝা যাবে শক্তি তৈরির জন্য, আর রিসার্চ-রিঅ্যাকটর টেকনোলজিতে হাত পাকাবার উদ্দেশ্যে গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়। ভারতের প্রথম রিসার্চ রিঅ্যাকটরের নাম কি উদ্দেশ্যে 'অপ্সরা' দেওয়া হয়েছিল সেটা ঠিক জানা নেই। শোনা যায় নামটি ডক্টর কে এস কৃষ্ণন দিয়েছিলেন। স্বর্গের কিন্নর-কিন্নরীরা যেমন অমর পারমাণবিক রিঅ্যাকটরও তাই —এরকম একটা তুলনা অবশ্য করা যেতে পারে। অন্তত যতক্ষণ জ্বালানির পরমায়ু রিঅ্যাকটর ততক্ষণ না থেমে চলতে থাকবে— এবং এমনও ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে সে অনাদি অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে। যে জন্যই দেওয়া হোক অপ্সরা নামটি সুন্দর। 'অপ্সরা' নামক রিঅ্যাকটর সম্বন্ধে যে অন্য বিশেষণটি প্রয়োগ করা হয় তা হলো এটি একটি স্যুইমিং পুল ধরনের রিঅ্যাকটর, সেটিও ততোধিক গোলমেলে। স্যুইমিং পুল কেন ? সেখানে কি কেউ সাঁতার কাটে নাকি ? উত্তরে বলতে হয় অপ্সরা যে পুকুরে সাঁতার কাটে



অপ্সরা



সাইরাস

তার ধারে কাছে কোনো মরদেহী মানুষের গেলে যে কি ভয়ানক বিপদ হতে পারে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র চিত্রলেখা গল্পটিতে তার খানিকটা আঁচ পাওয়া যাবে। ট্রম্বের আধুনিক অপ্সরা যে পুকুরে ভাসমান তার আয়তন ২৮ × ১০ × ২২৮ ঘন ফুট। রিঅ্যাকটরের কোর বা জ্বালানিপূর্ণ অংশটি এই জলের নিচে ডোবানো আছে। চাকাওয়ালা ট্রলির সাহায্যে ইচ্ছামতো তাকে এদিক-ওদিক করাও চলে। জ্বালানি হলো ইউরেনিয়ম-২৩৫, ঢাকা আছে অ্যালুমিনিয়মের পাতে। যে তেজস্ক্রিয়তা এর থেকে বার হচ্ছে তাকে প্রতিহত করার জন্য আছে পুকুরের জল ও তার পরে সাড়ে আট ফুট পুরু কংক্রিটের দেওয়াল। দেওয়ালের ওপারে যারা কাজ করছেন বিকিরণ থেকে তাঁদের কোনো ক্ষতি হওয়া কোনো মতেই সম্ভব নয়। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে এই রিঅ্যাকটর চলতে আরম্ভ করেছে। বিজ্ঞানীদের শেখার সুবিধে ক'রে দেওয়া ছাড়াও অপ্সরাতে নানারকম আইসোটোপ তৈরি হয়েছে যেগুলি নানা কাজে লাগে।

কানাডা-ইণ্ডিয়া রিঅ্যাকটর বা সাইরাস

আমাদের দ্বিতীয় রিঅ্যাকটর চালু হয়েছে ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে। জ্বালানি ব্যবহার হয়েছে স্বাভাবিক ইউরেনিয়ম। রিসার্চ রিঅ্যাকটর হিসেবে এটি পৃথিবীর বৃহৎ রিঅ্যাকটরগুলির একটি। এর মাঝখানে আছে একটি অ্যালুমিনিয়ম-এর গোল বাক্স, যার ব্যাস ৯ ফুট এবং উচ্চতা ১১ ফুট। এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত আছে প্রায় দুশোটি অ্যালুমিনিয়ম-টিউব তার মধ্যে ভরা আছে স্বাভাবিক ইউরেনিয়ম। তাছাড়া এর মধ্যে আছে নিয়ন্ত্রণ করার রড বা দণ্ডগুলি ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি। ইউরেনিয়ম থেকে বিভাজনের পর বেরিয়ে আসা নিউট্রনের গতিবেগ থাকে সেকেণ্ডে প্রায় ১০,০০০ মাইল, তাদের কমিয়ে সেকেণ্ডে এক মাইল করার জন্য ভারি জল আছে। এই গোল বাক্সটিকে ঘিরে আছে দুটি ৯ ও ২৪½ ইঞ্চি পুরু গ্রাফাইটের বেষ্টনী, এদের বাইরে আছে লোহার রিং ও তারও পরে কংক্রিটের

দেওয়াল, যাতে তেজস্ক্রিয়তার চিন্তা না ক'রে নির্ভয়ে লোকে কাজ করতে পারেন। হঠাৎ কিছু বিগড়ে গেলে যাতে রিঅ্যাকটরটি নিজে থেকে বন্ধ হয়ে যায় এমন ব্যবস্থাও করা আছে।

জার্লিনা, রিঅ্যাকটর নম্বর তিন

নাম শুনে প্রথমে মনে হতে পারে রাশিয়ার জারদের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে হয়ত, কিন্তু আসলে এই রিঅ্যাকটরদের নামকরণ হয়েছে এর শক্তি-পাল্লা অনুসারে। এর শক্তির পাল্লা হলো বৈজ্ঞানিক ভাষায় জিরো এনার্জি। শুনেই বোঝা যাচ্ছে অতিশয় কম এনার্জি এবং সেখানেই এর সঙ্গে অপ্সরা ও সাইরাসের বিশেষ তফাৎ। জার্লিনার শক্তির সর্বোচ্চ মাত্রা হলো মাত্র ১০০ ওয়াট। এর উপযোগিতা গবেষণায় এবং এর জ্বালানি অংশটি নিয়ে ইচ্ছামতো অদলবদল করাও যায়। ট্রম্বের বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ্‌দের সম্পূর্ণভাবে হাতে তৈরি বলেও এ একটু বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারে। শক্তি শূন্য হলেও এতে যেসব এক্সপেরিমেণ্ট হয়েছে তার মূল্য মোটেই শূন্য নয়। এটি ক্রিটিকাল হয় ১৯৬১-র জানুয়ারী মাসে।

পুরনিমার জন্ম

প্লুটোনিয়ম রিঅ্যাকটর ফর নিউট্রনিক ইনভেস্টিগেশান ইন মাল্টিপ্লাইং এসেমব্লিজ কথাগুলির আদ্য অক্ষর নিয়ে PURNIMA-পুরনিমা। এই রিঅ্যাকটরটি অপ্সরা বা জার্লিনার মত নয়। এটি একটু অন্য ধরনের। এটি শূন্য শক্তির ফাস্ট রিঅ্যাকটর। এতে সব রকম গবেষণা চালানোর সুবিধার জন্য বর্তমানে একে এক ওয়াটের কম ক্ষমতায় চালানো হচ্ছে। তাই শূন্য শক্তি। আমাদের দেশে এটি প্রথম ফাস্ট রিঅ্যাকটর এবং সেই হিসেবে এটি ট্রম্বের অন্য রিঅ্যাকটরদের থেকে ভিন্ন। এর জ্বালানি-প্লুটোনিয়ম—যা ট্রম্বের প্লুটোনিয়ম প্ল্যাণ্টে তৈরি। প্লুটোনিয়ম ডাইঅক্সাইড ছোট ছোট পেলেট বা বড়ি আকারে তৈরি করে

ভরা হয়েছে সরু স্টেনলেস স্টীলের নলের মধ্যে। এই নলগুলিকে জ্বালানি পিন বলা হয়। মোট একশ আশিটি এইরকম পিন নিয়ে একটি অসম ষড়ভুজ আকারে জ্বালানির কোর তৈরি করা হয়। সেটা দেখতে অনেকটা মৌচাকের মত। প্লুটোনিয়ম নিয়ে নাড়াচাড়া ছেলেখেলা নয়। অসাবধান হলে পাঁচশো গ্রাম প্লুটোনিয়মে বিস্ফোরণ হয়ে সর্বনাশ হতে পারে। বিদেশে এমন ঘটনা যে ঘটেনি তা নয়। পুরনিমাতে মোট বাইশ কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়ম আছে—যা দিয়ে অন্তত তিনটি মাঝারি সাইজের পরমাণু বোমার মশলা হতে পারে। তাই রিঅ্যাকটরের প্রতিটি যন্ত্রাংশের পরিকল্পনা থেকে নির্মাণ অবধি অতিরিক্ত সতর্কতা, সাবধানতা ও যত্নের প্রয়োজন হয়েছে। কোনো অবস্থাতে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটতে পারে তার জন্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নির্ভুল ও ইলেট্রনিক যন্ত্রপাতি নিখুঁত করতে হয়েছে। গোড়া থেকে শেষ সব কিছু যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ করেছেন ট্রম্বের বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদরা। প্লুটোনিয়ম শুধু যে তেজস্ক্রিয় তাই নয়, আবার অতিমাত্রায় বিষাক্তও বটে। কয়েক মিলিগ্রাম লিক করে শরীরের সংস্পর্শে এলে প্রাণহানির আশঙ্কা। এই প্লুটোনিয়ম নিয়ে কাজ, কাটা ছাঁটা, ওয়েল্ড করা, নিখুঁত মাপে কাটা, নলে এঁটে বন্ধ করা সবই হয় বন্ধ বাক্সের মধ্যে দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত যান্ত্রিক হাতের সাহায্যে। নিখুঁত বিপদ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছাড়া এ ধরনের প্রকল্পে হাত দেওয়াই যায় না।

পুরনিমা রিঅ্যাকটরটি ক্রিটিকাল হয় ১৯৭২ সালের ২২শে মে। আমাদের দেশের পারমাণবিক টেকনোলজিতে এটি একটি বিশিষ্ট পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়। এর সাহায্যে গবেষণায় যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা ভবিষ্যতের ব্রিডার রিঅ্যাকটর ডিজাইন করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ব্রিডার রিঅ্যাকটরের ভূমিকা আমাদের দেশের পটভূমিতে যে কত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে একটু পরেই আমরা বিশদ আলোচনা করছি।

রিঅ্যাকটর নম্বর পাঁচ—আর ফাইভ

ট্রম্বের পাঁচ নম্বর রিঅ্যাকটর তৈরির কাজ সুরু হয়ে গিয়েছে। কোন রিঅ্যাকটর কত শক্তিমান সেটা বলা হয় রিঅ্যাকটরের কেন্দ্র থেকে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে প্রতি সেকেণ্ডে কতগুলি নিউট্রন বেরোচ্ছে তার থেকে। অপ্সরাতে এই সংখ্যাটি ১০^১৩, সাইরাসে ৬ × ১০^১৩, জার্লিনাতে ১০^৮, পুরনিমায় ১০^৯। আর ফাইভে এটি ৩ × ১০^১৫। নতুন রিঅ্যাকটরটি হবে ১০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন। এতে জ্বালানি হিসেবে থাকবে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ম। ভারী জল হবে এর মডারেটর এবং তাই দিয়ে ঠাণ্ডাও করা হবে। বেশি সংখ্যায় নিউট্রন পাবার জন্য এটি আইসোটোপ তৈরির কাজে, ইঞ্জিনিয়ারিং ও গবেষণায় বিশেষ করে বিভিন্ন বস্তুর পারমাণবিক বিকিরণ সহ্য করার পরীক্ষার কাজে লাগবে। আশা করা যায় ১৯৭৯ সালে এই রিঅ্যাকটরটি ক্রিটিকাল হবে।

কলপক্কমে ব্রিডার রিঅ্যাকটর

ভাবা পরমাণু কেন্দ্র রিঅ্যাকটর বিষয়ে আরও গবেষণার জন্যে তামিলনাড়ুর কলপক্কমে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রের পাশে রিঅ্যাকটর রিসার্চ সেন্টার স্থাপন করেছেন। এখানেই প্রথম ফাস্ট ব্রিডার টেস্ট রিঅ্যাকটর তৈরি হবে।

ব্রিডার রিঅ্যাকটরের কাজ যত জ্বালানি পুড়বে সেই সঙ্গে আবার জ্বালানি তৈরি করা। একথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে আমাদের দেশে ইউরেনিয়ম যা আছে তার থেকে থোরিয়ম আছে অনেক বেশি। থোরিয়ম কিন্তু বিভাজনক্ষম নয়। তবে থোরিয়মকে পারমাণবিক বিক্রিয়ায় ইউরেনিয়ম ২৩৩ করা সম্ভব। ইউ ২৩৩ বিভাজনক্ষম। বিষয়টা একটু বিষদ আলোচনা সাপেক্ষ।

প্রকৃতিতে যে ইউরেনিয়ম পাওয়া যায় তা হল ইউরেনিয়ম ২৩৮। একে সোজাসুজি রিঅ্যাকটরে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। তবে ইউরেনিয়মের একটি আইসোটোপ ইউরেনিয়ম ২৩৫কে

জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এটি ইউরেনিয়ম ২৩৮ এর সঙ্গেই পাওয়া যায়, যদিও অল্প পরিমাণে—শতকরা কিঞ্চিদধিক সাত ভাগ। জ্বালানির জন্য প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ম থেকে ইউরেনিয়ম-২৩৫ আলাদা করতে হয়। বিভাজনের পর দ্রুতগতিসম্পন্ন যে নিউট্রনগুলি বেরোয় মডারেটরের সাহায্যে তাদের গতিবেগ মন্থর করা হয় আরো বিভাজন করার জন্য। মন্থর বেগসম্পন্ন নিউট্রন দিয়ে বিভাজন হয় বলে এগুলিকে থারমাল রিঅ্যাকটর বলা হয়। থারমাল রিঅ্যাকটরে প্রতিটি বিভাজনে ২·৫৪ নিউট্রন সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে একটি নিউট্রন খরচ হয় চক্রবৃদ্ধি বিক্রিয়া চালু রাখতে। যে নিউট্রন বাকি থাকে তাকে দিয়ে কেন্দ্রিণ বিক্রিয়ার সাহায্যে ইউরেনিয়ম-২৩৮কে প্লুটোনিয়ম ২৩৯ করা যায় বটে কিন্তু তার সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাই থার্মাল রিঅ্যাকটর দিয়ে ব্রিডার বানানো যায় না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে দ্রুতগতিসম্পন্ন নিউট্রন দিয়ে বিভাজন করতে পারলে প্রতিটি বিভাজনে চার থেকে পাঁচটি নিউট্রন বেরোয়। তার মধ্যে একটি চক্রবৃদ্ধি বিক্রিয়ার জন্য ধরে নিলেও বাকি নিউট্রন-গুলির মধ্যে কিছু ব্রিডারের জন্য পাওয়া সম্ভব। দ্রুতবেগসম্পন্ন নিউট্রন ব্যবহার করা হয় বলে এদের ফাস্ট রিঅ্যাকটর বলে। এই ধরনের রিঅ্যাকটরে কোনো মডারেটর থাকে না। তাই নিউট্রন শোষণও কম হয়। ব্রিডার রিঅ্যাকটর মূলত ফাস্ট রিঅ্যাকটর। আজ পর্যন্ত যে সব পদ্ধতিতে ইউরেনিয়ম থেকে ইউরেনিয়ম ২৩৫ আলাদা করা হয়েছে তার সবগুলিই খুব জটিল এবং ব্যয়সাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ঠিকমত ডিজাইন করতে পারলে ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাকটরে অনেক কম খরচে পরমাণু জ্বালানি তৈরি করা যাবে এবং আমাদের নিজেদের থোরিয়ম কাজে লাগাতে পারলে আমাদের হাতে এসে যাবে অপর্যাপ্ত পরমাণু জ্বালানি। তাই ফাস্ট রিঅ্যাকটরের ভূমিকা এত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিকল্পিত ফাস্ট ব্রিডার টেস্ট রিঅ্যাকটরে জ্বালানি হবে $UO_2 + PuO_2$ এটি ঠাণ্ডা করা হবে তরল সোডিয়ম দিয়ে। এটি

৪২ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন হবে এবং এর থেকে প্রতি বর্গ সেন্টি-মিটারে প্রতি সেকেণ্ডে ৩ × ১০^১৭ নিউট্রন পাওয়া যাবে। এটি তৈরি শেষ হবে ১৯৭৮ সাল নাগাদ।

কোথায় ক'টা আছে ?

১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে ১৪টি দেশে সবশুদ্ধ ছিল ৭৪টি পারমাণবিক পাওয়ার-রিঅ্যাকটর। এবং এইসবগুলিতে উৎপাদিত শক্তির পরিমাণ ছিল ১৩,০০০ মেগাওয়াট। ডক্টর ভাবার বাসনা ছিল ১৯৭৯ নাগাদ আমাদের দেশেই পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রগুলিতে ৩০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হোক এবং ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দেই তিনটি কেন্দ্র থেকে ১০০০ মেগাওয়াট। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলছে ঠিকই—তবে একটু দেরী হওয়াতে এখন ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে কেবল তারাপুর চালু হয়েছে ও তার থেকে পাওয়া গেছে চার লক্ষ কিলোওয়াট। রাণা প্রতাপ সাগরের প্রথম বিদ্যুৎকেন্দ্রটি চালু হয় ১৯৭২ এর ১১ই আগস্ট। আন্তর্জাতিক পরমাণু-শক্তি সংস্থা হিসেব ক'রে দেখেছেন ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে পৃথিবীর সমস্ত রিঅ্যাকটরগুলির সংখ্যা ছিল ৪৭৯। ৪৮টি দেশে আছে রিসার্চ এবং ট্রেনিং-এর জন্য রিঅ্যাকটর। এখন যেসব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলছিল তাতে ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ২৮৩টি পাওয়ার-রিঅ্যাকটর চলার ও সবশুদ্ধ ১৩০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরী হওয়ার কথা। অবশ্য ঠিক কতটা হলো কিছুদিনের মধ্যেই জানা যাবে।

ভারতের পরমাণু প্রকল্প

পরমাণু-শক্তি কমিশন ভারতে যেসব প্রকল্প নিজেরা চালাচ্ছেন অথবা যেসব প্রতিষ্ঠানকে বহুলাংশে অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকেন তাদের একটি তালিকা যোগ করা হলো। পরের পাতায় মানচিত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নাম দেওয়া আছে এবং পরের তালিকায় বলা হয়েছে কোথায় কি আছে।



ভারতের মানচিত্র

বম্বে : পরমাণু-শক্তি কমিশনের সদর দপ্তর ; টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ ; পাওয়ার প্রজেক্ট এঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন।

ট্রম্বে : ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র — পরমাণু শক্তি বিষয়ে উন্নয়ন মূলক গবেষণার প্রধান কেন্দ্র ; এখানে গবেষণার জন্য রিঅ্যাকটরগুলি আছে।

তারাপুর : ভারতের প্রথম পরমাণু-শক্তি কেন্দ্র ; শক্তি উৎপাদনকারী রিঅ্যাকটরগুলির জ্বালানি গবেষণা-কেন্দ্র।

বরোদা, নাঙ্গাল, টুটিকোরিন ও তালচের — ভারি জলের প্ল্যাণ্ট।

রানাপ্রতাপ সাগর : পরমাণু-শক্তি কেন্দ্র, ভারি জলের কারখানা।

নারোরা — পরমাণু-শক্তি কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে।

গুলমার্গ : হাই অলটিচিউড রিসার্চ সেন্টার।

কলকাতা : সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ; ভেরিএবল এনার্জি সাইক্লোট্রন।

যদুগুড়া : ইউরেনিয়ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

কলপক্কম : পরমাণু-শক্তি কেন্দ্র ; রিঅ্যাকটর রিসার্চ সেন্টার।

আলওয়ে : রেয়ার আর্থ প্ল্যাণ্ট।

হায়দারাবাদ : নিউক্লিয়ার ফুয়েল কমপ্লেক্স ; অ্যাটমিক মিনারেলস ডিভিসন ; ইলেকট্রনিক্স করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

চাভারা : আকরিক বালি (মিনারাল স্যাণ্ডস)।

গৌরীবিদানুর : সাইসমিক স্টেশন।

এই তালিকায় মহাকাশ-চর্চার কেন্দ্রগুলি দেখানো হয় নি। এর মধ্যে কেবল দুটি কেন্দ্র — টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ এবং সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন গবেষণাগার, যদিও এদের অধিকাংশ ব্যয়ভার পরমাণু-শক্তি দপ্তরই বহন করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

পোখরানের পরীক্ষা

সংক্ষেপে বলতে হলে

১৯৩৯ সালে পারমাণবিক বিভাজন আবিষ্কারের মাস কয়েক আগেও বহু বিচক্ষণ বিজ্ঞানী মনে করতেন পারমাণবিক বিক্রিয়া কোনদিন কারো কোন কাজে আসবে না। অথচ ১৯৪২ সালেই চেন-রিঅ্যাকশন হল। ভয়ংকর অস্ত্র হিসেবে এই বিস্ফোরণ-ব্যবহার হল ১৯৪৫ সালে। ততদিনে এটা আর কারো বুঝতে বাকি নেই যে এই শক্তিকে বশ মানিয়ে কাজে লাগানোর বিপুল সম্ভাবনা আছে। তবে সেটা কার্যকর হওয়া সময়সাপেক্ষ। শুধু খরচ এবং যান্ত্রিক কৌশলের দিক ছাড়াও এর সঙ্গে নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত থাকায় তাড়াহুড়ো করে এগোনো সম্ভব নয়।

ভারতে পরমাণু চর্চা

পৃথিবীর অন্যত্র যে সময়ে পরমাণু-বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত খুলে যাচ্ছিল ভারতেও একই সময়ে সেই ঘটনার সূচনা দেখা দিল। ১৯৪৪ সালেই আমরা পরমাণু-শক্তি কাজে লাগাবার বিষয়ে চিন্তা সুরু করেছি। বলা বাহুল্য এই চিন্তার পিছনে হাতিয়ার বানানোর কোন তাগিদ ছিল না। প্রথম দিকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল গবেষণা ও দক্ষ বিজ্ঞান-কর্মী ও কারিগর তৈরির দিকে। তখন আমাদের দেশে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার বা সহ-যোগিতা করার মত টেকনোলজির ভূমিই তৈরি হয়নি। কিন্তু তার পরের তিরিশ বছরের ইতিহাস কারো অজানা নয়। ১৯৭৪ সালের পোখরানের পরীক্ষায় প্রমাণ হল আমরা এই তিরিশ বছরে পরমাণু বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত এবং তত্ত্বগত উভয় দিকেই সাবালকত্ব অর্জন করেছি।

আমাদের পরমাণু নীতির মূল কথা

পরমাণু-শক্তির একটি ছাড়া অন্য প্রয়োগের কথা যাঁরা চিন্তাও করতে পারেন না তাঁরা পোখরানের সাফল্যে বিচলিত হয়ে অনেক দায়িত্ব-জ্ঞানহীন উক্তি করে ফেলেছিলেন, তাতে কেবল তাঁদের অজ্ঞতাই প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিভিন্ন কাজে প্রয়োগের জন্য আইসোটোপ তৈরী করা, তেজস্ক্রিয়তার নানা ব্যবহার, গবেষণা এবং এর আনুসঙ্গিক টেকনোলজি আয়ত্ব করা। বড় গোছের পরমাণু প্রকল্প হাতে নেওয়ার অর্থ একে বহন করার মত শিল্পের সামর্থ দেশের আছে। এই ক্ষেত্রে আমরা খুব তাড়াতাড়ি স্বনির্ভর হতে চলেছি। এর পরের পর্যায়ের লক্ষ্য হল ব্রিডার রিঅ্যাকটর তৈরী করা, যেখানে থোরিয়মকে ^{২৩৩}Uতে পরিণত করা হবে। এইভাবে আমাদের প্রচুর থোরিয়ম সঞ্চয় সকলের কাজে আসবে। এই রিঅ্যাকটরে যত জ্বালানি পুড়বে তার থেকে বেশি জ্বালানি উৎপন্ন হবে।

পোখরানের পরীক্ষা

১৯৭৪ সালের ১৮ই মে ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম সকাল আটটা পাঁচ মিনিটে রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চল পোখরানের মাটির তলায় ভারতের প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষা ঘটানো হয়। বাতাস তখন বইছে পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে, ঘণ্টায় কুড়ি কিলোমিটার বেগে। দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে বাতাসের বেগ বা দিক পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই, তার পরের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোন ঝড়েরও সম্ভাবনা ছিল না। আকাশ পরিষ্কার। জনসাধারণের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এতগুলি দিক দেখেশুনে তবেই বিস্ফোরণের সময় ও স্থান ঠিক করা হয়। যদি হঠাৎ তেজস্ক্রিয়তা বাইরে এসে পড়ে (যদিও তার কোন সম্ভাবনা ছিল না) এবং তেজস্ক্রিয় মেঘ গঠিত হয় তাহলে সেগুলো জনবসতিহীন অঞ্চলের দিকে চলে যাবে

এবং লোকালয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ বিপদ সীমার অনেক নিচে চলে যাবে। জায়গাটা এইসব নানা দিক দেখেশুনে বাছা হয়েছিল। অকুস্থলের খুব কাছ থেকে আরম্ভ করে অনেকগুলি আবহাওয়া কেন্দ্র তৎপর ছিল। তারা নিরাপদ সঙ্কেত দেবার পরই পরীক্ষাটি সম্পন্ন করা হয়।

বিস্ফোরকটি ছিল প্লুটোনিয়ম। ইংরিজী L অক্ষরের আকারে কাটা গর্তে মাটির ১০৭ মিটার নিচে রাখা, একটি পাত্রে সযত্নে আঁটা অবস্থায়, যাতে ভেতরে ধুলোবালি প্রবেশ না করতে পারে। তার-পরে ৬ মিটার অবধি গর্তটি বালির বস্তা ও কংক্রিটের ব্লক দিয়ে ভর্তি করা হয়।

পরীক্ষার আগে ও পরে মাটিতে অথবা হাওয়ায় তেজস্ক্রিয়তার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নি। অর্থাৎ বিস্ফোরণের ফলে কোন তেজস্ক্রিয় রশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেনি। কাছেই এবং অল্প দূরে হেল্‌থ-ফিজিক্স-এর ল্যাবরেটরী বসানো হয়েছিল, যাতে জল, মাটি বা গাছপালায় তেজস্ক্রিয়তা ঢুকে থাকলে মুহূর্তের মধ্যে তা ধরা পড়ে। পরেও ক্রমাগত পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে— কোথাও তেজস্ক্রিয়তার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

বিস্ফোরণের ঠিক তিরিশ মিনিট পরে স্বাস্থ্য-পদার্থবিদদের একটি দল জিপে করে ক্রেটারের মুখের ১৩৫ মিটার অবধি যন্ত্রপাতি নিয়ে পৌঁছে গেলেন— অবশ্য তাঁরা নিজেরা যথেষ্ট সাবধান হয়ে ঢাকা-ঢুকি দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা ফিরে এসে ঘোষণা করলেন জায়গাটি সম্পূর্ণরূপে তেজস্ক্রিয়তা মুক্ত। তবে তাঁরা দেখলেন মাটিতে ফাটল। সেখানে যাতায়াত বারণ করে দেওয়া হল। ইতিমধ্যে হেলিকপটারে করে পরীক্ষারত পর্যবেক্ষক দলের কাছ থেকে রেডিও মারফত খবর পাওয়া গেল যে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রায় কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। দক্ষিণ দিকে পর্যবেক্ষক দল পাঠানো হল এবং সমস্ত জায়গাটি দশটার মধ্যে লোক চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্যপদার্থবিদরা পরের দিন আবার পরীক্ষা স্থলে গেলেন

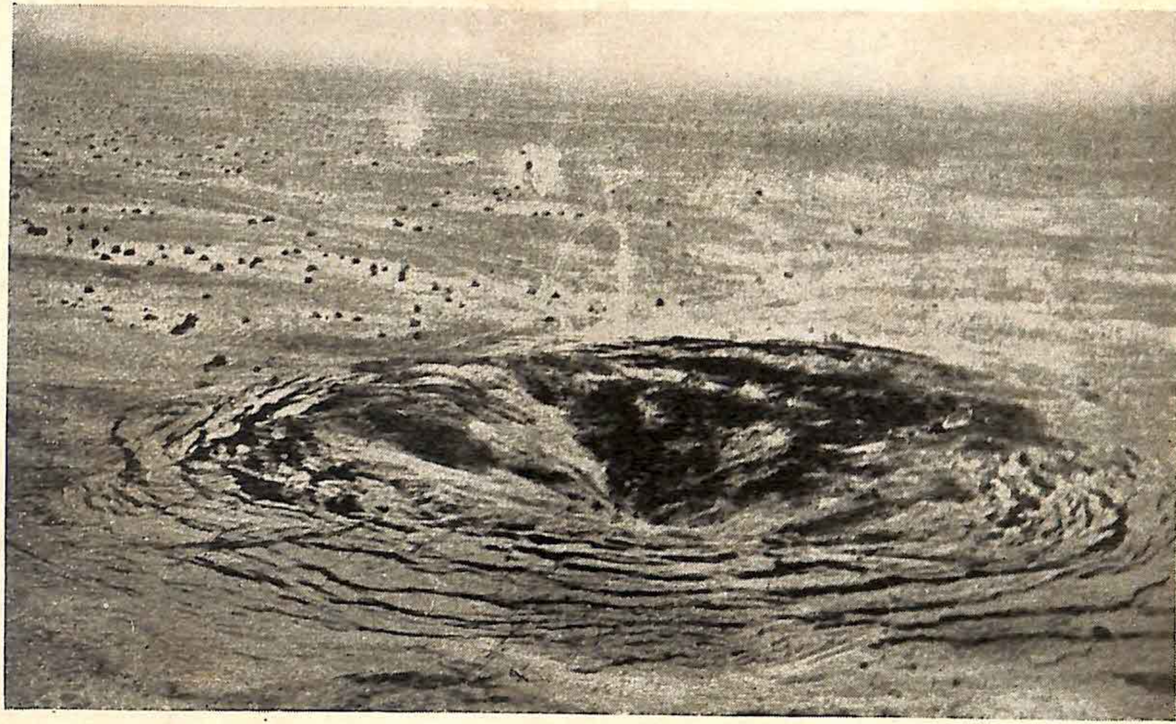
—এবারে মাটি ও পাথর নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা হল। তাঁরা যে ফিল্ম ব্যাজ পরে ছিলেন তাতেও কোন তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়ল না। বাতাসের গতিপথ অনুযায়ী দক্ষিণের নানা স্থানে, বিশেষ করে—জয়পুর, বিকানীর, দিল্লি প্রভৃতি জায়গার দুধ, খাদ্য, হাওয়া বিশ্লেষণ করা হল, দিল্লি-জয়পুর-আমেদাবাদ এবং দিল্লি—বোম্বাই লাইনের বিমানের ডানা থেকে ধুলো নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হল—কোথাও তেজস্ক্রিয়তার চিহ্ন পাওয়া গেল না। প্রমাণ হল যে এই পরীক্ষায় একটুও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মাটির বাইরে এসে পৌঁছয় নি।

বিস্ফোরণের ফলে ১০ মিটার গভীর এবং ৪৭ মিটার ব্যাসার্ধের একটি গর্ত দেখা দিল। এই পরীক্ষার সঙ্গে যে সব বিজ্ঞানীরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজা রামান্না, পি কে আয়েঙ্গার, অনিল গাঙ্গুলী, আর চিদাম্বরম, প্রণব দস্তিদার, প্রণব রায়, ইত্যাদি প্রধান।

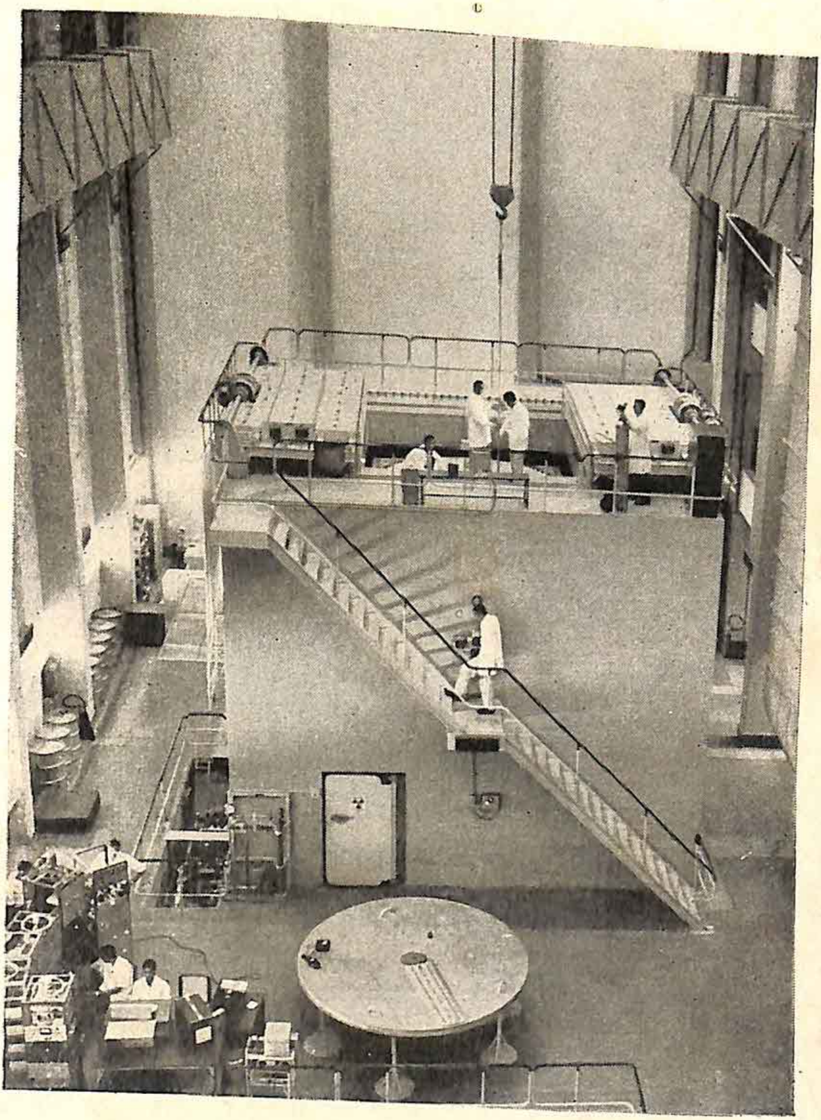
পরমাণুর পরিবর্তিত ভূমিকা

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনের ধরণও বদলায়। ক্রমশই সকলে বুঝতে পারছে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে পরমাণু-শক্তির ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়ছে, তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী হল পরমাণু-শক্তির এমন সব কাজে ব্যবহার যেখানে অন্য উপায় খাটে না।

মাটির নিচে পারমাণবিক বিস্ফোরণ হল রাসায়নিক বিস্ফোরণের বিকল্প। খনন কাজে, বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ স্তর থেকে পেট্রোলিয়ম বার করতে, বা খাল খুঁড়তে, অথবা বন্দরের নাব্যতা বাড়াতে এর উপযোগিতা খুব বেশি। এগুলি অন্য বিস্ফোরকের চেয়ে ব্যবহার করতে সুবিধাজনক এবং এর খরচও কম। যে কোন বড় বইয়ের দোকানে অ্যাটমিক এনার্জি সোর্স বুক কিনতে পাওয়া যায়—তাতে দুই পদ্ধতির খরচের হিসেব দেওয়া আছে। প্রকাশিত হিসেব থেকে



পোখরানে পরীক্ষার পর



জালিনা

জানা যায় রাসায়নিক বিস্ফোরক ব্যবহার করে মাটি খুঁড়ে সরাতে খরচ পড়ে প্রতি টনে একশো ডলার; যদি দশ থেকে পঞ্চাশ কিলোটন পারমাণবিক বিস্ফোরক ব্যবহার করা যায় তাহলে প্রতি টনে পঁয়ত্রিশ ডলার এবং ২ মেগাটন পারমাণবিক বিস্ফোরকে খরচ পড়বে প্রতি টনে মাত্র ৩০ সেন্ট। (১ ডলার = ১০০ সেন্ট)।

ভিয়েনাতে এই নিয়ে ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরমাণু-শক্তি সংস্থার বেশ কয়েকবার মিটিং বসেছে। ভারত এই সভার সদস্য। সেখানে বিভিন্ন দেশ তাদের নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী যে সব পরিকল্পনার কথা আলোচনা করেছে তাতে দেখা গেছে সকলের প্রয়োজন এক জাতীয় নয়। সোভিয়েত রাশিয়া চায় তার কিছু নদীর জল কাস্পিয়ান সাগরের দিকে প্রবাহিত করতে। পেচোরা-কামা নদী খাল খুঁড়ে উত্তরের নদীগুলির জল কাস্পিয়ান সাগরে পড়া নদীগুলিতে চালিয়ে দেওয়ার মত বিরাট ব্যাপার পারমাণবিক বিস্ফোরণ দিয়ে করা চলতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন ভূগর্ভের গ্যাস ও তেলের সঞ্চয় ওপরে তোলা। ভারতের মত বৃহৎ দেশে নানারকম উপায়ে এই শক্তি লাগানো যায়— এক নদীর সঙ্গে আর এক নদীকে যুক্ত করতে, বন্দরের সমুদ্রতল গভীর করতে অথবা জলহীন অঞ্চলে জলাধার তৈরী করতে। এখন মাত্র প্রাথমিক অবস্থা— এদিকে অনেক সমীক্ষা দরকার।

পি এন ই টেকনোলজি

আজকাল যাকে সংক্ষেপে বলা হয় পি এন ই তার পুরো কথাগুলি হল পিসফুল নিউক্লিয়ার এক্সপেরিমেন্ট বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে পারমাণবিক পরীক্ষা। এই টেকনোলজি এখন ক্রমশ উন্নতিলাভ করছে এবং যত দিন যাবে তত বেশি করবে,একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মাটির নিচে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে যে বিশাল গর্ত হয় সেটি জলাধার হিসেবে ব্যবহার হতে পারে অথবা শহরের কাছা-

কাছি প্রাকৃতিক গ্যাসের আধার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়, তাহলে অনেক দূর থেকে পাইপে করে গ্যাস আনতে হয় না। হিসেব করে দেখা গেছে রাসায়নিক বিস্ফোরক দিয়ে ঐ আকারের গর্ত খোঁড়া শুধু যে প্রচণ্ডরকম ব্যয়সাপেক্ষ তাই নয়, কার্যক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব।

মাটির নিচে কতগুলি বিস্ফোরণ হয়েছে?

১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত মাটির নিচে যে সব পরমাণু বিস্ফোরণ হয়েছে তার হিসাব থেকে দেখা যায় যে আমেরিকায় মোট ৩৬৬, রাশিয়ায় ১২৯, যুক্তরাজ্যে ৫, ফ্রান্সে ১৩, চীনে ১ এবং ভারতে ১টি। এর মধ্যে অল্প কয়েকটি শুধুমাত্র গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

নতুন কিছু

আগামীকালের শক্তির উৎস : ভারত

আগেই বলা হয়েছে ভারতের আছে পৃথিবীর বৃহত্তম থোরিয়ম ক্ষেত্র। থোরিয়মকে ২৩৩U-তে রূপান্তরিত করা সম্ভব। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে আমাদের ভবিষ্যতের শক্তি-কেন্দ্রগুলি প্লুটোনিয়ম আর ২৩৩U-কে ব্যবহার করবে জ্বালানি হিসেবে। কলপক্কমে যে শক্তি-কেন্দ্র তৈরি হতে চলেছে সেখানে প্লুটোনিয়ম ব্যবহার করা হবে এরকম পরিকল্পনা আছে।

ইউরেনিয়ম যদি ফুরিয়ে যায়?

এইভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ শক্তি-সমস্যার নিরসন হচ্ছে। কিন্তু একেবারে চিরকালের মতো হচ্ছে না। কেননা পৃথিবীতে ইউরেনিয়মের সঞ্চয়ও অফুরন্ত নয়। আমাদের থোরিয়ম ক্ষেত্র যত বড়ই হোক সেও তো একদিন না একদিন ফুরিয়ে যাবে! কেউ কেউ অনুমান করছেন চাঁদে ইউরেনিয়ম পাওয়া যেতে পারে। পেলে ভালোই। আরো কিছুকালের মতো সংস্থান হলো। আর যদি না পাওয়া যায়? এমন সম্ভাবনাও তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তার জন্যও ব্যবস্থা হচ্ছে। পরমাণু থেকে শক্তি পাবার আরো উপায় আছে। সেই উপায়কে বলা হয়ে থাকে তাপকেন্দ্রিণ বিক্রিয়া। হাইড্রোজেনের মতো হাল্কা দুটি পরমাণুর কেন্দ্রক জুড়ে এক হয়ে যাবার ফলে খানিকটা বস্তু বিনষ্ট হয়ে তৈরি হয় অপার্থিব শক্তি। ইউরেনিয়মের মতো হাইড্রোজেন দুষ্প্রাপ্য নয়। সমুদ্রের জলেই পাওয়া যাবে অফুরন্ত হাইড্রোজেন। কিন্তু তার পরের কথাটা একটু চিন্তার। যে তাপে এই কেন্দ্রক দুটি জুড়ে তৈরি হচ্ছে শক্তি সেটা একটা অকল্পনীয় তাপ—কয়েক লক্ষ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এ হলো সূর্যদেহের

ভিতরের তাপ। পৃথিবীতে কি ক'রে এই তাপ উৎপন্ন হবে? প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে এই যে তাপকেন্দ্রিণ বিক্রিয়ার কথা এইমাত্র বলা হলো, সূর্যে এবং তারায় দিবারাত্র এই ব্যাপার ঘটে চলেছে। ফলে যে অমিত শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে তাতেই তাদের এত তেজ! যাই হোক পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের সময় লক্ষ্য করা গেল যে খুব অল্পক্ষণের জন্য ঐ প্রচণ্ড তাপ পৃথিবীতেই উৎপন্ন হয়েছিল। এই সূত্র ধরে এগিয়ে গিয়ে তৈরি হলো হাইড্রোজেন বোমা — অর্থাৎ দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রক জুড়ে বিস্ফোরণ। তাপকেন্দ্রিণ বিক্রিয়াকে একবার আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলে ইচ্ছামতো কম বেশি হারে শক্তি নির্গমন করাতে পারলেই আর আমাদের পায় কে!

পদার্থের চতুর্থ অবস্থা

পদার্থের এমনিতেই তিন অবস্থা—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। কিন্তু ঐ মিলিয়ন ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপের কবলে পড়লে গ্যাস আর গ্যাস থাকে না—যা হয়ে যায় তার নাম প্লাজমা। এ হলো পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। এই অবস্থায় পদার্থের হালচাল যায় একেবারে বদলে। সাধারণ অবস্থায় যে কোনো পদার্থের পরমাণুতে নেগেটিভ চার্জওয়ালা ইলেকট্রনরা পজিটিভ চার্জওয়ালা নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরতে থাকে নিউক্লিয়াসের টানে। এই টানে বাঁধা থাকে বলেই তারা পরস্পরের কাছ থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় না। আস্ত পরমাণুটিও থাকে চার্জবিহীন হয়ে। কিন্তু তাপ বাড়তে বাড়তে যদি এমন একটা অবস্থা করা যায় যখন তাপের জন্য ইলেকট্রনের গতিশক্তি তার বন্ধনী-শক্তির চেয়ে বেশি তখনই নিউক্লিয়াসের বাঁধন খুলে তারা এলোমেলোভাবে ছুটে বেড়াবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরমাণুগুলো থেকে কিছু-কিছু ইলেকট্রন খুলে যাওয়ায় সেগুলো হয়ে যাবে পজিটিভ চার্জওয়ালা আয়ন। এই অবস্থারই অপর নাম প্লাজমা—তখন কেবল থাকছে একদল আয়ন আর প্রচণ্ড বেগে ছুটন্ত এলোপাথাড়ি ইলেকট্রনের ঝাঁক। আজকাল এক নতুন বিজ্ঞানই গড়ে উঠেছে প্লাজমাকে নিয়ে।

আমাদের ভবিষ্যতের চিন্তা তখনই ঘুচবে যখন মানুষ তাপকেন্দ্রিণ বিক্রিয়াকে আয়ত্তে এনে শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগাতে পারবে। তার জন্য আমেরিকা, যুক্তরাজ্য ও রাশিয়ার গবেষকরা উঠে পড়ে লেগেছেন। উচ্চ চাপ সৃষ্টি ও প্লাজমা নিয়ে তাই এত মাতামাতি। ভবিষ্যতের শক্তি তৈরির ব্যাপারে আমাদের অনেকটা হতে হবে প্লাজমার উপর নির্ভরশীল।

এম-এইচ-ডি

প্লাজমা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে হলো এম-এইচ-ডি-র আবিষ্কার। ভালো নাম ম্যাগনেটো-হাইড্রোডায়নামিক পাওয়ার-জেনারেশন। শুনে ভয় পাবার কিছু নেই। এটা আসলে প্লাজমা প্রবাহ দিয়ে ইলেকট্রিসিটি তৈরির একটা পদ্ধতি মাত্র। প্রচণ্ড গরম গ্যাস কড়া ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সঙ্গে সমকোণে প্রবাহিত ক'রে তা থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ তৈরি করা যেতে পারে এই পদ্ধতিতে, ডায়নামোর সাহায্য না নিয়েই।

আমাদের দেশেও এ বিষয়ে কাজ শুরু হয়েছে। ত্রিচিতে ভারত হেভি ইলেকট্রিকাল কোম্পানী পরীক্ষামূলকভাবে একটি ২৫ মেগাওয়াট তাপ ক্ষমতাসম্পন্ন এম-এইচ-ডি ইউনিট তৈরি করার ভার নিয়েছেন। এদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন ভাবা পরমাণুকেন্দ্র প্লাজমা অংশটি তৈরি করতে। আশা করা যায় এটি ১৯৭৯-র মধ্যে সম্পূর্ণ হবে।

ফ্যারাডে ও গ্লাডস্টোন

ডায়নামো ছাড়া ইলেকট্রিসিটি পৃথিবীতে একটা নতুন ব্যাপার বই কি। দেড়শো বছর আগে ফ্যারাডে যখন ডায়নামো-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন তখন অনেকেই তার তাৎপর্য বোঝেন নি। এমনকি গ্ল্যাডস্টোনও না। গ্ল্যাডস্টোন তখনো ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হন নি, তখন তিনি চান্সেলার অফ দি এক্সচেকার। একদিন ফ্যারাডের ল্যাবরেটরি দেখতে আসেন তিনি। ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ইনডাকশনের অদ্ভুত একটি যন্ত্র দেখে গ্ল্যাডস্টোন মন্তব্য করেন : 'আচ্ছা মিঃ ফ্যারাডে,

এই যন্ত্রটা কি আমাদের কোনো উপকারে আসবে ?' 'নিশ্চয়'— ফ্যারাডে উত্তর দিলেন—'আপনিই একদিন এটার ওপর ট্যাক্স বসাবেন।' শুনে গ্ল্যাডস্টোনের সন্দেহ দূর হলো কিনা ইতিহাসে লেখা নেই তবে ফ্যারাডের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। ইলেকট্রিসিটির প্রতি-ইউনিটের জন্য আমাদের ট্যাক্স ঠিকই দিতে হচ্ছে।

ফ্যারাডের আবিষ্কৃত ডায়নামোর কাজ কি ? সংক্ষেপে বলতে গেলে কয়লার তাপে জল ফুটিয়ে হয় স্টীম, সেই স্টীম টারবাইনের চাকা ঘোরায় এবং তার ফলে জেনারেটরে উৎপন্ন হয় বৈদ্যুতিক শক্তি। কিন্তু এই রূপান্তর-প্রক্রিয়ায় অনেকটা শক্তি বাজে খরচ হয়ে যায়, শতকরা কুড়ি কি তিরিশ ভাগ শক্তি শেষ পর্যন্ত কাজে আসে। ডায়নামো বাদ দিয়ে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা গেলে এই নষ্ট হওয়াটা বন্ধ হবে। আজকালকার দিনে সব কিছুরই অপচয় বন্ধ হওয়া উচিত। তাই আধুনিক মানুষের চাই এম-এইচ-ডি।

পারমাণবিক রিঅ্যাকটর থেকে আজকাল বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে। বর্তমান পদ্ধতিতে রিঅ্যাকটরে উৎপন্ন তাপশক্তি থেকে একটি মাধ্যমের সাহায্যে উচ্চ চাপে স্টীম তৈরি করা হয়। সেই স্টীম ঘোরায় টারবাইনের চাকা যার সঙ্গে থাকে বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরি করার জেনারেটর। এম-এইচ-ডি পদ্ধতিতে রিঅ্যাকটরের তপ্ত গ্যাস সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে, মাঝখানের পর্যায়গুলো বাদ দিয়ে। এতে শক্তি অপচয় অনেকটা কমবে। এম-এইচ-ডি পদ্ধতিতে সর্বাঙ্গ-সুন্দর ক'রে তোলার জন্য আপাতত চেষ্টা চলেছে। প্রধানত চেষ্টা হচ্ছে যাতে এইভাবে মহাকাশযানগুলোতে শক্তি উৎপন্ন করা যায়। তাদের জেট ইঞ্জিন থেকে নির্গত প্লাজমা এইভাবে কাজে লাগানো সম্ভব। পরে এম-এইচ-ডি-কে লাগানো হবে সাধারণ কাজে, ঘর-গৃহস্থালীতে। প্লাজমা বংশজাত এই নবীন কুশীলবকে একবিংশ শতাব্দীর আগেই সমস্ত পাওয়ার স্টেশনে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হবে একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে। পৃথিবীতে নতুন জিনিস ঘটার আর বিরাম নেই।

অক্ষ axis

অটো হান Otto Hahn (১৮৭৯-১৯৬৮) : জার্মান রসায়নী। ফ্রাঙ্ক-ফোর্ট, মিউনিক ও মারবার্গে লেখাপড়া। পরে কাইজার উইলহেল্‌ম ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে স্ট্রাসমানের সঙ্গে একত্রে পারমাণবিক বিভাজনের প্রথম প্রমাণ পান। এঁর আবিষ্কারের ফলে তেজস্ক্রিয়তা ও পরমাণু পদার্থ-বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে উন্নতি সম্ভব হয়েছে। ১৯৪৫ সনে রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

অণু molecule

অনাহিত uncharged

অনিলকুমার গাঙ্গুলী জন্ম ১৯১৮। বিখ্যাত রসায়নী ও পরমাণু-বিজ্ঞানী। ভাবা পরমাণুকেন্দ্রে কেমিকাল গ্রুপের ডিরেক্টার।

অপবস্তু impurity

অপ্সরা ভারতের প্রথম রিঅ্যাকটরের নাম

অতিসম্পৃক্ত super-saturated

অর্ধায়ু half life

অরুণ দাশগুপ্ত ভারতীয় আকরিকে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা প্রথম নিরূপণ করেন।

অসিলেটর oscillator

আইজাক নিউটন Sir Isac Newton (১৬৪২-১৭২৭) : ইংরেজ গণিতজ্ঞ। কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ। প্রথমে ফেলো অফ দি রয়্যাল সোসাইটি ও পরে ঐ সংস্থার সভাপতি পদ লাভ। মহাকর্ষ-তত্ত্ব ও তিনটি গতিসূত্রের আবিষ্কর্তা। আলোকের ধর্ম, বিচ্ছুরণ ইত্যাদি সম্বন্ধেও নানাপ্রকার গবেষণা করেন।

আইনস্টাইন, এলবার্ট Albert Einstein (১৮৭৯-১৯৫৫) : অস্ট্রিয়-সুইস-মার্কিন গণিতজ্ঞ ও পদার্থ-বিদ্‌। জুরিখ ও মিউনিকে লেখা-পড়া। নাৎসিদের অত্যাচারে পরে জার্মানি ত্যাগ করে প্রথমে ইংলণ্ড ও সেখান থেকে আমেরিকার প্রিন্সটনে চলে যান। আপেক্ষিকবাদ আবিষ্কার করেন। ১৯২১ সনে নোবেল পুরস্কার পান। কোপার্নিকাসের পরে তাঁর অবদানকে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বলা হয়।

আইসোক্রোনাস সাইক্লোট্রন isochronous cyclotron.

আইসোটোপ isotope

আকর্ষী attractive

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) : ভারতীয় পদার্থবিদ্‌। কলকাতা ও কেমব্রিজে শিক্ষা। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। জড় ও জীবের মধ্যে সামঞ্জস্য,

অতি-হ্রস্ব-তরঙ্গ ও বেতার ও তার ধর্ম নিরূপণ প্রভৃতি আবিষ্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাতা হিসেবেও স্বীকৃত, বিশেষত উদ্ভিদের গতি নিরূপণ করার ক্ষেত্রে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪): শিক্ষা কলকাতা ও এডিনবরায়। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা-কালে দুই খণ্ডে 'হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি' রচনা করেন। ভারতের প্রথম রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধের কারখানা বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা। বিজ্ঞানের সঙ্গে জন-সেবার কাজে সমান ভাবে যুক্ত ছিলেন।

আণবিকশক্তিসংস্থা Atomic Energy Commission

আধান charge

আনেকসাগোরাস Anaxagoras (৫০০ ? -৪২৮ খ্রীপূর্বাব্দ): গ্রীক দার্শনিক। গ্রীক পরমাণুতত্ত্বের মুখ্য প্রতিষ্ঠাতা। ইউরিপিডিস, সক্রেটিস, প্রমুখ পণ্ডিতেরা এঁর ছাত্র ছিলেন যাবতীয় বস্তু এক প্রকার অবিভাজ্য বস্তু কণার দ্বারা গঠিত এই ছিল এঁদের বিশ্বাস। শেষ জীবনে ইনি নির্বাসিত হন।

আপেক্ষিকবাদ theory of relativity

আভোগাড্রো Amedeo Avogadro (১৭৭৬-১৮৫৬): ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী। টুরিনে অধ্যাপক ছিলেন। ১৮১১ সনে ইনি আবিষ্কার করেন যে সমান তাপ ও চাপে সম আয়তনের জাত্য গ্যাসগুলিতে অণুর সংখ্যা এক।

আর্গ Erg, শক্তির একক

আর্নেস্ট লরেন্স Ernest Lawrence (১৯০১-১৯৫৮): মার্কিন পদার্থবিদ্। ১৯২৮ সনে ক্যালি-ফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩০ সনে ইনি পৃথিবীর প্রথম সাইক্লোট্রন নির্মাণ করেন। ১৯৩৯ সনে নোবেল পুরস্কার পান।

আর্বেন Georges Urbain (১৮৭২—১৯৩৮)

আলফা কণা alpha particle

আলফা রশ্মি alpha rays

আহিত charged

আয়ন ion

আয়েঙ্গার, পি কে: জন্ম ১৯৩১। বিখ্যাত পদার্থবিদ ও পরমাণু-বিজ্ঞানী। ভাবা পরমাণুকেন্দ্রে ফিজিক্স গ্রুপের ডিরেক্টার।

অ্যাকসেলারেটর, ত্বরণ যন্ত্র accelerator

অ্যাটম-অংক, পরমাণু-অংক atomic number

অ্যাটম-ভার, পরমাণু-ভার atomic weight

অ্যাটমিক পাইল atomic pile.

অ্যাটমিক মাস-ইউনিট, পরমাণু-ভর-একক atomic mass unit.

অ্যান্টিপারসোনেল বম্ antipersonnel bomb

অ্যানোড পজিটিভ তড়িদ্দ্বার anode

অ্যামবার তৈল-স্ফটিক amber

অ্যারিস্টটল Aristotle (৩৮৪-৩২২ খ্রী পূর্বাব্দ) : গ্রীক দার্শনিক ও প্রকৃতিতত্ত্ববিদ। প্লেটোর কাছে শিক্ষা। পরে আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক নিযুক্ত হন। জীববিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, রাজনীতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে বই লেখেন। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের পণ্ডিত মহলে তাঁর প্রভাব অত্যধিক ছিল।

আর্ফ্‌ভেডসন J. A. Arfwedson (১৭৯২-১৮৪১)

অ্যালকেমিস্ট, কিমিয়াবিদ Alchemist

ইলমেনাইট ilmenite

ইলেকট্রোড, তড়িদ্দ্বার electrode

ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ইনডাকশন, তড়িচ্চুম্বকীয় আবেশ electromagnetic induction

ইঁরে কুরী-জোলিও Irene Curie-Joliot (১৮৯৭-১৯৫৬) : মাদাম কুরীর কন্যা। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে স্বামী ফ্রেডারিক জোলিওর সঙ্গে একত্রে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান।

উইনক্লার C. A. Winkler (১৮৩৮-১৯০৪)

উইলসন মেঘ-প্রকোষ্ঠ Wilson cloud chamber : সি টি আর উইলসন উদ্ভাবিত একটি যন্ত্র যাতে মেঘরেখার সাহায্যে আহিত কণার অস্তিত্ব জানা যায়। সম্পৃক্ত বাষ্প ভর্তি একটি প্রকোষ্ঠে এমন ব্যবস্থা রাখা হয় যে হঠাৎ রুদ্ধতাপ প্রসারণের ফলে ভিতরের তাপমাত্রা কমে যায় এবং বাষ্পটি অতি-সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় কোনো আহিত কণা ঐ প্রকোষ্ঠে ঢুকলে তার গতিপথ বরাবর একটি মেঘরেখার সৃষ্টি হয় এবং আহিত কণাটির অস্তিত্ব ধরা পড়ে। ঐ মেঘরেখা বিশ্লেষণ ক'রে আহিত কণাটির নানা ধর্ম জানা যায়। সমস্ত প্রকোষ্ঠটি চুম্বকক্ষেত্রের মধ্যে রাখলে কণাটির আধান পজিটিভ বা নেগেটিভ—তা জানা যায়। সাধারণত মেঘরেখার ফটো তুলে পরে তার বিশ্লেষণ করা হয়।

উইলিয়াম ব্র্যাগ William Henry Bragg (১৮৬২-১৯৪২) : ইংরেজ পদার্থবিদ্‌। কেমব্রিজে শিক্ষা। ছেলের সঙ্গে একত্রে নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে। পাঁচ বছর রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। এক্স-রে স্পেকট্রোমিটার উন্নয়নের জন্য বিখ্যাত। জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখকও ছিলেন।

উপবৃত্তাকার elliptical

এ-এম-ইউ, পরমাণু-ভর-একক a m u

একক unit

একবার্গ Anders Gustof Ekeberg (১৭১৭-১৮১৩)

এক্স রে x-ray

এনরিকো ফার্মি Enrico Fermi (১৯০১-১৯৫৪) : ইতালীয় মার্কিন পদার্থবিদ্‌। গটিংগেন ও লেডেনে শিক্ষা। প্রথমে

রোম ও পরে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। ১৯৩৮ সনে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে প্রথম অ্যাটমিক পাইল প্রস্তুত করেন।

এপিকিউরাস Epicurus (৩৪১-২৭০ খ্রী পূর্বাব্দ): গ্রীক পরমাণুবাদী দার্শনিক।

এ পি পাত্র A. P. Patro: জন্ম ১৯২৬। সাহা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক।

এ ভি এফ সাইক্লোট্রন a. v. f. cyclotron

এমপিডোক্লস Empedocles (৪৯৪-৪৩৭ খ্রী পূর্বাব্দ): গ্রীক দার্শনিক ও শারীরবিদ্।

ওলাস্টোন W. H. Wollaston (১৭৬৬-১৮২৮)

ওয়াট watt, ক্ষমতার একক

ওয়ালটন E. T. S. Walton: জন্ম ১৯০৩। আইরিশ বিজ্ঞানী। সার জন ককক্রফ্‌টের সঙ্গে ১৯৫১ সনে নোবেল পুরস্কার পান।

ওয়েলসবাক Baron von Carl Auer Welsbach (১৮৫৮-১৯২৯)

ককক্রফ্‌টওয়ালটন-জেনারেটর Cockroft-Walton generator

ককক্রফ্‌ট, জন Sir John Douglas Cockcroft (১৮৯৭-১৯৬৭): ইংরেজ পদার্থবিদ্। ম্যাঞ্চেস্টারও কেমব্রিজে শিক্ষালাভ। কেমব্রিজে অধ্যাপনা। ওয়ালটনের সঙ্গে যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৫১ সালে। উচ্চগতিসম্পন্ন প্রোটন সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বিখ্যাত।

কক্ষপথ orbit

কণাদ: জন্ম, মৃত্যু-কাল নির্ণয় করা যায় নি। ভারতীয় দার্শনিক। বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক। এঁর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না, কিন্তু এঁর প্রবর্তিত মতবাদের উল্লেখ বহু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়।

কনট্রোল রড control rod

কপিল: ভারতীয় দার্শনিক। আদি সাংখ্য গ্রন্থ প্রণেতা।

কম্পাংক frequency

কসমিক রশ্মি, নভোরশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি cosmic ray

কসমোট্রন cosmotron

কাইনেটিক থিওরি, গতি-তত্ত্ব kinetic theory

কার্য work

কাসকেড জেনারেটর cascade generator

কিউ Q

কিমিয়াবিদ্ alchemist

কির্চফ Gustav Robert Kirchhoff (১৮২৪-১৮৮৭)

কুর্তোয়া Bernard Courtois (১৭৭৭-১৮৩৮)

কুরী, পিয়ের Pierre Curie (১৮৫৯-১৯০৬): ফরাসি রসায়নী ও পদার্থবিজ্ঞানী। সরবোনে অধ্যাপনা। বেকেরেল ও স্ত্রী মাদাম কুরীর সঙ্গে একত্রে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে তিন জনেই নোবেল পুরস্কার পান।

কুরী, মাদাম Marja Sklodowska Curie (১৮৬৭-১৯৩৪) : পোলিশ পদার্থবিজ্ঞানী ও রসায়নী। প্যারিসে শিক্ষালাভ। প্রথমে পিয়ের কুরীর সহকর্মী ও পরে তাঁর স্ত্রী। উভয়ে তেজস্ক্রিয়তার গবেষণায় পৃথিবীখ্যাত। ১৯০৩ সালে তাঁর স্বামী ও বেকেরেলের সঙ্গে একত্রে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। আবার ১৯১১ সনে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান রেডিয়ম আবিষ্কারের জন্য।

কেন্দ্রক nucleus

কেন্দ্রাতিগ বল centrifugal force

কেন্দ্রিণ বল nuclear force

কেন্দ্রিণ বিক্রিয়া nuclear reaction

কেন্দ্রিণ শক্তি nuclear energy

কেলভিন, লর্ড Lord William Thomson Kelvin (১৮২৪-১৯০৭) : স্কটল্যাণ্ডবাসী গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ্। গ্লাসগো ও কেমব্রিজে শিক্ষা। গ্লাসগোতে অধ্যাপনা। পাঁচ বছর রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। বহু যন্ত্রের আবিষ্কর্তা। বিজ্ঞানের নানা শাখায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ আছে।

কেলাস বিদ্যা crystallography

কোর core

কোয়ান্টাম quantum

কোয়ান্টামবাদ quantum theory

ক্যাথোড, নেগেটিভ তড়িদ্দ্বার cathode

ক্যাভেণ্ডিশ Henry Cavendish (১৭৩১-১৮১০) : ইংরেজ পদার্থবিদ্ ও রসায়নী। ডিউক অফ ডিভনশায়ারের পৌত্র ও লর্ড চার্লস ক্যাভেণ্ডিশের পুত্র। প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়েও ইনি সাধারণভাবে ও বিজ্ঞানের সেবায় জীবন অতিবাহিত করেন। এঁরই নামে ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরি। ১৭৬৬ সনে ইনি হাইড্রোজেনের ধর্ম বিশ্লেষণ করেন ও সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে জল তৈরি করেন।

ক্যালরি calorie

ক্রুকস Sir William Crookes (১৮৩২-১৯১৯)

ক্লাউস Karl Karlovich Klaus (১৭৯১-১৮৬৪)

ক্লাপ্রথ Martin Heinrich Klaproth (১৭৪৩-১৮১৭)

ক্লীভ Per Theodor Cleve (১৮৪০-১৯০৫)

কৃস্টালোগ্রাফি, কেলাসবিদ্যা crystallography

ক্ষমতা power

ক্ষয়-ধ্রুবক decay-constant

গতি-তত্ত্ব kinetic theory

গাইগার-গণক Geiger counter : আলফা কণা, বিটা কণা বা গামা-রশ্মির উপস্থিতি ধরবার জন্য গাইগার-গণক ব্যবহৃত হয়। একটি কাচের নলের ভেতর একটি ধাতব নল ক্যাথোড হিসেবে এবং ঐ নলের অক্ষ বরাবর একটি সরু তার অ্যানোড হিসেবে থাকে। কাচের নলটি বায়ুশূন্য ক'রে নিম্নচাপে আরগন গ্যাস ভরা হয়।

অ্যানোড ও ক্যাথোডের মধ্যে উচ্চ-বিভব আরোপ করলে এই অবস্থায় কোনো আহিত কণা বা গামারশ্মি নলে প্রবেশ করলে যে তড়িৎ-ক্ষরণ হয় তা অ্যানোড থেকে একটি তড়িৎপাল্‌স হিসেবে ধরা পড়ে। গাইগার-গণকের সঙ্গে যুক্ত ইলেকট্রনিক যন্ত্র থেকে কত-গুলি পাল্‌স আসছে তার হিসেবে পাওয়া যায়।

গামা রশ্মি gamma rays

গারউইন, রিচার্ড Richard L. Garwin: মার্কিন বিজ্ঞানী।

গিলবার্ট William Gilbert (১৫৪৪-১৬০৩)

গিসেল Friedrich O Giesel (১৮৫২-১৯২৭)

গে-লুসাক Joseph Louis Gay-Lussac (১৭৭৮-১৮৫০)

গ্যাডোলিন John Gadolin (১৭৬০-১৮৫২)

গ্যালিলিও Galileo Galile (১৫৬৪-১৬৪২): ইতালীয় বৈজ্ঞানিক। এঁকে আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলে স্বীকার করা হয়। দোলকের পর্যায়-কাল, পড়ন্ত বস্তুর ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে হাতে-নাতে প্রমাণ ক'রে ইনি আরিস্টটল-প্রবর্তিত বহু চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন করেন। 'ডায়লগ অন দি টলেমিক এণ্ড কোপার্নিকান সিস্টেমস' (১৬৩০) নামক বই লেখার জন্য তাঁকে তৎকালীন চার্চের হাতে অনেক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছিল।

গ্যাসেণ্ডি Pierre Gassendi (১৫৯৩-১৬৫৫)

গ্রাফাইট graphite

গ্রেগর William Gregor (১৭৬১-১৮১৭)

চক্রবৃদ্ধি-বিক্রিয়া chain-reaction

চার্জড-পার্টিকল আহিতকণা charged particle

চুম্বক-তত্ত্ব magnetic theory

চেন-রিঅ্যাকশন, চক্রবৃদ্ধি-বিক্রিয়া chain-reaction

চৌম্বক-ক্ষেত্র magnetic field

চৌম্বক বলরেখা magnetic lines of force

চ্যাডউইক James Chadwick: ১৮৯১ সনে জন্ম। ইংরেজ বিজ্ঞানী। ১৯৩৫ সনে নোবেল পুরস্কার পান নিউট্রন আবিষ্কারের জন্য।

ছত্রাকার মেঘ mushroom cloud

জগদীশচন্দ্র বসু: আচার্য জগদীশচন্দ্র দ্রষ্টব্য

জন ককক্রফ্‌ট: ককক্রফ্‌ট দ্রষ্টব্য

জন ডালটন John Dalton (১৭৬৬-১৮৪৪): প্রথম জীবন দারিদ্র্যে কেটেছে। নিউটনের লেখা পড়ে অনুপ্রেরণা পান। গ্যাসের ভৌত ধর্মগুলি সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে ইনি পরমাণু সম্বন্ধে থিওরি প্রচারের জন্য বিখ্যাত।

জলশক্তি water power

জড়বস্তু matter

জাড্যের সূত্র law of inertia

জাড্য গ্যাস perfect gas

জার্লিনা Zerilina : ট্রম্বের জিরো-এনার্জি রিঅ্যাকটরের নাম

জুল Jule, শক্তির একক

জুল ভার্ন Joule Verne

জে জে টমসন Sir Joseph John Thomson (১৮৫৬-১৯৪০): ইংরেজ পদার্থ-বিজ্ঞানী। ১৮৯৫ সালে ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন। রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি, বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরিতে পরমাণু কেন্দ্রক নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত করেন। লর্ড রাদার ফোর্ড এঁর অধীনে কাজ শুরু করেন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।

জোলিও, ফ্রেডারিক Jean Frederic Joliot (১৯০০-১৯৫৮): ফরাসি পদার্থবিদ্। প্রথমে এঞ্জিনিয়ারিং ও পরে রসায়ন পড়েন। প্যারিসের রেডিয়ম ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা। ১৯৩৩ সনে স্ত্রী ইঁরে কুরীর সঙ্গে একত্রে প্রথম কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপন্ন করেন এবং ১৯৩৫ সনে যুগ্মভাবে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান।

টমসন: জে জে টমসন দ্রষ্টব্য

ডি এম বসু দেবেন্দ্রমোহন বসু: (১৮৮৫-১৯৭৫)। চুম্বক-তত্ত্ব, কসমিক-রশ্মি, প্রাণ-পদার্থ ও পরমাণু-পদার্থ বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য দেশে-বিদেশে খ্যাত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষ ও পালিত অধ্যাপক ছিলেন, পরে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টার হন। পরে ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসাবে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে সক্রিয় ভাবে গবেষণারত ছিলেন।

ডি এস কোঠারি দৌলত সিং কোঠারি: জন্ম ১৯০৫। জ্যোতি-র্পদার্থ বিদ্যায় গবেষণার জন্য বিখ্যাত। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। এলাহাবাদ ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন।

টেনান্ট Smithson Tennant (১৭৬১-১৮১৫)

ট্রপোপজ tropopause

ট্রাভার্স Morris William Travers

ট্রেসার-পদ্ধতি tracer technique

ডাইন dyne, বলের চরম একক

ডিকন্টামিনান্ট decontaminant

ডি-তল dee-plane

ডি-বাক্স dee-box

ডিমোক্রিটাস Democritus (৪৬০-৩৬২ খ্রী পূর্বাব্দ): গ্রীক দার্শনিক। লিউসিপ্পাসের ছাত্র ছিলেন। পিতা ধনী ছিলেন বলে কথিত। মিশর, ব্যাবিলন, পারস্য এমনকি ভারত পর্যন্ত ডিমোক্রিটাস ভ্রমণ করে-ছিলেন বলে অনুমান। ইনি লিউ-সিপ্পাসের পরমাণুবাদকে আরো বস্তুবাদ ঘেঁষা করেন।

ডেভি Sir Humphry Davy (১৭৭৮-১৮২৯): ইংরেজ রসায়নী

তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য wave length

তরল ফোঁটার মডেল liquid drop model

তড়িচ্চুম্বক electromagnet
তড়িদ্দ্বার electrdoe
তড়িৎ-ক্ষরণ electrical discharge
তড়িৎক্ষেত্র electric field
তড়িৎ গতিবিদ্যা electro dynamics
তড়িৎ-পাল্‌স electrical-pulse
তড়িৎ বিভব electric potential
তাপকেন্দ্রিণ বিক্রিয়া thermo-nuclear reaction
তেজস্ক্রিয় radioactive
তেজস্ক্রিয়তা radioactivity
তৈল-স্ফটিক amber
ত্বরণ acceleration
ত্বরণ যন্ত্র accelerator
থার্মোনিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, তাপকেন্দ্রিণ বিক্রিয়া thermonuclear reaction
থালেস Thales (৬৪০-৫৪৬ খ্রীপূর্বাব্দ): গ্রীক জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ
থেনার্ড Baron Louis Jacques Thenard (১৭৭৭-১৮৫৭): ফরাসি রসায়নী
দিগাংশিকভাবে পরিবর্তী চৌম্বকক্ষেত্র azimuthally varying magnetic field
দীর্ঘায়ু তেজস্ক্রিয়তা long lived radioactivity
দেমার্কে Engine Anatole Demarcay (১৮৫২-১৯০৪): ফরাসি রসায়নী
দেলহুইয়ার Don Fausto d' Elhuyar (১৭৫৫-১৮৩৩)
নটিলাস Nautilus
নভোরশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি cosmic ray
নাগচৌধুরি, বি ডি বাসন্তী দুলাল নাগচৌধুরি: জন্ম ১৯১৭। এলাহাবাদ ও কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বার্কলেতে পড়াশুনা ও গবেষণা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় পালিত অধ্যাপক, সাহা ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর, যোজনা কমিশনের সদস্য ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ছিলেন। বর্তমানে জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।
নিউক্লিয়াস, পরমাণু-কেন্দ্রক nucleus
নিউক্লিয়াস, অশান্ত unstable nucleus
নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন nuclear reaction
নিউক্লিয়াসের আয়তন nuclear size
নিউক্লিয়াসের ভর nuclear mass
নিউটন আইজাক নিউটন দ্রষ্টব্য
নিউটনের গতিসূত্র Newton's laws of motion
নির্মল বোমা clean bomb
নেচার পত্রিকা *Nature*
নীলস বোর Niels Bohr (১৮৮৫-১৯৬২): ডেনমার্কবাসী পদার্থবিদ্। কোপেনহাগেন ও কেমব্রিজে শিক্ষা। কিছুকাল জে জে টমসন ও রাদারফোর্ডের কাছে কাজ করেন। পরে কোপেনহাগেনে অধ্যাপক। পরমাণু ও নিউক্লিয়াসের মডেল-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য বিখ্যাত। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।

১৯২৮ এ ফেলো অফ দি রয়্যাল সোসাইটি নির্বাচিত হন।
পতনকাল time of fall
পরমাণু-অংক atomic number
পরমাণু-একক atomic unit
পরমাণু-কেন্দ্রিণ-বিক্রিয়া nuclear reaction
পরমাণু-কেন্দ্রিণ-শক্তি nuclear energy
পরমাণু চুল্লি, রিঅ্যাকটর nuclear reactor
পরমাণু-তত্ত্ব atomic theory
পরমাণুবাদ atomic theory
পরমাণুবিদ্ atomic scientist
পরমাণু-বোমা atom bomb
পরমাণু-ভর atomic mass
পরমাণু-ভার atomic weight
পরমাণুর নিউক্লিয়াস nucleus of the atom
পরমাণুর মডেল atomic model
পরমাণু-শক্তি atomic energy
পরমাণু-শক্তি-কেন্দ্র atomic power station
পরেশ সেনচৌধুরী : জন্ম ১৯১৫। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক ছিলেন।
পাউণ্ডাল poundal
পাওয়ার-গ্রীড-সিস্টেম power grid system
পাওয়ার রিঅ্যাকটর power reactor
পারমাণবিক অস্ত্র nuclear weapon
পারমাণবিক আবর্জনা nuclear waste
পারমাণবিক নীতি nuclear policy
পারমাণবিক-শক্তি nuclear energy
পারমাণবিক সাবমেরিন nuclear submarine
পায়ন pion, একপ্রকার মৌলিক কণা
পি এন ই pne, peaceful nuclear experiment
পিয়ের কুরী : কুরী, পিয়ের দ্রষ্টব্য
প্ল্যাংক ধ্রুবক Planck's constant
প্ল্যাংক, ম্যাক্স Max Karl Ernest Ludwig Planck (১৮৫৮-১৯৪৭) : জার্মান পদার্থবিদ্। মিউনিক ও বার্লিনে শিক্ষা। বার্লিনে অধ্যাপনা। কোয়ান্টাম-বাদের জন্য বিখ্যাত। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান ও ১৯২৬ এ ফেলো অফ দি রয়্যাল সোসাইটি নির্বাচিত হন। কাইজার উইলহেল্ম ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করেন।
প্রতিপ্রভা fluorescence
প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র দ্রষ্টব্য
প্রসারণ expansion
প্রিস্টলে Joseph Priestley (১৭৩৩-১৮০৪) : ইংরেজ রসায়নী
প্লাজমা plasma
প্রণবরঞ্জন দস্তিদার : ইলেট্রনিকস এঞ্জিনিয়ার। রিঅ্যাকটর কন্ট্রোল বিশেষজ্ঞ। ভাবা পরমাণুকেন্দ্রে রিঅ্যাকটার গ্রুপের ডিরেক্টার।
ফজলে হোসেন : জন্ম ১৯৩৩। বর্তমানে আমেরিকার বাল্টিমোরে জন হপকিন্স হসপিটালে ডিপার্টমেন্ট

অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিনে আছেন।

ফন হেল্‌মহোলৎস Von Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz (১৮২১-১৮৯৪): জার্মান পদার্থবিদ্‌।

ফল আউট fall out

ফার্মি, এনরিকো: এনরিকো ফার্মি দ্রষ্টব্য

ফিউসন সংযোজন fusion

ফিশন বিভাজন fission

ফিসাইল বিভাজনক্ষম fissile

ফোটন photon

ফ্যারাডে Michael Faraday (১৭৯১-১৮৬৭): ইংরেজ রসায়নী ও পদার্থবিদ্‌। ছোটবেলা দারিদ্র্যে কেটেছে। প্রথম জীবনে দপ্তরীর কাজ করতেন। ডেভির বই পড়ে ও বক্তৃতা শুনে তাঁর কাছে কাজ নেন ও কালক্রমে রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে রসায়নের অধ্যাপক পদ লাভ করেন।

ফ্র্যাঙ্কলিন, বেঞ্জামিন Benjamin Franklin (১৭০৬-১৭৯০): আমেরিকান বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ্‌।

ফ্রান্সিস বেকন Francis Bacon (১৫৬১-১৬২৬): ইংরেজ দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞ।

ফ্রেডারিক জোলিও: জোলিও, ফ্রেডারিক দ্রষ্টব্য

ফ্রিশ Otto Robert Frisch (১৯০৪-)

ফুট-পাউণ্ড-সেকেণ্ড foot-pound-second

বন্ধন-শক্তি binding energy

বলবিদ্যা mechanics

বস্তু ও শক্তির তুল্যমূল্যতা equivalence of matter and energy

বয়লিং ওয়াটার চুল্লি boiling water reactor

বার্জিলিয়াস Barön Jons Jakob Barzelius (১৭৭৯-১৮৪৮)

বালার্ড Antoine Terome Balard (১৮০২-১৮৭৬)

বায়ুশক্তি wind power

বিকর্ষী repulsive

বিটা-কণা beta-particle

বিটা-কণাক্ষয় beta decay

বিটাট্রন betatron

বিটারশ্মি beta rays

বিনায়ক বসু: জন্ম ১৯২৯। সাহা ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক।

বিভব potential

বিভব চিহ্ন voltage sign

বিভব পার্থক্য potential difference

বিভাজন fission

বিভাট্রন bevatron

বিম কারেন্ট beam current

বুনসেন Robert Wilhelm Bunsen (১৮১১-১৮৯৯): জার্মান রসায়নী।

বুসি Antoine Alexandre Brutus Bussy (১৭৯৪-১৮৮২): ফরাসি রসায়নী।

বেকন, ফ্রান্সিস: ফ্রান্সিস বেকন দ্রষ্টব্য

বেকেরেল Antoine Henri Becquerel (১৮৫২-১৯০৪): ফরাসি

পদার্থবিদ্। প্যারিসে শিক্ষা। তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের জন্য ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে কুরীদের সঙ্গে যুক্তভাবে নোবেল পুরস্কার পান। পিতা ও পিতামহ উভয়েই বিজ্ঞানী ছিলেন।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন : ফ্র্যাঙ্কলিন দ্রষ্টব্য

বেথে, হান্স Hans Alfred Bethe ; জন্ম ১৯০৬। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে তত্ত্বীয় গবেষণার জন্য বিখ্যাত। ১৯৬৭ সনে নোবেল পুরস্কার পান।

বোয়াবোদ্রঁ Paul Emile Lecoq de Boisbaudran (১৮৩৮-১৯১২) : ফরাসি পদার্থবিদ্ ও রসায়নী।

বোর, নীলস : নীলস বোর দ্রষ্টব্য

ব্ল্যাকেট, পি এম এস Patrick Maynard Stuart Blackett : জন্ম ১৮৯৭ ইংরেজ পদার্থবিদ্। ও কেমব্রিজে শিক্ষালাভ। কসমিক-রশ্মি ও মৌলিক কণার উপর গবেষণার জন্য বিখ্যাত।

ব্রিডার breeder

ব্র্যাগ, উইলিয়ম : উইলিয়ম ব্র্যাগ দ্রঃ

ব্র্যাগ, লরেন্স Sir William Lawrence Bragg : (১৮৯০-১৯৭১)। ইংরেজ পদার্থবিদ্। কেলাসবিদ্যায় গবেষণার জন্য পিতা উইলিয়ম ব্র্যাগের সঙ্গে যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার পান।

ভর mass

ভর-অংক mass number

ভর ও শক্তির তুল্যমূল্যতা equivalence of mass and energy

ভর-সংখ্যা mass number

ভাবা, হোমি জাহাঙ্গীর (১৯০৯-১৯৬৬) : পদার্থবিদ্। বোম্বাই ও কেমব্রিজে শিক্ষালাভ। কসমিক-রশ্মি ও মৌলিক কণার উপর গবেষণার জন্য বিখ্যাত। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে ফেলো অফ দি রয়্যাল সোসাইটি নির্বাচিত হন। ভাবার কাসকেড-থিওরি বিখ্যাত। স্বাধীন ভারতে পরমাণু-বিজ্ঞানে গবেষণা ও শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার Bhabha Atomic Research Centre (BARC)

ভেরিএবল এনার্জি সাইক্লোট্রন variable energy cyclotron

ভৌত physical

ভ্যাকেলিন Louis Nicolas Vauquelin (১৭৬৩-১৮২৯) : ফরাসি রসায়নী।

ভ্যান-ডি-গ্রাফ মেশিন Van-de Graaf machine

মডারেটর moderator

মনোজ ব্যানার্জি : জন্ম ১৯৩০। পদার্থবিদ্, বর্তমানে আমেরিকায় মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক।

মহাকর্ষ gravitation

মহাকর্ষ সূত্র gravitational law

মহাকর্ষের টান gravitational pull

মাইকেল ফ্যারাডে : ফ্যারাডে দ্রষ্টব্য

মাইক্রো আম্পিয়র micro ampere

মাইটনার Lise Meitner : জন্ম ১৯০৭। অস্ট্রিয়াবাসিনী পদার্থবিদ্। অটো হানের সঙ্গে বহুদিন একত্রে কাজ করেন। যথাক্রমে বার্লিন, সুইডেন ও স্টকহল্মে ছিলেন।

মারিগনাক Jean Charles Galissard de Marignac (১৮১৭-১৮৯৪): সুইস রসায়নী।
মার্গ্রাফ Andreas Sigismund Marggraf (১৭০৯-১৭৮২): জার্মান রসায়নী।
মাদাম কুরী: কুরী দ্রষ্টব্য।
মাশরুম-ক্লাউড mushroom cloud
মিলি-আম্পিয়র milliampere
মিলি-রয়েন্টগেন milliröntgen
মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট million electron volt
মেগা-হার্টজ megahertz
মেঘ প্রকোষ্ঠ, উইলসন Wilson cloud chamber
মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩-১৯৫৬): পদার্থবিদ্। শিক্ষা ঢাকা ও কলকাতায়। এলাহাবাদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। তাপ-আয়নন-তত্ত্ব ও জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানে তার প্রয়োগের জন্য বিখ্যাত। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে ফেলো অফ দি রয়্যাল সোসাইটি নির্বাচিত হন। সাহা ইন্স্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রতিষ্ঠাতা। পঞ্জিকা-সংস্কার, জাতীয় পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে ও বহু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে অবদান আছে। লোকসভার সদস্য ছিলেন।
মেরুতল pole face
মেণ্ডেলিয়েফ Dmitri Ivanovitch Mendelejeff (১৮৩৪-১৯০৭): রুশ রসায়নী। প্রথম জীবন দারিদ্র্য ও কষ্টে অতিবাহিত হয়। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অনুমতি পান নি, পরে সেন্ট পিটার্সবার্গে শিক্ষা ও সেখানেই অধ্যাপনা। মৌলগুলির পর্যায়ক্রমিক সারণী প্রণয়নের জন্য বিখ্যাত।
মেশন meson, একপ্রকার মৌলিক কণা
মোসান্দের Cart Gustav Mosander (১৭৯৭-১৮৫৮): সুইডেনবাসী রসায়নী।
মোয়াসাঁ Ferdinand Frederic Henri Moissan (১৮৫২-১৯০৭): ফরাসি রসায়নী।
মৌল element
মৌলিক কণা elementary particle
ম্যাক্স প্ল্যাংক প্ল্যাংক দ্রষ্টব্য
ম্যাগনেট চুম্বক magnet
ম্যাগনেটো হাইড্রোডাইনামিক পাওয়ার জেনারেশন (এম এইচ ডি) magneto hydrodynamic power generation
রঙ্গলাল ভট্টাচার্য: জন্ম ১৯৩১। সাহা ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক।
রয়েন্টগেন Wilhelm Konrad Röntgen (১৮৪৬-১৯২৩): জার্মান পদার্থবিদ্। এঁর এক্স-রশ্মি আবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯০১ সনে নোবেল পুরস্কার পান।
রয়েন্টগেন একক Röntgen unit
রয়েন্টগেন রশ্মি Röntgen rays
রাইখ Ferdinand Reich (১৭৯৯-১৮৮২): জার্মান পদার্থবিদ্।

রাজা রামান্না জন্ম ১৯২৫। বিশিষ্ট পদার্থবিদ ও পরমাণুবিজ্ঞানী। প্রথম থেকে ভারতের পরমাণু প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। এখন ভাবা পরমাণুকেন্দ্রের ডিরেক্টার। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স আকাদেমির প্রেসিডেন্ট।

রানাপ্রতাপসাগর : এখানে ভারতের দ্বিতীয় পরমাণুশক্তি-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

রাদারফোর্ড, লর্ড Lord Ernest Rutherford (১৮৭১-১৯৩৭): ইংরেজ পদার্থবিদ্। তেজস্ক্রিয়তায় আলফা বিটা ও গামা রশ্মি আবিষ্কার করেন। ১৯০৮ সনে নোবেল পুরস্কার লাভ। পরমাণু-বিজ্ঞানের পিতামহ বলা হয়।

রাদারফোর্ড-বোর-মডেল Rutherford-Bohr model

রাসায়নিক বিক্রিয়া chemical reaction

রিঅ্যাকটর, পরমাণু চুল্লি reactor

রিখটার Hieronymus Theodor Richter (১৮২৪-১৮৯৮): জার্মান রসায়নী।

রিচার্ড গারউইন : গারউইন দ্রষ্টব্য

রিসার্চ রিঅ্যাকটর research reactor

রুদ্ধতাপ adiabatic

রেনেসাঁস renaissance

র‍্যালে, লর্ড Lord John William Strutt Rayleigh (১৮৪২-১৯১৯): ইংরেজ পদার্থবিদ্।

র‍্যামসে Sir William Ramsay (১৮৫২-১৯১৬): স্কটল্যাণ্ডবাসী রসায়নী।

লর্ড কেলভিন : কেলভিন দ্রষ্টব্য

লর্ড রাদারফোর্ড : রাদারফোর্ড দ্রষ্টব্য

লরেন্স, আর্নেস্ট : আর্নেস্ট লরেন্স দ্রষ্টব্য

লরেন্স ব্র্যাগ : ব্র্যাগ দ্রষ্টব্য

লিউসিপ্পাস Leucippus (খ্রী পূর্ব পঞ্চম শতাব্দী): গ্রীক অ্যাটম-তত্ত্বের উদ্ভাবক

লিকুইড ড্রপ মডেল liquid drop model

লুক্রেশিয়াস Lucretius (৯৮-৫৫ খ্রী পূর্বাব্দ): রোমান কবি ও দার্শনিক।

শক্তি energy

শক্তি চুল্লি power reactor

শক্তির একক unit of energy

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় : গ্রন্থকার

শিকাগো পাইল Chicago pile

শীলে Karl Wilhelm Scheele (১৭৪২-১৭৮৬): সুইডেনবাসী রসায়নী।

শেফস্ট্রয়েম Niels Gabriel Sefström (১৭৮৭-১৮৫৪): সুইডেনবাসী রসায়নী ও পদার্থবিদ্।

সডি Frederick Soddy (১৮৭৭-১৯৫৬): ইংরেজ পদার্থবিদ্ ও রসায়নী।

সম্পৃক্ত saturated

সমসত্ত্ব চৌম্বক ক্ষেত্র homogeneous magnetic field

সংকোচন তরঙ্গ wave of compression

সংযোজন fusion

স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয়তা natural radioactivity

স্বল্পায়ু তেজস্ক্রিয়তা shortlived radioactivity

সাইরাস CIRUS, কানাডা-ইণ্ডিয়া রিঅ্যাকটর।

সাইক্লোট্রন cyclotron

সাইক্লোট্রন, আইসোক্রোনাস cyclotron, isochronous

সাইক্লোট্রন, এ-ভি-এফ cyclotron, AVF

সাইক্লোট্রন, ভেরিয়েবল এনার্জি cyclotron, variable energy

সাইক্লোট্রন, সেকটার ফোকাস cyclotron, sector focused

সাইক্লোট্রন, স্পাইরাল রিজ cyclotron, spiral ridge

সাইসমিক কেন্দ্র seismic centre

সাইসমোগ্রাফ seisemograph

সাইসমোলজি seismology

সামুদ্রিক মাইল nautical mile

সারফেস টেনশান, পৃষ্ঠটান surface tension

সাহা ইনস্টিটিউট Saha Institute of Nuclear Physics

সাহা, মেঘনাদ: মেঘনাদ সাহা দ্রষ্টব্য

সায়েন্টিফিক আমেরিকান *Scientific American*

সি-জি-এস পদ্ধতি C G S system

সিনক্রোটন synchroton

সিনক্রো-সাইক্লোট্রন synchro-cyclotron

সুইমিং পুল রিঅ্যাকটর swimming pool reactor

সুধাংশু দাস: জন্ম ১৯১৯। সাহা ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক।

সেগ্রে Emilio Gino Segre: জন্ম ১৯০৫ সনে ইতালিতে। বর্তমানে আমেরিকাবাসী। বহু নতুন মৌলের আবিষ্কর্তা। নোবেল পুরস্কার পান ১৯৫১ সনে পদার্থ বিদ্যায়।

সেকটার ফোকাস সাইক্লোট্রন sector focused cyclotron

সেথনা, হোমি নাসেরওয়ানজি: জন্ম ১৯২৩। ইনি মূলত কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী। পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ও পরমাণু শক্তি দপ্তরের সেক্রেটারি।

সেন্টিমিটার-গ্রাম-সেকেণ্ড পদ্ধতি centimetre-gramme-second system

সিবর্গ Glenn Theodore Seaborg: জন্ম ১৯১২ ইতালিতে। বর্তমানে আমেরিকাবাসী। পরমাণু-বিজ্ঞানের গবেষণায় খ্যাত। ১৯৫১ সনে ই এম ম্যাকমিলানের সঙ্গে যুগ্মভাবে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান।

সৌরোৎপাত solar flare

স্ট্রাসমান Fritz Strassman: জন্ম ১৯০২। জার্মান বিজ্ঞানী। অটো হানের সঙ্গে বিভাজনের আবিষ্কার করেন।

স্থায়ী নিউক্লিয়াস stable nucleus

স্থির তড়িৎ static electricity

স্থির নিউক্লিয়াস stable nucleus

স্ট্রোমায়ার Friedrick Stromeyer (১৭৭৬-১৮৩৫)

স্পাইরাল-রিজ-সাইক্লোট্রন spiral ridge cyclotron

হর্স-পাওয়ার horse power

হান, অটো : অটো হান দ্রষ্টব্য

হানস বেথে : বেথে দ্রষ্টব্য

হার্টজ : কম্পাংকের একক। প্রতি সেকেণ্ডে এক সাইকল।

হেল্‌মহোলৎস : ফন হেল্‌মহোলৎস দ্রষ্টব্য

হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা : ভাবা দ্রষ্টব্য

হোমি সেথনা : সেথনা দ্রষ্টব্য

১৯৭৪ সালে রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত এই বইয়ের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণে যোগ করা হয়েছে ভারতের নতুন পরমাণু প্রকল্পগুলি—পুরনিমার জন্ম, ট্রম্বের পঞ্চম রিঅ্যাকটর আর ফাইড, কলপক্কমে ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাকটর এবং পোকরানে শান্তিপূর্ণ পরমাণু পরীক্ষার কথা।

পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতবাদ বোঝাতে গিয়ে লেখকদ্বয় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সমস্ত জটিলতা এড়িয়ে যে সমস্ত গাণিতিক উপাত্তের সাহায্য নিয়েছেন, পরমাণুর অন্তর্নিহিত রহস্য বোঝার ব্যাপারে তার চাইতে সহজ পথ খুঁজে বার করা শক্ত। ...

—দেশ

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কলিকাতায় যে ত্বরণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ও ট্রম্বের রিঅ্যাকটর ভারতের পরমাণু বিজ্ঞানের প্রসারে কি ভূমিকা নিয়েছে ও ভবিষ্যতে নেবে তার ইঙ্গিত দেশবাসীর কাছে সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এই বইএর অধ্যায়গুলিতে তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে।

—অধ্যাপক সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র, জ্ঞান ও বিজ্ঞান

লেখকেরা ভারতের শক্তি চাহিদার চমৎকার যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেই যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেছেন পরমাণু শক্তির দ্রুত রূপায়ণের জন্য।...

—অধ্যাপক দীপঙ্কর চ্যাটার্জি, অমৃতবাজার পত্রিকা

শ্রীমতী এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ ক'রে কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে মৌলিক লেখা ও অনুবাদই তাঁর পেশা। ড. শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় এম. এস.সি., পি.আর.এস, ডি.ফিল—সূচনা থেকেই সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ও বর্তমানে ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান ও বিবিধ বিষয়ক রচনায় শ্রীমতী ও ড. চট্টোপাধ্যায় উভয়েই সাম্প্রতিক কালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

প্রচ্ছদপট : খালেদ চৌধুরী

—

ওরিয়েণ্ট লংম্যান

Chattopadhyay, Enakshi & Santimay : Paramanu-Jijnasa (Bengali) Rs 30.00